বাংলা নামে দেশ

AMARBOI.COM

বাংলা নামে

AMARBOI.COM

দেশ

AMARBOI.COM

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা

প্রধান মন্ত্রীর ভবন,
নয়া দিল্লি

বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধ অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে পঁচিশ বছর ব্যাপী প্রতিরোধের চূড়ান্ত পরিণতি। গত বছর মার্চ থেকে ডিসেমবর, এই নয় মাস ওখানকার মানুষ নিষ্ঠুরতম বর্বরতার শিকার হয়েছেন—পৃথিবীর ইতিহাসে এর চেয়ে নিদারুণ যন্ত্রণাভোগের নজির নেই। ওঁদের ওই ক্লেশ আর আত্মত্যাগ মুক্তিযোদ্ধাদের সংকল্পকে দেয় দৃঢ়তা।

আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করি, এই দারুণ মূল্যে যে-স্বাধীনতা অর্জন করা হয়েছে তাকে রক্ষা করা হবে সর্বশক্তি ও প্রযত্ন দিয়ে।

সকল শোষিত জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের সমর্থক, ভারতবর্ষ বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে নিজেকে নানাভাবে সংযুক্ত করে নেবার সুযোগ পেয়েছিল।

বাংলা দেশের সৌভাগ্য, শেখ মুজিবুর রহমানের উদার নেতৃত্ব এবং প্রেরণায় সে দীপ্ত। তার আর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে মিল অনেকখানি। যে-দারিদ্র্যের অভিশাপে আমাদের দুটি দেশই ক্লিষ্ট, তা থেকে মুক্ত হবার মিলিত সাধনায় আমাদের এখন ব্রতী হওয়া দরকার।

বীর একটি জাতির বিজয়-সংগ্রামের এক মর্মস্পর্শী বিবরণ এই গ্রন্থে বিধৃত। আমার আশা, বাংলা দেশের ভাগ্য ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমাদের দেশের সংবাদপত্র এবং সকল শ্রেণীর মানুষের অন্তরঙ্গ যোগের একটি দলিল হিসাবেও এই বইটিকে দেখা হবে।

ইন্দিরা গান্ধী

ইন্দিরা গান্ধী

AMARBOI.COM

PRIME MINISTER'S HOUSE
NEW DELHI

Bangladesh's final battle for freedom was the culmination of twenty-five years of resistance to exploitation and injustice. From March to December last year, the people were subjected to the cruellest savagery and the most intense suffering the world has known. This very sacrifice strengthened the will of the fighters for liberation.

I have no doubt that the freedom which has been so dearly bought will be defended as jealously.

India, which has supported the freedom movements of all exploited people, was privileged to identify herself in many ways with the struggle of Bangladesh.

Bangladesh has the good fortune to have the inspiration and enlightened leadership of Sheikh Mujibur Rahman. There is so much that is similar between his vision and ours. We should now strive together to remove the curse of poverty which afflicts both of us.

This book is a moving account of the victorious struggle of a heroic people. I hope it will also be seen as a record of the intense involvement of our press and all sections of our people in the cause of Bangladesh.

Indira Gandhi

(Indira Gandhi)

New Delhi,
March 27, 1972

AMARBOI.COM

শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ আমি ঘোষণা করেছিলাম "এই সংগ্রাম, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।" বহু নির্যাতন, বহু রক্তত্যাগের পর আমাদের সংগ্রাম সার্থকতা এনে দিয়েছে, বাংলাদেশ নামে নতুন রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছে। সেই সংগ্রামের কাহিনী ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। পাকিস্তানী সমরনায়কদের বর্বরতার শিকার হয়েছে ৩০ লক্ষ লোক, এক কোটি লোক আশ্রয় নিয়েছিল ভারতে। অবর্ণনীয় অত্যাচারের পর অত্যাচার হয়েছে. কিন্তু বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনোবল তাতে ভেঙে পড়েনি, আমরা স্বাধীনতা আদায় করে নিয়েছি। 'বাংলা নামে দেশ' গ্রন্থে সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, সংগ্রামের আগের এবং পরের ইতিহাস, ধারাবাহিক রচনা ও আলোকচিত্রমালায় চমৎকার সাজানো হয়েছে। বইটি নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান দলিল। জয় বাংলা।

শেখ মুজিবুর রহমান
২৫/৩/৭২

২৫শে মার্চ, ১৯৭২

AMARBOI.COM

বাংলাদেশের
প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা

রচনা
অমিতাভ চৌধুরী
আবদুল গফ্‌ফার চৌধুরী
তুষার পণ্ডিত
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
বরুণ সেনগুপ্ত
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
আলোকচিত্র
অজিত সোম
অভীক সরকার
অরূপকুমার সরকার
অলোক মিত্র
অশোক বসু
আবদুল বারি
চন্দন দত্ত
তারাপদ ব্যানার্জী
পাহাড়ী রায়চৌধুরী
বিজন ব্যানার্জী
বিনয় ব্যানার্জী
বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত
বীরেন্দ্রনাথ সিংহ
রণজিৎ রায়
রামচন্দ্র শর্মা
সত্যেন সেন
হীরেন সিংহ

সম্পাদনা ।। অভীক সরকার

পরিকল্পনা ও অঙ্গসজ্জা
পূর্ণেন্দু পত্রী
মানচিত্র
অর্ধেন্দু দত্ত

AMARBOI.COM

প্রকাশক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পালিকেশনস
প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৫৪

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৭২
মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ মে ১৯৯০
মুদ্রণ সংখ্যা ২০০০
তৃতীয় মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৯২
মুদ্রণ সংখ্যা ২০০০
চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪
মুদ্রণ সংখ্যা ২০০০

ISBN 81-7066-298-2

মূল্য ৬৫·০০

বাংলা নামে দেশ।
তার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর।
মা গঙ্গা মর্তে নেমে নিজের মাটিতে
সেই দেশ গড়লেন।

বাংলার লক্ষ্মী বাংলাদেশ জুড়ে বসলেন।
মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে
লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন।
ফলে ফুলে দেশ আলো হল।
সরোবরে শতদল ফুটে উঠল।

লোকের গোলা ভরা ধানে
গোয়াল ভরা গরু
গাল ভরা হাসি।
লোকে পরম সুখে বাস করতে লাগল।

AMARBOI.COM

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা। ১৯০৫

বাংলা নামে দেশ

AMARBOI.COM

পশ্চিমের অত্যাচার পূর্বের প্রতিরোধ

অবিচার ছিল। তার থেকে জন্ম নিয়েছে অসন্তোষ। অত্যাচার ছিল। তার থেকে জন্ম নিয়েছে আন্দোলন। সেই আন্দোলনকে দমন করবার জন্য দিনে-দিনে ক্ষিপ্ত থেকে ক্ষিপ্ততর হয়ে উঠেছিল পাক-জঙ্গিশাহি। গ্রাম পুড়িয়ে, শহর গুঁড়িয়ে, লক্ষ-লক্ষ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে পাকিস্তানের পূর্বখণ্ডে যে ব্যাপক বীভৎসা তারা জাগিয়ে তুলেছিল, নাৎসী নারকীয়তাকেও তা লজ্জা দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে যা বরাবরই একটি কলোনি মাত্র, সেই পূর্বখণ্ডকে একটি বিশাল বন্দী-শিবিরে পরিণত করে সেখানকার জাগ্রত জনমতকে তারা পিষে মারতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। আন্দোলন থামেনি। বরং দিনে-দিনে তার পরিধি আরও বড় হয়েছে, চরিত্র আরও দুর্জয়। আন্দোলন রূপান্তরিত হয়েছে সংগ্রামে। আত্মপ্রতিষ্ঠার সেই সংগ্রাম আজ সফল। পূর্ব-পাকিস্তানের শবদেহ থেকে জন্ম নিয়েছে স্বাধীন, স্বরাট্ বাংলাদেশ। তার আকাশে উড়ছে হরিৎ-লোহিত-স্বর্ণবর্ণ পতাকা।

অবিচার-অসন্তোষ-আন্দোলন-নিপীড়ন-সংগ্রাম-স্বাধীনতার এই যে আশ্চর্য কাহিনী, এর শুরু করব কোথা থেকে? আটচল্লিশের সেই উজ্জ্বল দিনটি থেকে, জিন্না-সাহেবের মুখের উপরে বাঙালী ছেলেরা যেদিন স্পষ্ট বলেছিল, "আমরা উর্দু চাই না, বাংলা চাই"? নাকি চুয়ান্নর সেই দীপ্ত দিবস থেকে, নির্বাচনী যুদ্ধে মুসলিম লীগকে চূড়ান্তভাবে হারিয়ে দিয়ে এবং তার সাম্প্রদায়িকতার নীতিকে বাংলার মাটিতে কবর দিয়ে এক জাগ্রত জনসমাজ যে-দিন ওই পূর্বখণ্ডে রুখে দাঁড়িয়েছিল? আমরা কি সেই অভাবিত সাফল্যের নায়ক শের-এ-বাংলা ফজলুল হকের উপরে আলো ফেলে শুরু করব এই ধারাবিবরণী? নাকি আলো ফেলব তাঁর সেদিনকার সেই মন্ত্রিসভার কনিষ্ঠ সদস্যের উপর—নাম যাঁর শেখ মুজিবুর রহমান?

একেবারে শুরুর থেকেই শুরু করা যাক।

১৯৪৭ সনের অগস্ট মাস। ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হল। রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে জন্ম নিল দুই স্বাধীন রাষ্ট্র। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান। কিন্তু ধর্মকেন্দ্রিক যে দ্বিজাতিতত্ত্বের উপরে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, সেই তত্ত্বেরই যে কোনও ভিত্তি নেই, পাকিস্তানের পূর্বখণ্ডের মানুষদের সে-কথা বুঝতে বিশেষ দেরি হয়নি। অচিরে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, বিভিন্ন রুচি, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও বিভিন্ন স্বার্থের মানবগোষ্ঠীকে যদি শুধু ধর্মীয় ঐক্যের রজ্জুতে

AMARBOI.COM

বেঁধে এক-রাষ্ট্রের পতাকাতলে সংহত করা সম্ভব হত, খ্রীষ্টীয় ইউরোপে তবে পৃথক-পৃথক এতগুলি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটত না, এবং মুসলিম মধ্যপ্রাচ্যেও তবে অসংখ্য পতাকার বদলে মাত্র একটিই রাষ্ট্রীয় পতাকা উড়ত।

এই উপলব্ধিকে ত্বরান্বিত করেছিল শাসক-গোষ্ঠীরই অবিচার ও অত্যাচার। মুখে তাঁরা মুসলিম ঐক্যের কথা বলতেন, কিন্তু কার্যত যে-সব ব্যবস্থা তাঁরা নিচ্ছিলেন, তাতে প্রথমাবধিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, পূর্বখণ্ডকে শোষণ করে পশ্চিমখণ্ডের সমৃদ্ধিসাধনই তাঁদের লক্ষ্য। বাঙালী মুসলিমদের সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানের ঘৃণার ভাবও গোপন থাকেনি। ১৯৫২ সনেই ফিরোজ খাঁ নুন বলেছিলেন, এরা আধা-মুসলিম। (পরে আয়ুব খাঁর আত্মজীবনীতেও এই ঘৃণার অভিব্যক্তি দেখতে পাই। "বেঁটে ও কুচ্ছিত" বাঙালীদের উদ্দেশে তিনি সেখানে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ফোয়ারা ছুটিয়েছেন।) তা ছাড়া, পূর্ববঙ্গের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি কোনও দিনই পাক-শাসকগোষ্ঠীর কাছে সেই গুরুত্ব ও মর্যাদা পায়নি, আপন অধিকারেই যা তার প্রাপ্য ছিল। বুঝতে অসুবিধা হয় না, বাঙালী জনসমাজের নিজস্ব যে একটি জাতীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় রয়েছে, পশ্চিমী প্রভুরা তাকে সর্বৈব ঘুচিয়ে দিয়ে পূর্বখণ্ডের মানুষদের বস্তুত এক নামহীন পরিচয়হীন নকলনবিস দাসের জাতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। আয়ুব খাঁর আত্মজীবনীর নাম 'ফ্রেন্ডস, নট মাস্টার্স'। কিন্তু অনায়াসেই ওই বইয়ের নাম হতে পারত 'মাস্টার্স অ্যান্ড স্লেভস'। শুধু তিনি কেন, তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পাক-কর্তাদের কেউই কখনও বাঙালীদের সঙ্গে প্রভু-ভৃত্য ছাড়া অন্য কোনও সম্পর্ক স্থাপনের কথা ভাবেননি।

ভাবা উচিত ছিল। কেননা, বাঙালীদের মুখের ভাষা কাড়তে গিয়ে স্বয়ং কায়দে আজম মহম্মদ আলী জিন্নাও নিষ্কৃতি পাননি। ১৯৪৮ সনের ২১শে মার্চ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বয়স তখন সদ্য সাত মাস পেরিয়েছে। নবলব্ধ স্বাধীনতার উদ্দীপনা তখন পূর্বখণ্ডেও কিছু কম নয়, এবং জিন্না নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন যে, সেই উদ্দীপনার জোয়ারের মধ্যেই তাঁর ভাষাগত

ঢাকা শহরে ধর্মঘট। রাজপথে মিছিল। হাজার হাজার ছাত্র, সাধারণ মানুষ আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে উঁচিয়ে ধরেছে প্রতিবাদের পতাকা, বিক্ষোভের ফেস্টুন। মুজিব, অন্যান্য নেতারা তখন বিনাবিচারে কয়েদ খানায় আটক।

AMARBOI.COM

বক্তৃতামঞ্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ। সমবেত লক্ষ লক্ষ জনতার প্রতিনিধিরূপে তোফায়েলের কণ্ঠে ঘোষিত হল, চাই স্বায়ত্ত শাসন, চাই রাজবন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি। চাই না আয়ুবশাহীর সংগে এক বিন্দু আপস।

চক্রান্তকে তিনি সফল করে নিতে পারবেন। কার্যত কিন্তু তা পারা গেল না। 'উর্দু, শুধু উর্দুই হবে পাকিস্তানের ভাষা'। জিন্না সেদিন ঢাকায় এ-কথা ঘোষণা করবামাত্র সেখানকার ছাত্রসমাজ তাঁর প্রতিবাদ জানাল। 'জাতির পিতা'র মুখের উপরে তারা শুনিয়ে দিল, বাংলা ভাষাকেও জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিতে হবে।

জিন্নার বোঝা উচিত ছিল, যা তাদের অশেষ গর্বের বস্তু, সেই ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপরে কোনও আক্রমণই বাঙালী জনসমাজ সহ্য করবে না। কিন্তু জিন্না সে-কথা বোঝেননি। তাঁর পরবর্তী শাসকেরাই বা বুঝলেন কই? কখনও গোপনে, কখনও সরাসরি, কখনও নানা ফন্দিফিকিরের জাল বিছিয়ে তাঁরাও চেষ্টা করতে লাগলেন পূর্বখণ্ডের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিভিত্তিক স্বতন্ত্র সত্তাকে মুছে ফেলতে। বাংলা লিপির বদলে আরবী লিপির প্রবর্তনের জন্য পূর্বখণ্ডে কুড়িটি 'মডেল স্কুল' প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ হয়েছিল, তার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, বাংলা ভাষাকে, অন্তত চেহারায়, উর্দু করে দেওয়া। চক্রান্ত সফল হয়নি। যেমন উর্দুকে, তেমনি বাংলাকেও শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হিসেবে গণ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন পশ্চিমী প্রভুরা। গোটা পূর্বখণ্ড জুড়ে দেখা দিয়েছিল ভাষা-আন্দোলন। বুকের রক্ত ঢেলে মুখের ভাষার অধিকার রক্ষা করবার জন্য দলে-দলে এগিয়ে এসেছিলেন ছাত্র ও যুবসমাজ। পাকিস্তানের শাসক-চক্র সেই অভূতপূর্ব আন্দোলনের সামনে নতিস্বীকারে বাধ্য হলেন। কিন্তু তার আগে, আন্দোলন দমনের জন্য, যে কী হিংস্র চেহারায় তাঁরা দেখা দিয়েছিলেন, তা কারও অজানা নয়।

১৯৫১ সনের ৬ এপ্রিল তারিখে গোটা পূর্ববঙ্গ জুড়ে উদ্‌যাপিত হয়েছিল 'জাতীয় ভাষা দিবস'। দাবি করা হয়েছিল, বাংলা ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে গণ্য করা হোক। দাবি আদায়ের জন্য শুরু হয়েছিল আন্দোলন। তার তীব্রতা দিনে-দিনে বাড়তে থাকে। শহরে-গঞ্জে-গ্রামাঞ্চলে তার তরঙ্গ দিনে-দিনে ছড়িয়ে যেতে থাকে। অন্যদিকে চলছিল ধরপাকড়।

নিগ্রহ দিনে-দিনে বাড়ছিল। কিন্তু আন্দোলন তবু থামেনি। বরং, শাসকচক্রের বাঁধন যতই শক্ত হচ্ছিল, ততই দুর্জয় হয়ে উঠছিল পূর্বখণ্ডের প্রতিজ্ঞা।

কয়েকটা মাস পরের কথা। ১৯৫২ সনের ফেব্রুয়ারি। আন্দোলনের জোয়ারে সারা পূর্ববঙ্গ তখন টলমল, উত্তাল। ঢাকার ছাত্রেরা সুদীর্ঘ এক মিছিল বার করলেন। একুশ তারিখে গুলি চলল তাঁদের উপরে। কিন্তু ছাত্র ও যুবসমাজ তবু অটল। গুলি চলেছিল বাইশ তারিখেও। ঢাকার রাজপথ রক্তে ভেসে গিয়েছিল। কিন্তু আন্দোলন তবু স্তব্ধ হয়নি। নজন ছাত্রের ন'টি তাজা প্রাণকে নিমেষে নিবিয়ে দিয়েছিল পাক-শাসকদের বন্দুক। কিন্তু বঙ্গভাষা সম্পর্কে বাঙালী জনসমাজের মমতাকে তবু ঘুচিয়ে দেওয়া যায়নি। পূর্বখণ্ডের মানুষের বুকে একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখটি রক্তের অক্ষরে আজও ফুটে আছে। চিরকাল থাকবে।

পূর্ব বাংলার জনজীবনে ভাষা-আন্দোলনের সবচাইতে বড় দান এই যে, পশ্চিমী শাসকচক্রের সর্বাত্মক ষড়যন্ত্রকে তা সার্বিকভাবেই বাঙালী জনসাধারণের চোখে স্পষ্ট করে দিয়েছিল। অত্যাচার তো শুধু ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চলছিল না, চলছিল সর্বক্ষেত্রেই। যেমন সাংস্কৃতিক, তেমনি সামাজিক আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পাকিস্তানের পূর্বাংশ কখনও পশ্চিমের কাছে সুবিচার পায়নি। বাহান্ন সনের নিগ্রহের পরে সেই

AMARBOI.COM

সর্বাত্মক অবিচারের চেহারাটা আরও স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে পূর্বখণ্ডের মানুষদের চোখে ধরা পড়ে যায়। ফলে, তখন থেকেই অটোনমির দাবি ক্রমে প্রবল হতে থাকে। বাঙালীরা বুঝতে পারেন, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার না-পাওয়া পর্যন্ত সার্বিক এই অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

পরবর্তী ইতিহাস মুসলিম লীগের বিপর্যয়ের ইতিহাস। পূর্ব বাংলায় যাঁরা মুসলিম লীগের কর্তাব্যক্তি ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশেরই ভূমিকা বস্তুত তল্পিবাহীর ভূমিকা। যে রাজনীতি তাঁরা করতেন, পশ্চিমী শাসকগোষ্ঠীর শোষণের পথ পরিষ্কার করা ছাড়া তার আর অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। চুয়ান্নর নির্বাচনে তাঁরা উৎখাত হয়ে গেলেন। লীগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন বিভিন্ন দলের যুক্ত ফ্রন্ট। প্রাদেশিক বিধানসভার ৩০৯টি আসনের মধ্যে ফ্রন্ট পেলেন ২১৫টি আসন। অর্থাৎ মোট আসন-সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশেরও বেশী এল ফ্রনটের দখলে।

কিন্তু এই বিপুল গরিষ্ঠতা সত্ত্বেও ফ্রনট-সরকার দীর্ঘায়ু হতে পারেননি। ৩ এপরিল তারিখে

বর্ষীয়ান রাজনীতিক ফজলুল হকের নেতৃত্বে ফ্রন্ট-মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করলেন; তারপর মাত্র দু' মাস পার না হতেই, ৩০ মে তারিখে, সেই মন্ত্রিসভাকে খারিজ করে দেওয়া হল।
হক সাহেব ইতিমধ্যে কলকাতায় এসে ঘোষণা করেছিলেন যে, দুই বাংলার মধ্যে যে মিথ্যার প্রাচীর খাড়া করে রাখা হয়েছে, তা তিনি চূর্ণ করবেন। শুনে, পাক-কর্তারা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কেননা, পাঁচিলটা তাঁরাই তুলেছিলেন; দুই বাংলার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক লেন-দেন বন্ধ হবার দায়িত্ব তাঁদেরই। তল্পিবাহী লীগের পরাজয়ে এমনিতেই তাঁরা তখন নিদারুণ অস্বস্তির মধ্যে আছেন, এখন ফজলুল হকের এই ঘোষণায় তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ঠিক করলেন, ফ্রন্ট-মন্ত্রিসভাকে আর টিকতে দেওয়া হবে না।
হক-সরকারকে পদচ্যুত করবার কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, পূর্ববঙ্গে তাঁরা শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারেননি। কিন্তু কে না জানে, অশান্তি আর উচ্ছৃঙ্খলার আগুন জ্বালিয়েছিলেন স্বয়ং পাক-কর্তারাই। ফ্রন্ট-মন্ত্রিসভাকে খারিজ করবার অজুহাত সৃষ্টির জন্য পাক-কর্তাদের ইঙ্গিতেই যে সেদিন নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিলে দাঙ্গা বাধানো হয়েছিল, তা কে না জানে।
শুধু জনপ্রিয় একটি মন্ত্রিসভাকে খারিজ করেই পশ্চিমী প্রভুরা সেদিন ক্ষান্ত হননি। হক-সাহেবকে তাঁরা গৃহবন্দী করে রাখলেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে পাঠালেন জেলখানায়। আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে যে পঙ্গু সরকারকে গদিতে বসানো হল, তাঁদের দিক থেকে কার্যকর কোনও বাধা আসবার প্রশ্নই ছিল না। পশ্চিমী প্রভুত্ব ও শোষণ অতএব আগের মতই অবাধে চলতে লাগল।
হক-সাহেবের হ্রস্ব শাসনের আমলেই অবশ্য বাঙালীদের একটা উল্লেখযোগ্য জয় সম্ভব হয়েছিল। চুয়ান্ন সনের ৭ মে তারিখে পাক গণ-পরিষদ এই মর্মে একটি প্রস্তাব পাশ করতে বাধ্য হয় যে, বাংলা ও উর্দু দুই-ই হবে পাকিস্তানের সরকারী ভাষা।
চুয়ান্ন থেকে আটান্ন, এই কয়েকটা বছরে যেমন পূর্ববাংলার প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থায়, তেমনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থাতেও ঘোর অস্থির অবস্থা চলতে থাকে।

ছাপ্পান্ন সনে সুরাবর্দী প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, সাতান্ন সনে তাঁকে বিদায় নিতে হল। এলেন ফিরোজ খাঁ নুন। কিন্তু তিনিও বেশীদিন গদিতে থাকতে পারেননি। আটান্নর ৭ অকটোবর তারিখে প্রেসিডেন্ট ইসকানদর মির্জা সংবিধান বাতিল করলেন। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলিও পদচ্যুত হল। গোটা দেশে প্রবর্তিত হল সামরিক আইন। এই আটান্ন সনেই পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা পুরোপুরি ফৌজী নায়কদের হাতে চলে যায়। মির্জাকে তাড়িয়ে জেনারেল আয়ুব খাঁ হন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট।
পাক রাজনীতিতে যে ইতিমধ্যে অনেক নোংরামি ঢুকেছিল, তাতে সন্দেহ নেই; এবং—সত্যের খাতিরে স্বীকার করা ভাল—অন্তত প্রথম দিকে এমন একটা আশা অনেকের মনে দেখা দিয়েছিল যে, আয়ুব হয়ত দেশের শাসন-কাঠামোকে সেই নোংরামি থেকে কিছুটা মুক্ত করতে পারবেন। কার্যত দেখা গেল, সেটা নেহাতই দুরাশা। প্রথম-প্রথম দু-চারজন চোরাকারবাররীকে প্রকাশ্যে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু অচিরে বোঝা গেল, সামরিক শাসন এমন কোনও সালসা নয়, যাতে সর্বরোগের উপশম হওয়া সম্ভব।
শাসন-যন্ত্রে দুর্নীতি বস্তুত দিনে-দিনে আরও বাড়তে লাগল। গান্ধারা ইনডাস্ট্রিজের দ্রুত সমৃদ্ধির নেপথ্য-ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁরাই বললেন, আয়ুব স্বয়ং তাঁর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন, তাঁর পুত্রের মুনাফা বাড়াবার জন্য। অন্য দিকে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার ইতিমধ্যে যেহেতু কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কারও রা কাড়বার উপায় ছিল না। আয়ুব অবশ্য বেসিক ডিমোক্রেসি বা বুনিয়াদী গণতন্ত্র নামে এক অদ্ভুত বস্তু ইতিমধ্যে চালু করেছিলেন। কিন্তু তার চেহারা দেখেই টের পাওয়া গিয়েছিল যে, গণতন্ত্র বলতে লোকে যা বোঝে, তার সঙ্গে এই বস্তুটির কোনও সুদূরতম সম্পর্কও নেই। নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র অনিয়ন্ত্রিত ভণ্ডামির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।
উপরন্তু দেখা গেল, পূর্বখণ্ড সম্পর্কে আয়ুবও সেই চিরাচরিত শোষণের নীতিই চালাচ্ছেন। দশ বছর ক্ষমতায় ছিলেন আয়ুব। ফৌজী শাসক-চক্র এই দশ বছরকে 'ডিকেড অব ডেভেলাপমেন্ট' আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন, এই সময়টায় উন্নতি হয়েছিল কার? রাষ্ট্র হিসেবে সমগ্র পাকিস্তানের? নাকি শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের কুখ্যাত সেই বাইশটি পরিবারের, স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা যাঁদের মুঠোর মধ্যে ইতিমধ্যে চলে এসেছিল? পাকিস্তানের মোট শিল্পোদ্যোগের শতকরা আশি ভাগই আয়ুবের আমলে

AMARBOI.COM

এই বাইশটি পরিবারের দখলে চলে আসে। বলা বাহুল্য, দেশের পশ্চিমাংশের সমৃদ্ধি ইতিমধ্যে কম ঘটেনি। কিন্তু তার মূল্য দিতে হয়েছে প্রধানত পূর্বাংশকে। বাঙালী জনসমাজকে বঞ্চিত রেখে, আর শোষণ করে পশ্চিমী প্রভুরা আরও ফুলে-ফেঁপে উঠেছেন।

শুধু তা-ই নয়, সংবিধানে বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সংবিধান ইতিমধ্যে বাতিল হওয়ায় বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ পুনশ্চ অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়াল। আয়ুবের উক্তি সেই অনিশ্চয়তাকে আরও বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশের হাটে 'বেসিক ডিমোক্রেসি'কে বিকোতে এসে ভাষার প্রশ্নে আয়ুব যখন বলেছিলেন, "সারি জবান্ মিলিজুলি কর্ এক জবান্ বানা চাহিয়ে; উয়ো উর্দু নেহি, উয়ো বংলা ভি নেহি, উয়ো পাকিস্তানী জবান্" বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা তখন এই ভেবে আতঙ্ক বোধ করেছিলেন যে, অশিক্ষিত ফৌজী জমানার অত্যাচারে বঙ্গভাষার নাভিশ্বাস উঠতে অতঃপর দেরি হবে না।

ক্ষমতার গদিতে আয়ুবও অবশ্য টিকে থাকতে পারেননি। পঁয়ষট্টিতে তিনি ভারতবর্ষের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মীয় জিগির তুলেও পূর্বখণ্ডকে যে তিনি আর ভোলাতে পারেননি, তার কারণ, সেখানকার মানুষদের চোখ ইতিমধ্যে খুলে গিয়েছিল। আটষট্টিতে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে জেলে পুরেছিলেন, কিন্তু 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' সাজিয়েই বা বাঙালীদের তিনি ধোঁকা দিতে পারলেন কই? জনসাধারণ তার অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, কে তাঁদের শত্রু, আর কে তাঁদের প্রকৃত বান্ধব। ফৌজী শাসনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। আয়ুব তার ফলে ১৯৬৯ সনের ১ জানুয়ারি তারিখে সাজানো-মামলা প্রত্যাহার করে মুজিব ও তাঁর সহকর্মীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন। ওদিকে, যেমন পূর্ববঙ্গে, তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানেও আন্দোলন দিনে-দিনে উত্তাল হয়ে উঠতে থাকে। আন্দোলনের লক্ষ্য : গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার। লাঠি আর বন্দুক চালিয়ে তাকে রোখা গেল না। বিক্ষুব্ধ জনতরঙ্গে আয়ুবশাহি ভেসে গেল।

কিন্তু ফৌজী শাসনের তবু অবসান ঘটল না। অতঃপর এলেন। এলেন আগা মহম্মদ ইয়াহিয়া খাঁ। ইয়াহিয়া সম্পর্কে প্রথম-প্রথম এই রকমের একটা ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা চলছিল যে, তিনি অনিচ্ছুক স্বৈরশাসক, ফৌজী শাসনকে জিইয়ে রাখতে চান না, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চান। ১৯৬৯ সনের ২৫ মার্চ তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন; তার আট মাস বাদে, ২৮ নভেমবর, তিনি ঘোষণা করলেন যে, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, নির্বাচন হবে সত্তর সনের ৫ অকটোবর তারিখে। পরে, সেটাকে আরও দু' মাস পিছিয়ে দেওয়া হয়। ৭ ডিসেমবর নির্বাচনের দিন বলে ধার্য হল।

মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ী জ্বলছে ঢাকার রাস্তায়, জনতার রাগের আগুনে। পুলিশ ও মিলিটারীর অত্যাচারের প্রতিবাদে পথে পথে জনতার পাল্টা আক্রমণ, সংঘবদ্ধ পাহারা।

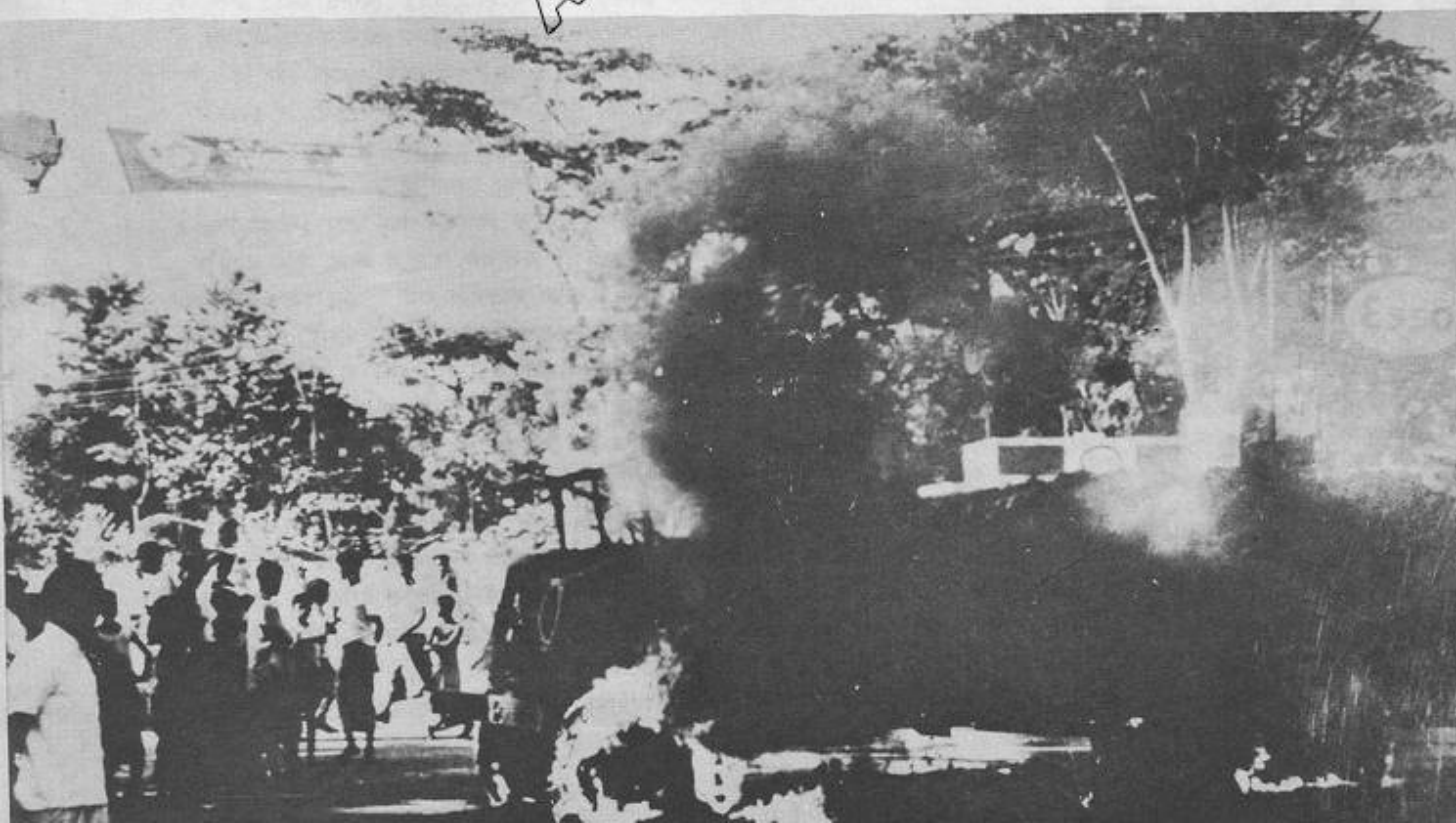

AMARBOI.COM

ঢাকা থেকে কারফিউ উঠে যাবার পর, টাঙ্গাইলে ছাত্র-হত্যা, শহরে ছাত্রনেতাদের গ্রেপ্তার, পুলিশী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ছাত্র-সমাবেশ। ভাষা-আন্দোলনের বিরাট লড়াইয়ে নামার আগে এগুলি যেন ছোট ছোট প্রস্তুতিপর্ব।

AMARBOI.COM

নির্বাচনের প্রসঙ্গে যাবার আগে গোটাকয় জরুরী কথা বলে নেওয়া দরকার।

সবচাইতে জরুরী কথাটা এই যে, পশ্চিমী শাসকবর্গের মনোভাব সম্পর্কে পূর্বখণ্ডের ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ মোহমুক্তি ঘটেছিল। বাঙালী জনসমাজ স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন, পশ্চিমের কাছে একমাত্র বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই তাঁদের জোটেনি। একদিকে যেমন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বছরের পর বছর তাঁরা অত্যাচারিত হয়েছেন, এবং সামাজিক সুবিচার আদৌ পাননি, অন্যদিকে—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে—তেমনি দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা ধোঁকাবাজির শিকার হয়েছেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক লেনদেনের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলে তাঁদের লাভ বই লোকসান নেই, কিন্তু পশ্চিমী শাসকরা সেই সম্পর্ক তাঁদের কোনদিনই গড়ে তুলতে দেবেন না। তাঁরা বেশী দাম দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের পণ্য কিনতে বাধ্য হবেন, কিন্তু অন্য কোনও সূত্রে স্বল্পমূল্যে তা সংগ্রহ করতে পারবেন না। তাঁদের শিল্পায়ন বরাবর উপেক্ষিত থাকবে; বছরের পর বছর তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানকে শুধু কাঁচামাল যুগিয়ে যাবেন মাত্র। অথচ, জনসংখ্যায় তাঁরাই পাকিস্তানের গরিষ্ঠ অংশ, তাঁদেরই চা আর পাট বৈদেশিক মুদ্রার যোগান দেয়, আর তাঁদেরই শোষণ করে স্ফীত হয়ে উঠছে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি। সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ, কখনও চক্রান্ত করে আর কখনও চোখ রাঙিয়ে, সংখ্যাগরিষ্ঠদের দাবিয়ে রেখে, নিজেদের ঐশ্বর্য বাড়িয়ে যাচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদী যে-কোনও দেশ তার উপনিবেশকে যেভাবে শোষণ করে, ঠিক সেইভাবেই পূর্বখণ্ডকে বরাবর শোষণ করেছে পশ্চিমখণ্ড। গোটা পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য বাইরে থেকে যে সাহায্য এসেছে, তারও সিংহ-ভাগ দখল করেছে পশ্চিম-পাকিস্তান, পূর্বাংশ

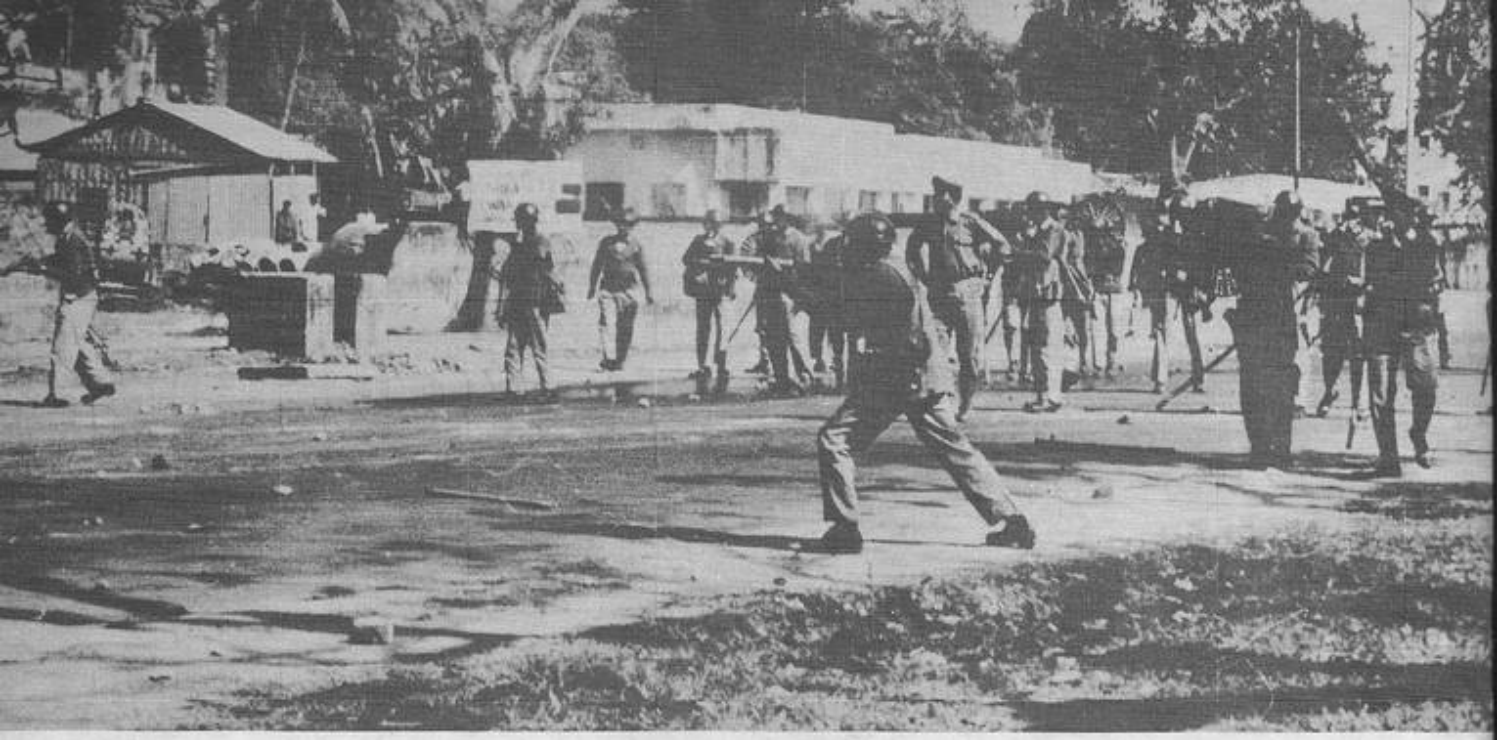

AMARBOI.COM

উপরে
ঢাকার পথে রাইফেল উঁচিয়ে
মিলিটারির তাণ্ডব।

নীচে
রেলকর্মীরা নিজেরাই এগিয়ে এসে
থামিয়ে দিচ্ছেন ঢাকাগামী
প্যাসেঞ্জার ট্রেন। শহরে সেদিন
সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ
ধর্মঘট।

পাশের পাতায়
ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড
তৈরী করছে জনতা।

"সারি জবান মিলিজুলি কর
এক জবান বানা চাহিয়ে, উয়ো
উর্দু নেহি, উয়ো বংলা ভি নেহি,
উয়ো পাকিস্তানী জবান্।"

প্রায় কিছুই পায়নি। পূর্বখণ্ড যে দীর্ঘকাল ধরে কীভাবে অবহেলিত হয়েছে, কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। পাকিস্তানের জন্মলগ্নে অর্থাৎ ৪৭-৪৮ সনে পশ্চিমাংশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে আট হাজার, আর পূর্বাংশে উনত্রিশ হাজারেরও কিছু বেশী। ১৯৬৮-৬৯ সনে সেক্ষেত্রে দেখা গেল, পশ্চিমাংশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সাড়ে আট হাজার থেকে প্রায় চল্লিশ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে, আর পূর্বাংশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ইতিমধ্যে একটও বাড়েনি, বরং হাজার দেড়েক হ্রাস পেয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাধারণ কলেজ, মেডিক্যাল-ইনজিনিয়ারিং-কৃষি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ডিগ্রীধারীর সংখ্যা— যা-কিছুর হিসেব নেওয়া যাক, দেখা যাবে, বৃদ্ধির হার পশ্চিমাংশে অনেক বেশী। পশ্চিম পাকিস্তানে জনসংখ্যা কম, অথচ ডাক্তারের সংখ্যা সেখানে পূর্ববঙ্গের প্রায় দ্বিগুণ; হাসপাতালের শয্যা-সংখ্যা পূর্ববঙ্গের চার গুণেরও বেশী; পল্লী-স্বাস্থ্য-কেন্দ্র পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে উঠেছে ৩২৫টি, আর পূর্ববঙ্গে মাত্র ৮৮টি। পাকিস্তানের বিভিন্ন উন্নয়ন-প্রকল্পে যে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়িত হয়, তার শতকরা আশি ভাগ ঢালা হয় পশ্চিমাংশে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সাহায্য দেয়, তার শতকরা ছেষট্টি ভাগ পায় পশ্চিমাংশ; আর অন্যান্য দেশ যে সাহায্য দিয়ে থাকে, পূর্বাংশ তার শতকরা চার ভাগের বেশী পায় না। গৃহনির্মাণ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ অর্থের শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ ব্যয়িত হয় পশ্চিমাংশে।

যেমন অর্থবিনিয়োগ, তেমনি চাকরি-বণ্টনের ব্যাপারেও পূর্ববঙ্গ বরাবরই নগ্নতম অবিচারের শিকার হয়েছে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সিবিল সার্ভিসের শতকরা চুরাশি ভাগই রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দখলে, বাঙালীরা পেয়েছেন শতকরা ষোল ভাগ। ফরেন সার্ভিসের ক্ষেত্রেও বাঙালীদের অদৃষ্টে শতকরা পনের ভাগের বেশী জোটেনি। আর সৈন্যবাহিনীতে যেক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যা পাঁচ লাখ, বাঙালীদের সংখ্যা সেক্ষেত্রে মাত্র কুড়ি হাজার।

কৃষিক্ষেত্রেও একই বৈষম্যের ছবি। চৌষট্টি থেকে আটষট্টি সনের মধ্যে পাকিস্তানে যে সার বণ্টিত হয়েছিল, তার শতকরা ছেষট্টি ভাগ পায় পশ্চিম পাকিস্তান। ওই একই সময়ে বণ্টিত উন্নত শসাবীজেরও শতকরা উননব্বই ভাগই পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষিজীবীরা পেয়েছিল। ট্রাকটরেরও শতকরা একানব্বইটি রাখা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, বাঙালী কৃষিজীবীরা শতকরা ন'টির বেশী পায়নি।

আর শিল্পোন্নয়নের কথা না তোলাই ভাল। পশ্চিমী শাসক-চক্র পূর্বখণ্ডকে বস্তুত বিক্রির বাজার হিসেবেই দেখতেন; এমন বাজার, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের কল-কারখানায় তৈরী ভোগ্যপণ্যকে বরাবর চড়া দামে বিক্রি করে অবাধে মুনাফা লোটা যাবে। এ-ব্যাপারে পূর্ববঙ্গকে

AMARBOI.COM

চিরকাল পশ্চিম পাকিস্তানের খদ্দের করে রাখাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য; ফলে সেখানে শিল্পোন্নয়নের আদৌ কোনও চেষ্টা তাঁরা করেননি।

সন্দেহ নেই যে, যাকে আমরা বাঙালী জাতীয়তাবোধ বলে জানি, মূলত ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই পাকিস্তানের পূর্বখণ্ডে তার প্রথম-বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। পরে, সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানী বঞ্চনা ও অত্যাচারের চেহারা যত স্পষ্ট হতে থাকে, বাঙালী জনমানসে সেই বোধের শিকড় ততই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যায়। ততই তাঁরা পশ্চিম থেকে চোখ ফিরিয়ে নেন, এবং রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দের আবহমান বাংলার ভাবাদর্শের মধ্যে নিজেদের মুক্তি খুঁজতে থাকেন। রবীন্দ্রবর্জনের বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক-সমাজ, তাকে— বিশুদ্ধ সাহিত্যপ্রীতির তো বটেই, প্রগাঢ় জাতীয়তাবোধেরও অভিব্যক্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করতে পারি।

যদি বলি যে, শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দেশবাসীর কাছে সেই প্রগাঢ় জাতীয়তাবোধেরই মূর্ত প্রতীক রূপে দেখা দিয়েছিলেন, তা হলে ভুল বলা হবে না। তাঁর আওয়ামী লীগ যে ছ'-দফা দাবির ভিত্তিতে নির্বাচনে নেমেছিল, পূর্বখণ্ডের অধিবাসীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, বস্তুত তা বাঙালী জাতির রক্ষাকবচ। দাবিগুলি আদায় হলে তবেই পশ্চিমী অত্যাচারের কবল থেকে বাঙালীরা রক্ষা পাবে ও স্বতন্ত্র একটি জাতি হিসেবে টিকে থাকতে পারবে। অন্যথায় তাঁদের বিলুপ্তি অনিবার্য।

সমগ্র বাঙালীসমাজ শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগের পতাকাতলে এসে সমবেত হলেন। তার ফল কী হয়েছিল, তা কারও অজানা নয়। প্রাদেশিক পরিষদের মোট ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮টিই পেল আওয়ামী লীগ। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল আরও চমকপ্রদ। পূর্ববঙ্গের জন্য বরাদ্দ আসন-সংখ্যার মধ্যে মোট ১৬২টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। তার ১৬০টিই পেলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা। পশ্চিম ও পূবের বরাদ্দ মিলিয়ে পুরো জাতীয় পরিষদের মোট আসন-সংখ্যা ৩১৬। আওয়ামী লীগ পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক পরিষদে তো নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলই, জাতীয় পরিষদের ১৬০টি আসন দখল করায় সেখানেও তার গরিষ্ঠতা হল নিরঙ্কুশ।

পশ্চিমী শাসকচক্র প্রমাদ গণলেন। মুজিবের জনপ্রিয়তার খবর তাঁরা রাখতেন, কিন্তু তাঁর জয় যে এতটাই চমকপ্রদ হবে, তা নিশ্চয় তাঁদের হিসেবে ছিল না। এখন তাঁরা দেখলেন যে, শুধু পূর্বখণ্ড নয়, গোটা পাকিস্তানেই বাঙালীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। অতঃপর আবার নতুন করে শুরু হল তাঁদের নগ্ন, বীভৎস ষড়যন্ত্রের খেলা। 'অনিচ্ছুক স্বৈরশাসক' ইয়াহিয়া খাঁর মুখোশ নিমেষে খসে পড়ল। মুখোশের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম ডিকটেটরের মুখ।

৭ মার্চ ১৯৭১। মুজিবের ডাকে জনসভায় শপথ নিচ্ছে লক্ষ লক্ষ বাঙালী। আর ইয়াহিয়ার মিলিটারি শাসন নয়। নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা চাই।

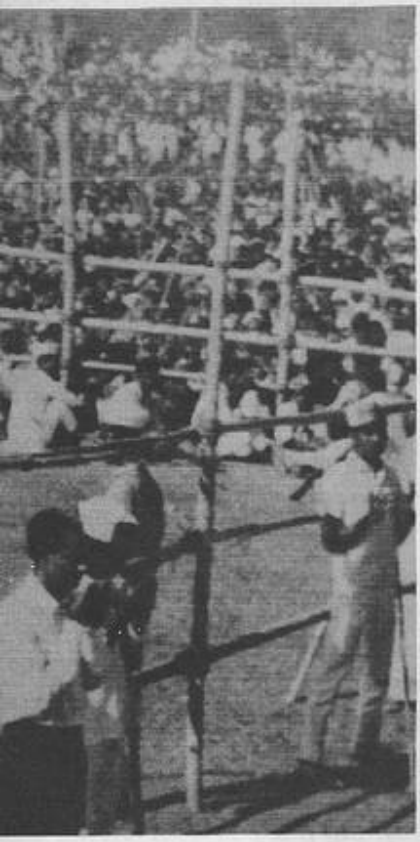

AMARBOI.COM

পঁচিশে মারচের আগে মঞ্চে ও নেপথ্যে

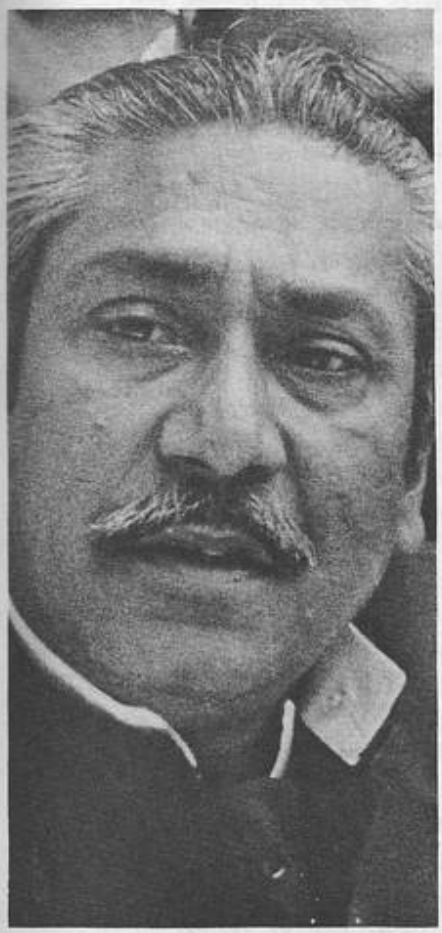

চক্রান্তের নীল নক্‌শা তৈরী হয়েছিল আগেই। কেবল দিনক্ষণ, সময় ও সুযোগ বুঝে তা কাজে লাগানোর অপেক্ষা। সে অপেক্ষার ক্ষণও বুঝি শেষ হয়েছিল পঁচিশে মারচ তারিখে রাত বারোটায়। কিন্তু তার আগেও মঞ্চে নাটক হয়েছে, মহড়া চলেছে। কখনও প্রকাশ্যে, কখনও নেপথ্যে। এই মঞ্চ ও নেপথ্যের কাহিনীর মধ্যেই রয়েছে চক্রান্তের ব্লুপ্রিন্ট বা নীল নক্‌শার কিছুটা আভাস।

তাই একটু পিছিয়ে এই কাহিনীর শুরু। তেসরা জানুয়ারী তারিখে ঢাকার রেস কোরসে বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক জনসভা থেকে শুরু করি বয়ান। নির্বাচন-বিজয়ী আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যেরা এই সভায় বাঙলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবীতে অটল থাকার শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্বয়ং শেখ মুজিব। তিনি ঘোষণা করেন, ছয় দফার ভিত্তিতে দেশের শাসনতন্ত্র অবশ্যই রচিত হবে। ঠিক এর তিন দিন পর ৭ই জানুয়ারী তারিখে এক অভাবনীয় ঘটনা। শেখ মুজিবের বাসভবনে ধৃত হল ছোরাসহ এক যুবক। পুলিশী জেরায় সে স্বীকার করল, শেখ সাহেবকে হত্যার জন্য তার উপর নির্দেশ ছিল। কাদের এই নির্দেশ তা জানা যায়নি। একদিন পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের জীবন রক্ষা পাওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করে বাণী পাঠান ঢাকায়। আরও একদিন পর তিনি এলেন ঢাকায়। উদ্দেশ্য, শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা। এগারোই জানুয়ারী হল মুজিব-ইয়াহিয়া রুদ্ধদ্বার বৈঠক। তেরই জানুয়ারী হল তিনঘণ্টাব্যাপী মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক। এই বৈঠকে শেখ মুজিবের সঙ্গী ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, খোনদকার মুশতাক আহমদ, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামান। পরদিন চৌদ্দ জানুয়ারী তারিখে করাচি প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে ঢাকা বিমান বন্দরে ইয়াহিয়া বললেন, 'শেখ মুজিব দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী। আরও বললেন, 'শেখ মুজিবের সরকার শীঘ্রই ক্ষমতা গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। তিনি (শেখ মুজিব) যখন ক্ষমতা গ্রহণ করবেন, তখন আমি ক্ষমতায় থাকবো না। দেশের এক বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক কাঠামো আমি তার জন্য উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাব।' ১৭ জানুয়ারী তারিখে বাঙলা দেশের ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত এলাকায় স্থগিত রাখা জাতীয় পরিষদের ন'টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের একুশটি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সব ক'টি আসনেই আওয়ামী লীগ-প্রার্থীরা

AMARBOI.COM

শুক্রবার। ১৯ মার্চ। ১৯৭১। ঢাকায় পাক প্রেসিডেন্ট ভবনের সামনে তারের বেষ্টনী ও ফৌজী প্রহরা। ভবনের ভেতরে শেখ মুজিবের সঙ্গে ইয়াহিয়ার তৃতীয় চক্করের বৈঠক চলছে। ফৌজ আগ্রহী দর্শকদের দূরে সরিয়ে রাখছে।

জয়লাভ করেন। ২২ জানুয়ারী তারিখে পিপলস পার্টির নেতা জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা করেন, 'পাকিস্তানে একটি যুক্ত ফেডারেশন গঠনের প্রশ্নে তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে একমত।' ২৭ জানুয়ারীতে ভুট্টো এলেন ঢাকায়। উদ্দেশ্য শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা। ঢাকা বিমান-বন্দরে বললেন, সংখ্যা গরিষ্ঠের অভিমতের প্রতি তার শ্রদ্ধা রয়েছে। শেখ মুজিবের বাসভবনে তার এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হলেন ৭৫ মিনিটের জন্য। আলোচনা-শেষে ভুট্টো বললেন, এই বৈঠক দ্বারা সুখী ও সম্মানিত বোধ করছেন। ২৮ জানুয়ারীতে ভুট্টোর হোটেল কক্ষে আবার আলোচনা, ৭০ মিনিটের জন্য। দলীয় নেতারা আলাদাভাবে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা চালালেন। পরদিন তৃতীয় দফা মুজিব-ভুট্টো বৈঠক। বৈঠক শেষে ভুট্টো বললেন, একটি জনকল্যাণমূলক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য তিনি সবরকমে সহযোগিতা দেবেন। ৩০ তারিখে এম, এল, নাবিক জাহাজ যোগে মুজিব-ভুট্টোর নৌবিহার পাঁচঘণ্টাব্যাপী। সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব ভুট্টো শেখ মুজিবের সঙ্গে তার আলোচনা সফল হয়েছে কিনা এ প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'আমরা দু' নেতাই আলোচনায় সন্তুষ্ট। তবে আলোচনার দ্বার খোলা রইল। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতাদের মতামত জেনে অমীমাংসিত বিষয়গুলো আলোচনার জন্য আবার বৈঠকে বসব।'

বহুরূপী জনাব ভুট্টোর মঞ্চের দিকে ফেরানো মুখটিই মাত্র সেদিন দেখতে পেয়েছিল বাঙলা দেশের জনগণ। শীঘ্রই জাতীয় পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠান এবং গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের অঙ্গীকার পূর্ণ হওয়ার আশায় তারা উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু জনাব ভুট্টো নতুন চেহারা ধারণ করলেন ঢাকা থেকে লাহোর পৌঁছেই। এ যেন পূর্ব-নির্ধারিত ছক-কাটা প্রোগ্রাম। জনাব ভুট্টো ঢাকা থেকে লাহোর পৌঁছবার আগেই ৩০ জানুয়ারী তারিখে সারা দেশের মানুষ স্তম্ভিত বিস্ময়ে শুনল, কাশ্মীরি মুক্তিযোদ্ধা নামধারী দু'জন বিমান-দস্যু ভারতীয় বিমান 'গঙ্গা' জোর করে লাহোরে নামিয়েছে। শুরু হল, পাকিস্তানে চক্রান্তের রাজনীতির মঞ্চে নাটকের আরেক অঙ্কের অভিনয়।

মহড়াটা সম্ভবতঃ আগেই দেওয়া ছিল, এখন পূর্ব-নির্ধারিত কাজ শুধু দক্ষতার সঙ্গে করে যাওয়া। ৩১ জানুয়ারীতে ভুট্টো নামলেন লাহোর বিমান বন্দরে। পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ তাকে অবাধে বিমান-দস্যুদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দিলেন। তাদের গলায় হাত রেখে ভুট্টো অন্তরঙ্গভাবে অনেকক্ষণ আলাপ করলেন, তাদের কাজের যথেষ্ট প্রশংসা করলেন। জনাব ভুট্টোর প্রশংসায় উৎসাহিত বিমান-দস্যুরা ২ ফেব্রুয়ারী অপহৃত ভারতীয় বিমান 'গঙ্গা' বিনা বাধায় পাকিস্তানী প্রহরীদের চোখের সামনে ধ্বংস করে দেয়। বাঙলা দেশে কারো বুঝতে বাকি রইল না, পাকিস্তানের সামরিক জুনটা ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্য শেষ চাল হিসেবে ভারতের সঙ্গে বিবাদ ও উত্তেজনা সৃষ্টি এবং সেই বিবাদের

AMARBOI.COM

প্রেসিডেন্ট-ভবনে আলোচনার শেষে বেরিয়ে আসছেন বঙ্গবন্ধু। ১৯ মার্চ শুক্রবার জয়দেবপুরে ফৌজী গুলিতে অন্তত ৩০ জন সাধারণ মানুষ নিহত হন। তাই শেখ সাহেবের মোটরের বনেটে শোক-চিহ্ন কৃষ্ণপতাকা। সংগ্রামে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের স্মরণে।

অজুহাতে নব নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন না ডাকার সুযোগ গ্রহণ করতে চান। তাদের এই চক্রান্তে প্রধান সহযোগীর ভূমিকা নিয়েছেন জনাব ভুট্টো। ৩ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব এক বিবৃতিতে ভারতীয় বিমান অপহরণে দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং বললেন, 'ক্ষমতা হস্তান্তর বিঘ্নিত করার জন্য এটা পাকিস্তানের স্বার্থান্বেষী মহলের একটা বড় চক্রান্ত।' ওই একই তারিখে ভারত সরকার ভারতীয় এলাকার উপর দিয়ে পাকিস্তানের সামরিক বিমান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। (পরে অসামরিক বিমান চলাচলের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়।) ঝটিতি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ছুটে যান করাচীতে। এবার জনাব ভুট্টোর সঙ্গে মোলাকাত। সাংবাদিকদের কাছে ইয়াহিয়া বললেন, তিনি অবসর বিনোদন ও শিকারের জন্য করাচী এসেছেন। রাজনৈতিক আলোচনা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ৯ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব এক বিবৃতিতে বললেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন এখনও আহূত না হওয়ায় তিনি সামরিক জুনটার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। সঙ্গে সঙ্গে জনাব ভুট্টো ১০ ফেব্রুয়ারীতে মুলতানে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন, তারও অভিযোগ, সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব করছেন। সেই সঙ্গে তিনি আরও বললেন, 'যদি ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়, তাহলে তিনি আন্দোলন শুরু করবেন।' পরদিনই জনাব ভুট্টো আগের দিনের বক্তব্য অস্বীকার করলেন। বললেন, এমন কথা তিনি বলেননি। কতিপয় দেশী ও বিদেশী শক্তি দু'টি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এই প্রথম জনাব ভুট্টো প্রকাশ্যে এক দেশে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কথা ঘোষণা করেন। ১৩ ফেব্রুয়ারীতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন, ৩ মারচ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসবে। একই দিনে পাকিস্তানে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং জনাব ভুট্টো সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম লীগ-নেতা কাইয়ুম খানের সঙ্গে আলোচনা-বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকের পর ১৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে পেশোয়ারে এক সাংবাদিক বৈঠকে জনাব ভুট্টো নাটকীয় ভাবে ঘোষণা করলেন, '৬ দফার প্রশ্নে কোন আপোষ মীমাংসার সম্ভাবনা না থাকায় তার দলের পক্ষে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করা সম্ভব হবে না। তবে ৬ দফায় কোন রদবদল বা আপোষের প্রতিশ্রুতি দেয়া হলে তারা যে কোন দিন ঢাকা যাবেন।' জনাব ভুট্টোর এই হুমকি সম্পর্কে শেখ মুজিব কোন মন্তব্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানান। ১৭ ফেব্রুয়ারী তারিখে বালুচ নেতা নবাব আকবর খান বুগতি ঘোষণা করেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বানচাল করার জন্য জনাব ভুট্টো যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা পাকিস্তানের দু' অংশকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যেই নেয়া হয়েছে। ১৮ ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার জরুরী তলব পেয়ে জনাব ভুট্টো পিনডি রওয়ানা হন। একই তারিখে ঢাকায় জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার অফিসে একদল

AMARBOI.COM

প্রেসিডেন্ট ভবনে ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠকের পর বঙ্গবন্ধু মুজিবর গুরুগম্ভীর মুখে বেরিয়ে এলেন। উৎসুক ছাত্র-জনতা বৈঠকের অগ্রগতি জানতে তাঁকে ঘিরে ধরেছেন।

অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। আওয়ামী লীগ-সমর্থক একটি পত্রিকায় অভিযোগ করা হয়, 'ঢাকায় যাতে নির্ধারিত তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন না বসে, তার অজুহাত সৃষ্টির জন্যই স্বার্থান্বেষী মহলের এই চক্রান্ত। ভারতীয় বিমান অপহরণ ও ধ্বংস এবং ঢাকায় এই বোমা বিস্ফোরণের মধ্যে যোগসূত্র ও চক্রান্তের হাত সুস্পষ্ট।' ২১ ফেব্রুয়ারীর শহীদ দিবসে শেখ মুজিব পাকিস্তানের সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানালেন, 'আসুন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের আগেই আমরা ৬ দফা সম্পর্কে খোলাখুলি ও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করি। কিন্তু মঞ্চের নাটক ও নেপথ্যের মহড়া তখন অনেকদূর এগিয়ে গেছে। একুশে ফেব্রুয়ারীর পরই শুরু হল, পাকিস্তানের রাজনীতিতে দ্রুত ও নাটকীয় পট-পরিবর্তন।

২২ ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার অসামরিক মন্ত্রী পরিষদ বাতিল করে দেন এবং বিভিন্ন প্রদেশের গবরনর ও সামরিক আইন প্রশাসকদের নিয়ে বিশেষ বৈঠকে বসেন। একই দিনে কাইয়ুম খান ঘোষণা করেন, তার দলও জনাব ভুট্টোর দলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যাবেন না। ২৪ তারিখে শেখ মুজিব এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে ঘোষণা করলেন, 'জনসাধারণের নির্বাচনী বিজয় বানচাল করার প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য জনসাধারণের সতর্ক ও সজাগ হওয়া দরকার।' ওই তারিখে কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লীগের মত কাউনসিল মুসলিম লীগও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তারা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকা যাবেন না। ২৬ তারিখে প্রেসিডেনট ইয়াহিয়ার সঙ্গে জনাব ভুট্টোর গোপন বৈঠক ও দুপুরের ভোজ। ২৭ তারিখে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য ৬টি দলের ৩৩জন সদস্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ২৮ তারিখে জনাব ভুট্টো দাবী জানালেন, 'জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত রাখতে হবে। তবে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য নির্দিষ্ট ১২০ দিনের সময়সীমা বাতিল হলে তিনি অধিবেশনে যোগ দেবেন। পিপল্‌স্‌ পারটির সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়া পরিষদের অধিবেশন বসলে তিনি খাইবার থেকে করাচী পর্যন্ত আন্দোলন শুরু করবেন। পিপল্‌স্‌ পারটির অংশ গ্রহণ ছাড়া জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশেই পূর্ণ হরতাল পালনের আহ্বান জানাবেন। তিনি আরও বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ ৬ দফার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। ওই রাত্রেই পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করলেন, জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৬টি আসনে আপাততঃ নির্বাচন স্থগিত রাখা হল। বাঙলা দেশের মানুষের বুঝতে বাকি রইল না হাওয়া কোন্‌ দিকে বইছে।

AMARBOI.COM

১ মারচ সোমবার ১৯৭১। ঢাকার আকাশ ঝকঝকে নীল। স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা চলছে। ত্রিশ হাজারের মত দর্শক খেলা দেখতে উপস্থিত। খেলা দেখার মাঝেও চলছে উত্তেজিত রাজনৈতিক আলোচনা। সেদিন ঢাকার প্রভাতী সংবাদপত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ খবর বেরিয়েছে। এক, আগের দিন (রবিবার) পি, আই, এ, বিমানযোগে পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন জাতীয় পরিষদ সদস্য ঢাকা এসে পৌঁচেছেন। তারা অধিকাংশই ওয়ালি-মুজাফ্ফর ন্যাপের। দুই, রবিবার বিকালে ঢাকার শিল্প ও বনিক সমিতির সম্বর্ধনা-সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, "জনাব ভুট্টো তার দলের ৮৩জন সদস্য নিয়ে ঢাকা আসতে চান না। আমি যদি বলি, ১৬০জন সদস্য নিয়ে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে যাব না, তাহলে পরিস্থিতি কি দাঁড়ায়? পরিষদে আলোচনায় না বসে আগে কি করে আমরা প্রতিশ্রুতি দেব যে, ৬ দফা সংশোধন করা হবে? ৬ দফা এক্ষণে জনগণের সম্পত্তি, তাদের নির্বাচনী রায়। ব্যক্তিগত ভাবে এটা সংশোধন বা পরিবর্তনের অধিকার আমার নেই। আসলে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বানচাল করার ষড়যন্ত্র চলছে। এই চক্রান্ত অব্যাহত থাকলে পরিণামে যা ঘটবে, তজ্জন্য চক্রান্তকারীরাই দায়ী হবেন।" পশ্চিম পাকিস্তানের কোন কোন সদস্য ও নেতা শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তাদের প্রস্তাব গ্রহণের আশ্বাস দেয়া হলে তারা অধিবেশন যোগ দেবেন বলে যে উক্তি করেছেন, তার উল্লেখ করে শেখ মুজিব বলেছেন, 'যদি একজন সদস্যও কোন ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব দেন, তা গ্রহণ করা হবে। আমরা আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে অন্যায় কিছু করবো না।"

এর দু'দিন পরেই ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন। তাই বাঙলাদেশের সকলের মনেই তখন উদ্বেল প্রতীক্ষা। আশা ও আশঙ্কার মিশ্র অনুভূতি। শেষ পর্যন্ত জনাব ভুট্টো তার মত পালটাবেন, প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া তার প্রতিশ্রুতি রাখবেন, এটাই বাঙলাদেশের মানুষের একমাত্র আশা। সোমবার সকাল দশটার আগেই জানাজানি হয়ে গেল, দুপুর একটায় প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া বেতার ভাষণ দেবেন। কি নতুন কথা বলবেন তিনি? দুরু দুরু

AMARBOI.COM

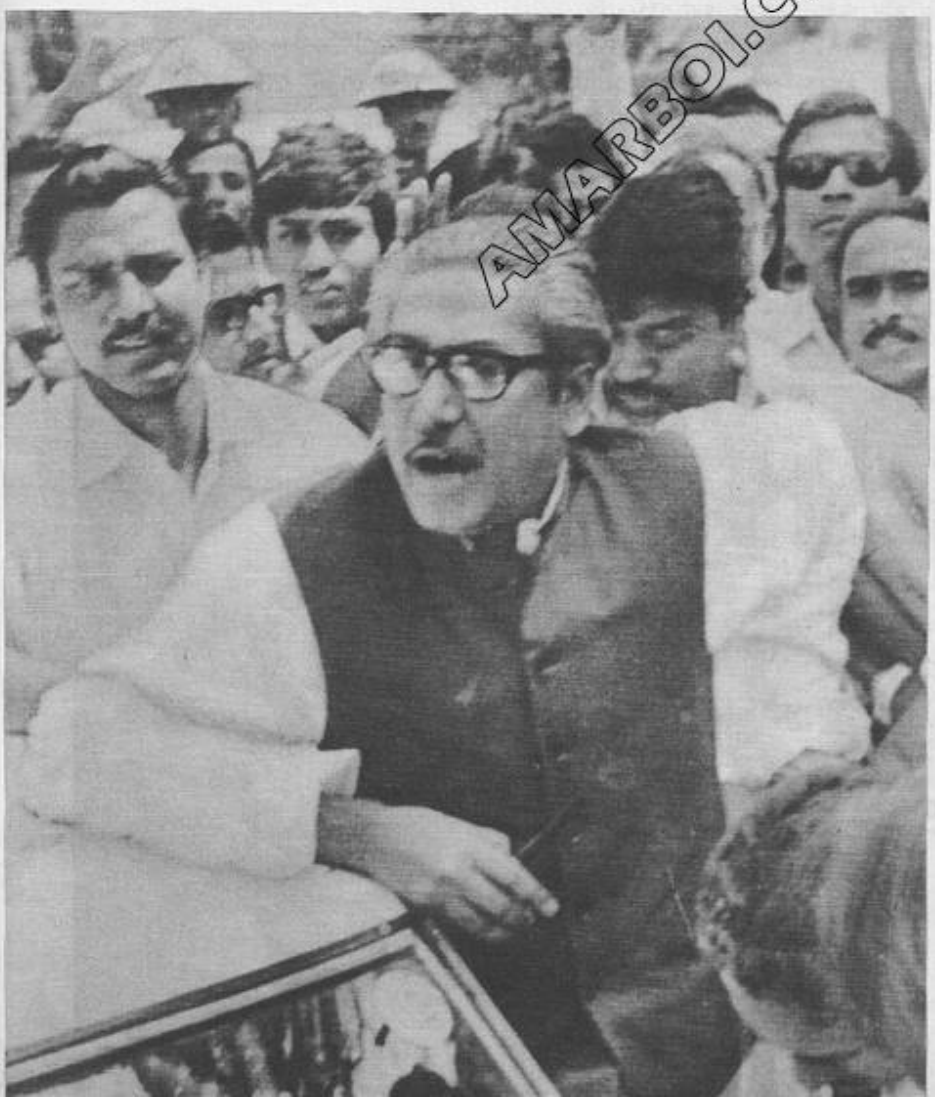

ইয়াহিয়ার সঙ্গে আর এক দফা বৈঠক এইমাত্র শেষ, মুজিবর বেরিয়ে এসেছেন প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে। তাঁর চারদিকে আগ্রহাকুল জনতা। তিনি মোটরের উপর হাত রেখে বললেন, দাবি না মেটা পর্যন্ত আমরা জাতীয় পরিষদে বসতে পারি না।

শঙ্কা-কম্পিত বুকে সকলেই অপেক্ষারত। বেলা একটায় বেতার ঘোষক বললেন, এবার প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া ভাষণ দেবেন। কিন্তু না। ইয়াহিয়ার কণ্ঠ নয়। প্রেসিডেনটের ঘোষণা পাঠ করলেন অপর একটি কণ্ঠ—'জাতীয় পরিষদের বৈঠক ৩ মারচ তারিখে বসবে না। অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রইল।' আশাভঙ্গের বেদনায় প্রথমে সকলেই স্তম্ভিত, মূক। তারপরই গর্জে উঠল সারা ঢাকা। স্টেডিয়ামের খেলা ভেঙে, তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ দর্শক বেরিয়ে এলো রাস্তায়। ঢাকা হাইকোরটের সামনে একটি স্টেট বাস অগ্নিদগ্ধ হল। লাখো বিক্ষুব্ধ মানুষ সমবেত হল হোটেল পূর্বানীর সামনে। সেখানেই বিকেল চারটেয় শেখ মুজিবের সাংবাদিক সভা। শেখ সাহেব সাংবাদিক সভা শেষ করে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত রাখা একটি চক্রান্তের পরিণতি ছাড়া কিছু নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতামত উপেক্ষা করে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের নেতার প্রতিটি দাবী মেনে নেয়া হচ্ছে। এটা গণতন্ত্র নয়, স্বৈরতন্ত্র। এর প্রতিবাদে প্রথম কর্মসূচী হিসাবে পরদিন ঢাকায় এবং তার পরের দিন সারা বাঙলাদেশে হরতাল পালিত হবে এবং ৭ মারচ রেসকোরসে জনসভা হবে। এই সভায় ঘোষিত হবে আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী। শেখ মুজিব আরও বললেন, 'আগামী ৭ মারচের মধ্যে যদি বর্তমান পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটানো না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে যা ঘটবে, তজ্জন্য তিনি দায়ী থাকবেন না।' শেখ মুজিবের এই বক্তব্য সমর্থন করে জনাব নুরুল আমিন সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বললেন, 'জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখা অযৌক্তিক এবং দেশে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকাশের পথে আবার বাধা সৃষ্টির চক্রান্ত।

ভাগ্যের পরিহাস, এই নুরুল আমিনই এখন জনাব ভুট্টোর প্রধান সহযোগী।

১ মারচ তারিখে আরও দুটি ঘটনা ঘটল। বাঙলাদেশের গবরনর ভাইস এডমিরাল আহ্সান পদচ্যুত হলেন এবং সামরিক প্রশাসক লেফটেনানট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান অসামরিক প্রশাসনেরও দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সামরিক প্রশাসনের ১১০নং সামরিক আইন নির্দেশে বাঙলাদেশের সংবাদপত্রে শেখ মুজিবের সহযোগে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, তার খবর ও ছবি ছাপা নিষিদ্ধ করা হল।

২ মারচ রাত পৌনে আটটায় ঢাকা বেতারে ঘোষণা করা হল, রাত আটটা থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত ঢাকা শহরে সান্ধ্য আইন বলবৎ করা হল এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত প্রতিদিন রাত সাতটা থেকে পরদিন সকাল সাতটা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকবে। সে রাতেই বিক্ষুব্ধ জনতা সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে এবং সেনাবাহিনীর গুলী বর্ষণে বহুলোক হতাহত হয়। আন্দোলন সারা বাঙলাদেশে বিস্তার লাভ করে। বাঙলাদেশে প্রচণ্ড গণ বিক্ষোভের খবর পাওয়ার পর জনাব ভুট্টো সদলে ৩ মারচ প্রেসিডেনট ইয়াহিয়ার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। ওই দিনই জেনারেল ইয়াহিয়া এক অনির্ধারিত বেতার ভাষণে ঢাকায় ১০ মারচ তারিখে এক রাজনৈতিক নেতৃ সম্মেলন আহ্বান করেন।

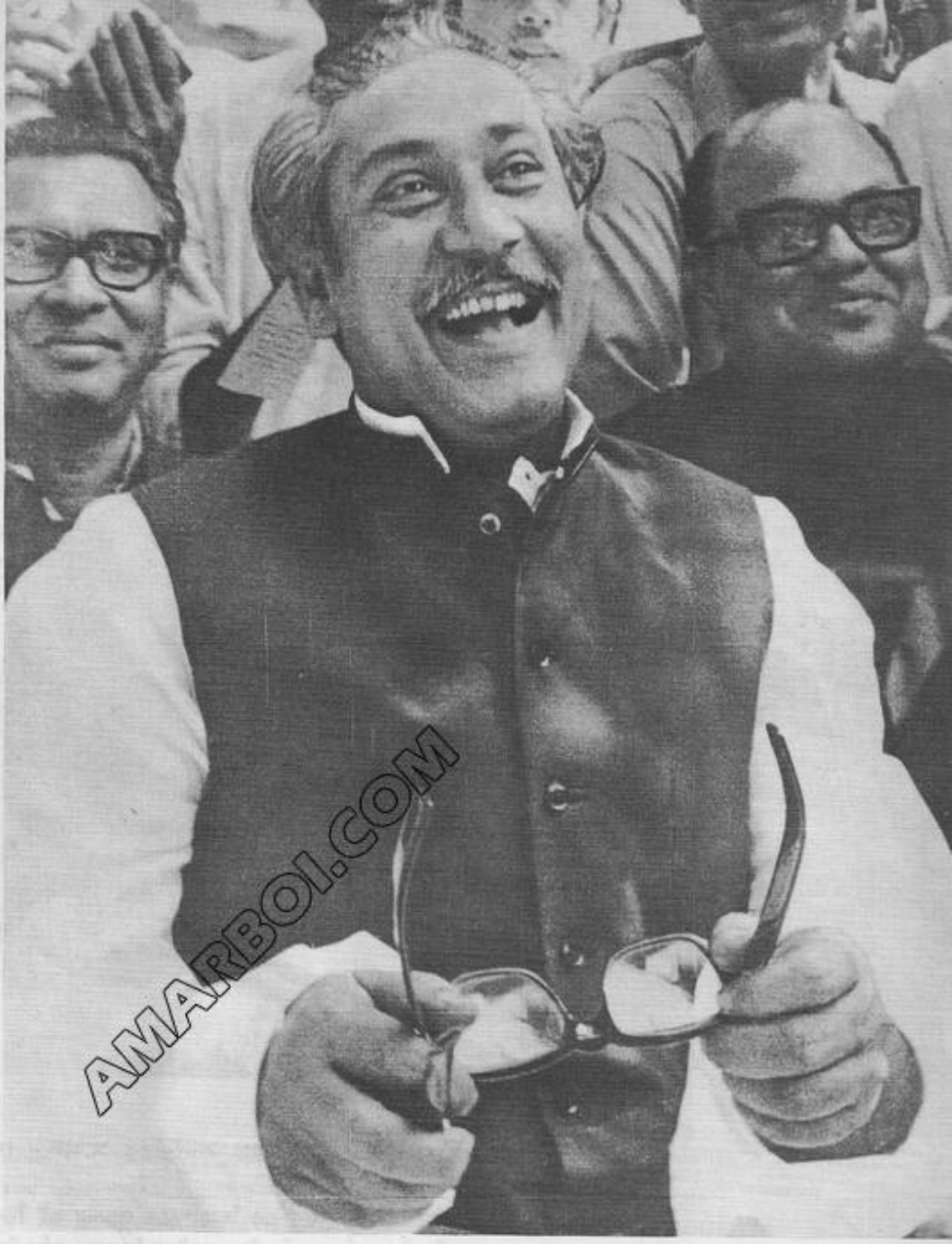

২০ মার্চ। ধানমণ্ডীর বাড়িতে কি কথায় বঙ্গবন্ধুর মুখ হাসিতে ভরে উঠেছে, চোখের চশমা খুলে হাতে নিয়েছেন তিনি। ডানদিকে অন্যতম সহকর্মী জনাব তাজুদ্দিন আহমেদ—বাঁদিকে জনাব নজরুল ইসলাম।

AMARBOI.COM

শেখ মুজিব সঙ্গে সঙ্গে এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন এবং ঘোষণা করেন, "ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য স্থানে জেনারেলের সৈন্যবাহিনী যখন ব্যাপকভাবে গণহত্যা চালাচ্ছে, শহীদের তাজা খুন যখন শুকিয়ে যায়নি, তখন এই আমন্ত্রণ এক নির্মম তামাসা। কঠোর অস্ত্রের ভাষার ধ্বনি যখন আমাদের কানে বাজছে, সামরিক প্রস্তুতি অব্যাহত রয়েছে, তখন এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো বন্দুকের নল উঁচিয়ে আমন্ত্রণ জানানোর সামিল।"

এই দিন প্রবল গণ বিক্ষোভের মুখে সিলেট, রংপুর, চট্টগ্রাম ও খুলনায় সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। সৈন্য বাহিনীর গুলিতে প্রতি স্থানেই বহু লোক হতাহত হয়। বিকেলে ঢাকার পলটন ময়দানের জনসভায় শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, 'এটা অস্ত্রধারী পশুশক্তির বিরুদ্ধে নিরস্ত্র জনতার অহিংস অসহযোগ আন্দোলন।' আন্দোলনের কর্মসূচী হিসেবে তিনি ৬ মারচ পর্যন্ত ছ'টা থেকে দু'টা হরতাল, কোরট-কাচারীসহ সকল অফিস, কলকারখানা, রেল স্টীমার বন্ধ, সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত সকল খাজনা ও ট্যাক্স্ প্রদান বন্ধ রাখার নির্দেশ দান করেন। জনাব নুরুল আমিন এইদিন এক বিবৃতিতে জনসাধারণের এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে তার সমর্থন

AMARBOI.COM

জানান এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন।

৫ মারচ তারিখে শেখ মুজিব এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান, ওই দিন পর্যন্ত শুধু ঢাকা শহর ও শহরতলীতেই সামরিক বাহিনীর গুলীতে তিনশো ব্যক্তি নিহত এবং দু' হাজার ব্যক্তি আহত হয়েছে। যশোর, খুলনা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী থেকেও বহু লোক হতাহত হওয়ার খবর প্রচারিত হয়।

৬ মারচ জেনারেল ইয়াহিয়া এক বেতার ভাষণে ২৫ মারচ তারিখে জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। ওইদিনই লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে বাঙলাদেশের গবরনর পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত প্রচারিত হয়। ঢাকার সেনট্রাল জেলের গেট ভেঙে সোয়া তিনশো বন্দী পলায়ন করে। ১৬জন আবার ধরা পড়ে। এরপর শুরু হয় প্রদেশের অন্যান্য শহরে জেল ভাঙার পালা।

৭ মারচ বিকালে ঢাকার রেসকোরসের মাঠে দশ লক্ষাধিক বিক্ষুব্ধ জনতার সমাবেশে শেখ মুজিব জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে তার দলের যোগদানের চারটি পূর্বশর্ত ঘোষণা করেন। (ক) সামরিক আইন তুলে নিতে হবে। (খ) সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরে যাবে। (গ) নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। (ঘ) গণহত্যার উপযুক্ত তদন্তের ব্যবস্থা করতে হবে। রেসকোরসে শেখ মুজিবের ভাষণ সামরিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা বেতারে প্রচার করতে না দেয়ায় অন্যান্য সরকারী অফিস আদালতের কর্মচারীদের মত ঢাকা বেতারের কর্মীরাও কাজ বন্ধ করে দেন। পরদিন এই ভাষণ প্রচারের অনুমতি দেয়া

১৯ মারচ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে তৃতীয় চক্কর কথা বলে বঙ্গবন্ধু বেরিয়ে এসেছেন। সবাই জানতে উৎসুক—আলোচনা কতদূর এগোলো? সংকল্পে অটল মানুষটি বললেন, আমরা আবার কথা বলব। তবে কোন আপস নয়।
তিনি মোটরে উঠবেন—গাড়ির খোলা দরজায় হাত রেখে দাঁড়িয়েছেন। পেছনে দূরে প্রেসিডেন্ট ভবনের ফটকে সান্ত্রী।
প্রতিটি মুহূর্ত ঐতিহাসিক।
একটি জাতির নবজন্মের দিন যতই আসন্ন—মহান নেতার সব কথাই সাংবাদিকরা ধরে রাখতে চাইছেন। টি ভি ক্রু সবার মাথার ওপর হাত উঁচু করে ক্যামেরা ধরেছেন।

AMARBOI.COM

হলে আবার বেতারযন্ত্র চালু হয়। শেখ মুজিব ৮ মারচ থেকে এক সপ্তাহের জন্য অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের নয়া কর্মসূচী প্রচার করেন। এই কর্মসূচীতে ছিল গৃহশীর্ষে কালো পতাকা উত্তোলন, শহরে ও গ্রামে সংগ্রাম কমিটি গঠন, সরকারী অফিস আদালত এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা, আভ্যন্তরীন (বাঙলা দেশে) যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা, সামরিক বাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থায় অসহযোগ, পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থ প্রেরণ বন্ধ, আন্তঃ জেলা টেলিফোন যোগাযোগ চালু করা, সৈন্য বাহিনীর চলাচল ও নতুন সৈন্য ও সমরাস্ত্র পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আনয়নের ক্ষেত্রে অসহযোগ এবং খাজনা ও ট্যাকস বন্ধ রাখা প্রভৃতি।

শেখ মুজিবের নির্দেশে বাঙলা দেশে ক্ষেত্রবিশেষে অসামরিক প্রশাসন চালু হওয়া সম্পর্কে লাহোরের এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে এয়ার মারশাল নূর খান (পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান) বলেন, শেখ মুজিবর রহমানের দেশ শাসনের আইনগত ও নৈতিক অধিকার রয়েছে এবং জেনারেল ইয়াহিয়ার উচিৎ অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। জনাব ভুট্টো রাওয়ালপিন্ডি থেকে ঘোষণা করেন, তার দল এক্ষণে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করবে। ৯ মারচ তারিখে মওলানা ভাসানী এক বিবৃতিতে বৃটিশদের মত জেনারেল ইয়াহিয়াকেও বাঙালীদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বাঙলা দেশের স্বাধীনতা মেনে নেয়ার উপদেশ প্রদান করেন। ওই দিন লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে বাঙলাদেশের সামরিক শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্তির কথা প্রচার করা হয়। ঢাকা হাইকোরটের প্রধান বিচারপতি জনাব বি, এ, সিদ্দিকী পূর্বদিন তাকে গবরনর হিসাবে শপথ-বাক্য পাঠ

৬

ভায়েরা আমার! আমরা রক্ত দিয়েছি—রক্ত আরও দেব। শহীদদের রক্তের উপর পা দিয়ে আমি অ্যাসেমব্লিতে যেতে চাই না। যত রক্ত দিতে হয় দেব।

ভাইগণ, মনে রাখবেন এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এ ইতিহাস বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস, বাঙালীর অস্থি দিয়ে গড়া ইতিহাস।

আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে বলেছিলাম, গরীবের উপর, বাঙালীর উপর গুলি করা হয়েছে। আমাদের হত্যা করা হয়েছে—আপনি এখানে আসুন, দেখুন। তিনি এলেন না। আমি গেলাম পল্টন ময়দানে, বললাম কাল থেকে অফিস বন্ধ, কারখানা বন্ধ। আমার কথা সকলে মানলেন। বললাম, কোন কিছু চলবে না। কিছু চলল না।

আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গোল টেবিল বৈঠক ডেকেছিলেন। ২৫ মারচ তারিখে অ্যাসেমব্লি ডেকেছেন। অথচ রক্তের দাগ এখনো শুকোয়নি। আমি বলে দিতে চাই শহীদদের রক্তের উপর পা দিয়ে মুজিবর রহমান অ্যাসেমব্লি যেতে পারে না। ...জনতার প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর দেখব যোগদান করি কি না। আমাদের দাবি না মানলে অ্যাসেমব্লিতে বসতে পারি না।

AMARBOI.COM

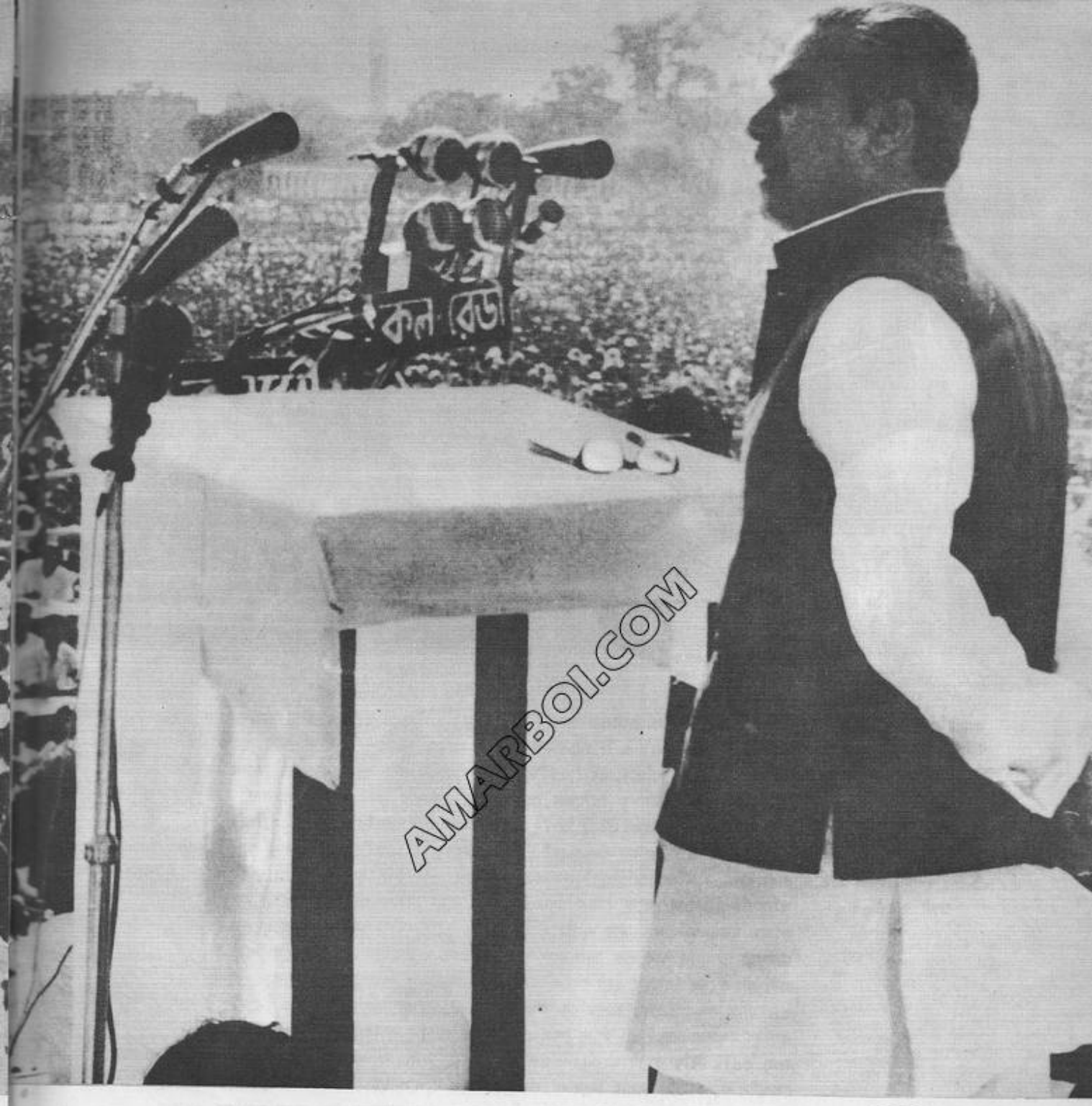

জনগণ আমাকে সে অধিকার দেয়নি।
ভাইরা, আমার উপর আপনাদের বিশ্বাস আছে?
আছে—আছে—আছে!
আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না,
আমরা মানুষের অধিকার চাই।
আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট কাছারি,
আদালত, অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য
বন্ধ থাকবে। মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত ট্যাক্স বন্ধ করে
দেওয়া হল।
আর পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও যাবে না।
আর যদি একটি গুলি চলে, যদি আমার লোকেদের
হত্যা করা হয়, তাহলে আপনাদের কাছে আমার
অনুরোধ—প্রত্যেক ঘরে, প্রত্যেক পাড়ায় দুর্গ গড়ে তুলুন।
যা কিছু আছে, তা নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।
আমরা ওদের ভাতে মারব, পানিতে মারব।
সাড়ে সাত কোটি মানুষকে চেপে রাখতে পারবা না,
আমরা মরতে শিখেছি, কেউ আমাদের রুখতে পারবে না।
হিন্দু-মুসলমান, বাঙালী-অবাঙালী—সবাই আমার ভাই।
তাদের রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সকলের।
দেখবেন, আমাদের যেন বদনাম না হয়।
মনে রাখবেন, আমি কোনদিন বেইমানি করিনি।
আমি রক্ত দেবার জন্য প্রস্তুত। জয় বাংলা।

AMARBOI.COM

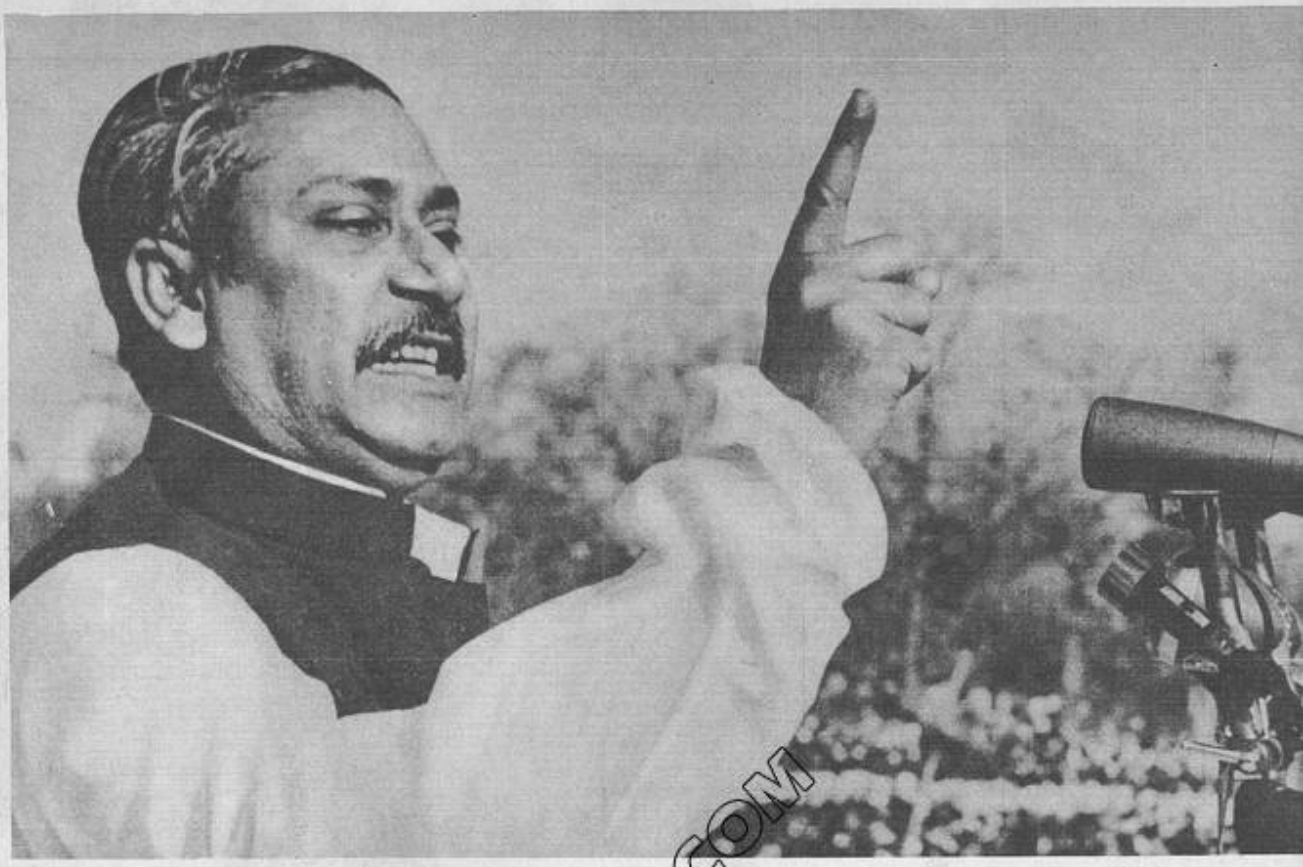

রমনার রেসকোর্স ময়দান। ৭ মারচ। ১৯৭১। 'সরকারী কর্মচারীদের বলছি—আমি যা বলি তা মানতে হবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে আমি আবার জানিয়ে দিতে চাই—দেশকে একেবারে জাহান্নমে নিয়ে যাবেন না। মিলিটারি শাসন চালাবার আর চেষ্টা করবেন না...।'

AMARBOI.COM

করানোর অনুষ্ঠান পরিচালনায় অস্বীকৃতি জানান। ১০ মারচ তারিখে জানা যায়, ঢাকায় অবস্থানকারী জাপানী ও জার্মান নাগরিকদের সরিয়ে স্বদেশে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। অন্যদিকে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থানট পূর্ব বাঙলায় অবস্থানকারী জাতিসংঘের কর্মচারীদের প্রয়োজন বোধে সরিয়ে নেয়ার জন্য ঢাকার সহকারী রেসিডেন্ট প্রতিনিধিকে দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই খবর প্রচারিত হওয়ার সংগে সংগে শেখ মুজিব জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের প্রতি এক বার্তায় বলেন, 'বাঙলাদেশে বাঙালীদের মানবিক অধিকার অস্বীকৃত হচ্ছে। ব্যাপক গণহত্যা চলছে এবং এই গণহত্যার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আরও সৈন্য ও অস্ত্র আনা হচ্ছে। এই সময় কেবল কর্মচারী সরিয়ে নিয়ে জাতিসংঘ তার দায়িত্ব পালন করতে পারে না।' ১২ মারচ লাহোরে এয়ার মারশাল আসগর খান এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসংগে বলেন, 'আমাদের অদূরদর্শিতার জন্য বাঙলাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পশ্চিম পাকিস্তান ৫ বছরও টিকে থাকতে পারবে না। ১৪ মারচ বাঙলাদেশের অসামরিক কর্মচারীরা কাজে যোগ দেয়ার সামরিক নির্দেশ অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৫ মারচ শেখ মুজিব বাঙলাদেশে অসামরিক প্রশাসন চালু রাখার জন্য ৩৫টি বিধি জারী করেন। বাঙলা দেশীয় দুটি ব্যাংকে সরকারকে দেয় কর ও কেন্দ্রীয় শুল্ক জমা দেয়ার নির্দেশ দেন। ওই দিন দুপুর ২টা ২০ মিনিটে জেনারেল ইয়াহিয়া আরও কয়েকজন জেনারেল সহ শেখ মুজিবের সংগে আলোচনার জন্য কড়া সামরিক প্রহরায় ঢাকা পৌঁছেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব ভুট্টো দাবী জানান, কেন্দ্রের ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি দলের হাতে এবং প্রদেশের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে দিতে হবে। ১৬ মারচ মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু। কালো পতাকা শোভিত মোটরে শেখ মুজিব ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবনে গমন করেন। জনাব নুরুল আমিন ও আবদুল ওয়ালি খান তাদের স্ব স্ব বিবৃতিতে জনাব ভুট্টোর দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের থিয়োরির তীব্র প্রতিবাদ জানান। তারা বলেন, একটি জাতীয় পরিষদে দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হতে পারে না। ২ মারচ থেকে ৯ মারচ পর্যন্ত অসামরিক প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য কোন্ পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনী তলব করা হয়েছিল তা তদন্ত করে দেখার জন্য একটি তদন্ত কমিশন গঠনের

সিদ্ধান্ত প্রচার করা হয়। শেখ মুজিব এই কমিশন গঠনের সরকারী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং সেনাবাহিনীর অত্যাচার সম্পর্কে তদন্ত করার মূল দাবি এড়িয়ে এই কমিশন গঠনকে একটি ধাপ্পা দেয়ার প্রয়াস আখ্যা দেন। ১৮ মারচ মুজিব-ইয়াহিয়া দ্বিতীয় বৈঠক। বৈঠক শেষে ওয়ালি খানের সঙ্গে শেখ মুজিবের সাক্ষাৎকার। এইদিন আরও জানা যায়, প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া পাকিস্তান সুপ্রিম কোরটের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিকে সঙ্গে রেখেছেন হয় এবং সংবাদপত্রে এই মর্মে আশা প্রকাশ করা হয় যে, ২৩ মারচের বেতার-ভাষণে জেনারেল জরুরী বার্তা প্রেরণ করেছেন। একটি রাজনৈতিক মীমাংসার আশা জনমনে জাগ্রত হয় এবং সংবাদপত্রে এই মর্মে আশা প্রকাশ করা হয় যে, ২৩ মারচের বেতার-ভাষণে জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করবেন। ১৯ মারচ তারিখে জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে ৯০ মিনিটব্যাপী বৈঠক শেষে প্রেসিডেনট ভবন থেকে বেরিয়ে এসে শেখ মুজিব জানতে পারেন, ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে সেনাবাহিনী গুলি চালিয়ে বহু লোককে হত্যা করেছে। প্রদেশের বহুস্থানে সেনাবাহিনী ও জনসাধারণের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। এই গুলী বর্ষণের নিন্দা করে তিনি বলেন, 'এই আলোচনা বৈঠকের অর্থ কি? শহীদের রক্তের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না।' করাচী থেকে খবর প্রচারিত হয়, জনাব ভুট্টো ঢাকা আসার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। ২০ মারচ তারিখে ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ধরে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক চলে। বৈঠকে প্রথমবারের মত উভয়পক্ষের উপদেষ্টাগণ অংশ গ্রহণ করেন। জনাব ভুট্টো করাচী থেকে ঘোষণা করেন, জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছ থেকে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পেয়ে তিনি ঢাকা যাচ্ছেন। ২১ মারচ আবার মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক। এইদিন প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের মুখে কড়া সামরিক পাহারায় জনাব ভুট্টো ঢাকা পেঁাছেন। জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে দু' ঘণ্টাব্যাপী আলোচনার পর তিনি ঘোষণা করেন, সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে। ২২ মারচ শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠক শেষ হওয়ার পর প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন, সকল দলের নেতাদের সম্মতিক্রমে এবং আলোচনার

এখন প্রোগ্রামটা বলছি শুনুন ঃ
যদি রেডিও আমাদের কথা না শোনে, তবে কোন বাঙালী রেডিও স্টেশনে যাবেন না,
টেলিভিশনে যাবেন না (জনতার হাততালি)।
কেউ যদি আমাদের নিউজ না দেয়, ওদের কাছে যাবেন না। ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে দুই ঘণ্টা
—যাতে মানুষ মাইনাপত্র নিতে পারে।

AMARBOI.COM

স্বার্থে তিনি জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন আবার স্থগিত রাখছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতারা এইদিন নিজেদের মধ্যে এক বৈঠকে মিলিত হন। ২৩ মারচ শেখ মুজিব ছুটির দিন ঘোষণা করেন এবং সর্বত্র বাঙলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া তার নির্ধারিত বেতার ভাষণ বাতিল করে দেন এবং এক বাণীতে বলেন, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এক সঙ্গে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, "একত্রে থাকার স্বেচ্ছাসম্মতির উপরে রাষ্ট্রের ভবিষ্যত নির্ভর করে।" ২৩ মারচ জেনারেল ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতার দু'দফা বৈঠক হয়। জনাব ভুট্টো সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন, 'শেখ মুজিব ও প্রেসিডেনট ইয়াহিয়ার মধ্যে যে ব্যাপক মতৈক্য ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার দল

AMARBOI.COM

সেগুলি পরীক্ষা করে দেখছেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে তার সন্তোষজনক বৈঠক হয়েছে এবং তিনি আবার সাক্ষাৎকারের আশা রাখেন।' কাউন্সিল মুসলিম লীগের নেতা জনাব মমতাজ দৌলতানা ঢাকায় ঘোষণা করেন, মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনায় তিনি সন্তুষ্ট এবং আশাবাদী। ২৪ মারচ শেখ মুজিব ও জেনারেল ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাগণ এক বৈঠকে মিলিত হন এবং পরের দিন (২৫ মারচ) প্রেসিডেনট এক বেতার ভাষণে রাজনৈতিক মীমাংসা ও ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করবেন বলে খবর প্রচারিত হয়। জনাব ভুট্টোর দলের সদস্যগণ (জনাব ভুট্টো ছাড়া) ও পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতারা এইদিন ঢাকা ত্যাগ করেন।

২৫ মারচ সংবাদপত্রে বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর গুলীতে দেড়শো ব্যক্তির প্রাণহানির খবর প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রাম বন্দরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আনা সমরাস্ত্র জাহাজ থেকে নামাতে অস্বীকার করার পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাঙালী শ্রমিকদের উপর গুলী চালায়। শেখ মুজিব এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ২৭ মারচ সারা বাঙলা দেশব্যাপী হরতাল পালনের ডাক দেন এবং বলেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে আলোচনা ও রাজনৈতিক মীমাংসার নামে কালক্ষেপ করে বাঙালীদের দমন করার জন্য গোপনে পূর্ণ সামরিক প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

২৫ মারচ রাত বারোটা। ঢাকার হাটখোলা রোডের মোড়ে একটি সংবাদপত্র-অফিসে টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভার তুলতেই প্রশ্ন হল, শুনছি, প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া আর ভুট্টো নাকি আজ রাত্রে প্লেনে ঢাকা ছেড়ে পালিয়েছেন এবং সেনাবাহিনী রাজপথে নেমেছে? প্রশ্নের জবাব দেয়া হল না, টেলিফোনের তারে ভেসে এল প্রচণ্ড গোলা-গুলির শব্দ, ক্ষীয়মান কণ্ঠে জয় বাঙলা শ্লোগান।

রাত দুটোর আগে সারা ঢাকা শহরে টেলিফোন-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। চারদিকে তখন আগুনের লেলিহান শিখা, আর হাজার কণ্ঠে অন্তিম আর্তনাদ। সারা বাংলাদেশে শুরু হল জঙ্গী তাণ্ডব।

২৩ মারচ মঙ্গলবার। পিনডি প্রতিবছরের মত সেদিনও 'পাকিস্তান দিবস' বাংলাদেশের ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছিল। পারেনি। ঢাকার রাজপথে মিছিল আর মিছিল। কালো পতাকার পাশাপাশি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হাতে ছাত্ররা 'প্রতিরোধ দিবসে'র মিছিল করে এগিয়ে চলেছেন। কণ্ঠে দেশাত্মবোধক গান।

AMARBOI.COM

AMARBOI.COM

মধ্যরাতের ঘাতক

সূর্য ডুবলো। পাঁচটা বেজে চুয়াল্লিশ।

ঠিক এক মিনিট পরেই ঢাকার প্রেসিডেনট ভবন থেকে জেনারেল ইয়াহিয়া সোজা এয়ারপোরটে চলে গেলেন। কিন্তু খবরটা জানা গেল পৌনে আটটায়। তখন প্রেসিডেনটের বিমান করাচি পাড়ি দিয়েছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। সারাদিন ধরে রোদেপোড়া নগরী চৈত্রের বিখ্যাত হাওয়ায় জুড়িয়ে আসছিল।

তারপর দু' ঘণ্টাও যায়নি। ক্যানটনমেনট থেকে জিপ, ট্রাক বোঝাই দিয়ে সৈন্য সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ছে। তারা ছক মোতাবেক পোজিসন নিচ্ছে। গোলন্দাজ, সাঁজোয়া, পদাতিক —তিন বাহিনী থেকে বাছাই তিন ব্যাটালিয়ন ঘাতক।

রাত ১০টা ৩৫। নর্থ ঢাকায় সৈন্যরা ইণ্টারকণ্টিনেণ্টাল হোটেল ঘিরে ফেলেছে। রিসেপসনে কালো বোরডে চক খড়ি দিয়ে একজন বাচ্চা ক্যাপটেন লিখে দিলঃ বাইরে বেরোলেই গুলি।

বিদেশী সাংবাদিকরা বেরোতে না পেরে রেডিও ধরলেন। না। কারফিউর কোন ঘোষণা নেই। বাইরে ট্যাংকের ঘর্ঘর। ছুটে সবাই বারোতলায় উঠলেন। মেসিনগানের গুলিতে কান পাতা দায়। ভুট্টোর ঘরের দরজায় গিয়ে সবাই থমকে দাঁড়ালেন। কড়া পাহারা। কাঁচা ঘুমে জাগানো বারণ। ঢাকা-করাচি টেলিপ্রিণ্টার লাইনও কেটে দেওয়া হয়েছে।

বাইরের পৃথিবী থেকে ঢাকা বিচ্ছিন্ন।

তবে কি কু হয়ে গেল? ইয়াহিয়া পপাত?

বৃহস্পতিবার। ২৫ মারচ। ১৯৭১। খানিকবাদেই ইংরাজী মতে শুক্রবার শুরু হয়ে যাবে। ঢাকার দু' জায়গায় তখন যুগপৎ কাজ শুরু হয়েছে।

প্রথম টারগেটঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওরফে ছাত্রসমাজ। সবে মধ্যরাত। মারকিন এম-২৪ ট্যাংকগুলো কামান উঁচিয়ে মাটিতে দাঁতের দাগ ফেলে ফেলে ক্যামপাসে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে তিরিশ লরি সোলজার। ওরা ব্রিটিশ কাউনসিল লাইব্রেরিতে ঘাঁটি গেড়ে ইকবাল হলে গোলা ফেলছে। নীট শিকার—২০০জন ছাত্র। ইকবাল হলের করিডর রক্তে রেড্ওয়াস। জগন্নাথ হলে ছিলেন ১০৩জন হিন্দু ছাত্র। গ্রেনেড ছুঁড়তে ছুঁড়তে সৈন্যরা ঢুকলো। ৬জন ছাত্রকে কবর খুঁড়তে লাগিয়ে দিয়ে পানজাবী সৈন্যরা বাকিদের ওপর সাবমেশিনগান থেকে গুলির তুলি বুলিয়ে দিল। ৬জন ছাত্র দুঃস্বপ্নের ভেতর সঙ্গীদের কবর দিচ্ছিল। পিঠে সব সময় নজল ঠেকছে। তারপর তাদেরও ওরা গুলি করে ফেলে গেল। একজন বেঁচেছিল।

AMARBOI.COM

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেবকে অন্ধকার মাঠে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে সোলজাররা গুলি করল। তারপর ইউনিভার্সিটির ইতিহাস, ইংরাজি, পদার্থবিদ্যা, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের সাতজন বিভাগীয় প্রধানকে ওরা বাছাই করে নিয়ে সেই রাতেই খুন করল। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে ওরা এসে অধ্যাপকদের কোয়ার্টারের দরজায় দরজায় ঘা দিয়েছিল। বিশেষ করে অর্থনীতি, বাংলা সংস্কৃতি, পলিটিক্যাল সায়ান্সের সঙ্গে যুক্ত মাস্টারমশাইদেরই খুঁজছিল বেশি করে।

স্ট্যাটিসটিকস বিভাগের প্রধান মুনিরুজ্জমান, তাঁর ভাই আর দু' ভাইয়ের দু' ছেলে—চারজনকে ঘর থেকে বের করে এনে মেসিনগানের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। সোলজাররা খুন করে বেরিয়ে যেতেই অধ্যাপকের স্ত্রী দরজা খুলে ছুটে গেলেন। ছেলে, স্বামী দেওর, রক্ত, গুলি বিঁধে যাওয়ার যন্ত্রণা—তার ভেতর থেকে টানতে টানতে স্বামীকে ঘরে নিয়ে এলেন। তখনো প্রাণ ছিল। তিনি স্বামীকে শোবার ঘরের পালঙ্কের নীচে ঠেলে দিলেন।

তিন ঘণ্টা পরে ভোররাতে সোলজাররা ফিরে এল। হিসেবে মেলে না। ওরা আবার জোর করে ঘরে ঢুকলো। অর্ধমৃত অধ্যাপককে পা ধরে টানতে টানতে আবার করিডরে নিয়ে এল। খানিক আগে গুলিলাগা দেহটা দরজায়, সিঁড়ির মোড়ে আটকে যাচ্ছিল—থেতলে যাচ্ছিল। একজন ক্যাপটেন কোমর থেকে পিস্তল বের করে নিয়ে একবার অধ্যাপকের দিকে তাকালো। আরেকটি বুলেট খরচ হয়ে গেল।

তার গলার পাশ দিয়ে বুলেট বেরিয়ে যায়। নাম কালীরঞ্জন। বাইরের পৃথিবীকে সে-ই খবরটা দেয়। রোকেয়া হলও বাদ গেল না। ঝলসানো আগুনের আলোয় সৈন্যরা ছাত্রী হসটেলের ভেতর ছুটোছুটি করে পাখি ধরছিল। ৫০টি পাখি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে বাঁচলো। দর্শন বিভাগের প্রধান—৬৫ বছরের চিরকুমার ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেবকে সৈন্যরা হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে গুলি করল। আরও ৭জন অধ্যাপককেও একইভাবে শেষ করা হয়।

বিছানা থেকে টেনে তুলে ছিয়াশি বছরের অশক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষকে সৈন্যরা গুলি করল। ব্যাংকে টাকা রাখতেন না বলে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রবিদের লক্ষ লক্ষ টাকাও লুট হল। মেডিকাল কলেজ ওরা দখল করেছিল অন্যভাবে। বাজুকা থেকে গোলা ছুঁড়ে।

দ্বিতীয় টারগেটঃ রাজারবাগে পূর্ব পাকিস্তান পুলিসের সদর দফতর। বাঙালী পুলিশরা আত্মসমর্পণ না করে রাইফেলের নল ঘুরিয়ে ধরল। ১১০০ পুলিশের সবাই শেষ। ট্যাংক ব্যারাকগুলো গুঁড়িয়ে দিয়ে তবে থামল। সৈন্যরা বড় ক্লান্ত। একটু উৎসব চাই। ফুর্তি চাই। গ্যাসোলিন ছিঁটিয়ে রকেট ছুঁড়ে গোটা সদর দফতরকে তখন আগুনে লাল করে ফেলা হল। ভোর পৌনে পাঁচটা। ঠিক তখন ঢাকার আরেকদিকের আকাশও লাল হয়ে উঠেছে। ইকবাল হল, মহসীন হল শিখা তুলে জ্বলছে।

রাত ১২টা ২০ মিনিটেও ফোন করে জানা গিয়েছিল শেখ মুজিবর রহমান বাড়িতেই আছেন। পরে একজন প্রতিবেশী জানান, রাত ১টা ১০ মিনিটে একটি ট্যাংক, একটি সাঁজোয়া গাড়ি, এক লরি সৈন্য গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করতে যায়। তিনি ঝুলবারান্দায় বেরিয়ে এলেন, 'আমি তৈরি। গুলি ছোঁড়ার তো কোন দরকার ছিল না।' ওদের 'মেইন বার্ড' জানতেন, তাঁকে না পেলে মিলিটারি সারা ঢাকা জ্বালিয়ে দেবে।

রাত ১টা ২৫। সব টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে।

রাত সওয়া দুটোয় ২৫ লরি সৈন্য 'দি পিপ্‌ল' কাগজের অফিস ঘিরে ফেলেছে। অফিসের তেতলা থেকে একটি কণ্ঠ ভেসে এল, 'বাঙালীরা এক হও।' সঙ্গে সঙ্গে শত শত রাউনড্ বুলেট সেদিকে ছুটে গেল। অবিশ্বাস্য নাটক।

AMARBOI.COM

অটোমেটিক চাঁনে রাইফেল হাতে পিনডির সোলজাররা সেদিন পথে বেরিয়েছিল অবাধ চাদমারির পাসপোর্ট হাতে। নীট ফলাফলঃ নিহত ৩০ লক্ষ।

সামনের রাস্তাটা খুব সরু। সৈন্যরা একটা ছোট মাইক নিয়ে চেঁচাতে লাগল, 'কোই হ্যায়?' রিকয়েললেস গান সমেত একটি ছোট জিপ গাড়ি লোহার গেটে ধাক্কা দিয়ে ঢুকে গেল। বিশ ত্রিশজন লোক তখনো ছিলেন। একজন পেটরল ছিঁটিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। দপ করে পিপল অফিস জ্বলে উঠলো। সৈন্যরা হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে উঠলো, 'নারায়ে তকবির।' আলোয় আলো। ওদের দাঁত ভীষণ শাদা।

সাংবাদিকরা হোটেলে আটক। নেতা বন্দী। মধ্যরাতের গণকবরে ছাত্রদের অস্থিমজ্জা রক্তের সঙ্গে মাটিও মিশে গেছে খানিক খানিক। বাঙালী পুলিশদের প্রতিরোধ ট্যাংকের দাঁতে ছিন্নভিন্ন। তারপর খবরের কাগজের ফাঁসি। টেলিফোন স্তব্ধ। অপূর্ব সময়।

তখন ঘুমের ভেতর ঘরে, মসজিদে, মন্দিরে মৃত্যু হাজির হল। আচমকা। মেডিকাল কলেজের পাশেই ছিল বাজার এলাকা। দোকানীরা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। তাদের কেউ আর জাগেনি। রাত সওয়া দুটোয় ময়মনসিং রোডের মোড়ে একটি জিপ এসে দাঁড়ালো। তাতে মেসিনগান বসানো। সৈন্যরা ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে আলো করে নিল চারদিক। বাজার এলাকা। বাঙালীদের বসতি। নিশুতি রাতে সোলজারদের সে কি মজা। কাছেই ইন্টারকনটিনেন্টালের এগারো তলা থেকে নিউ ইয়রক টাইমসের সাংবাদিক সিডনি স্যানবারগ সব দেখতে পাচ্ছিলেন। লোকে যেভাবে খুঁজে খুঁজে সাপ মারে—তার চেয়েও নিখুঁত অধ্যবসায়ে ঘুমন্ত মানুষদের জাগিয়ে জাগিয়ে পাকা ঘুমের ব্যবস্থা হচ্ছিল।

AMARBOI.COM

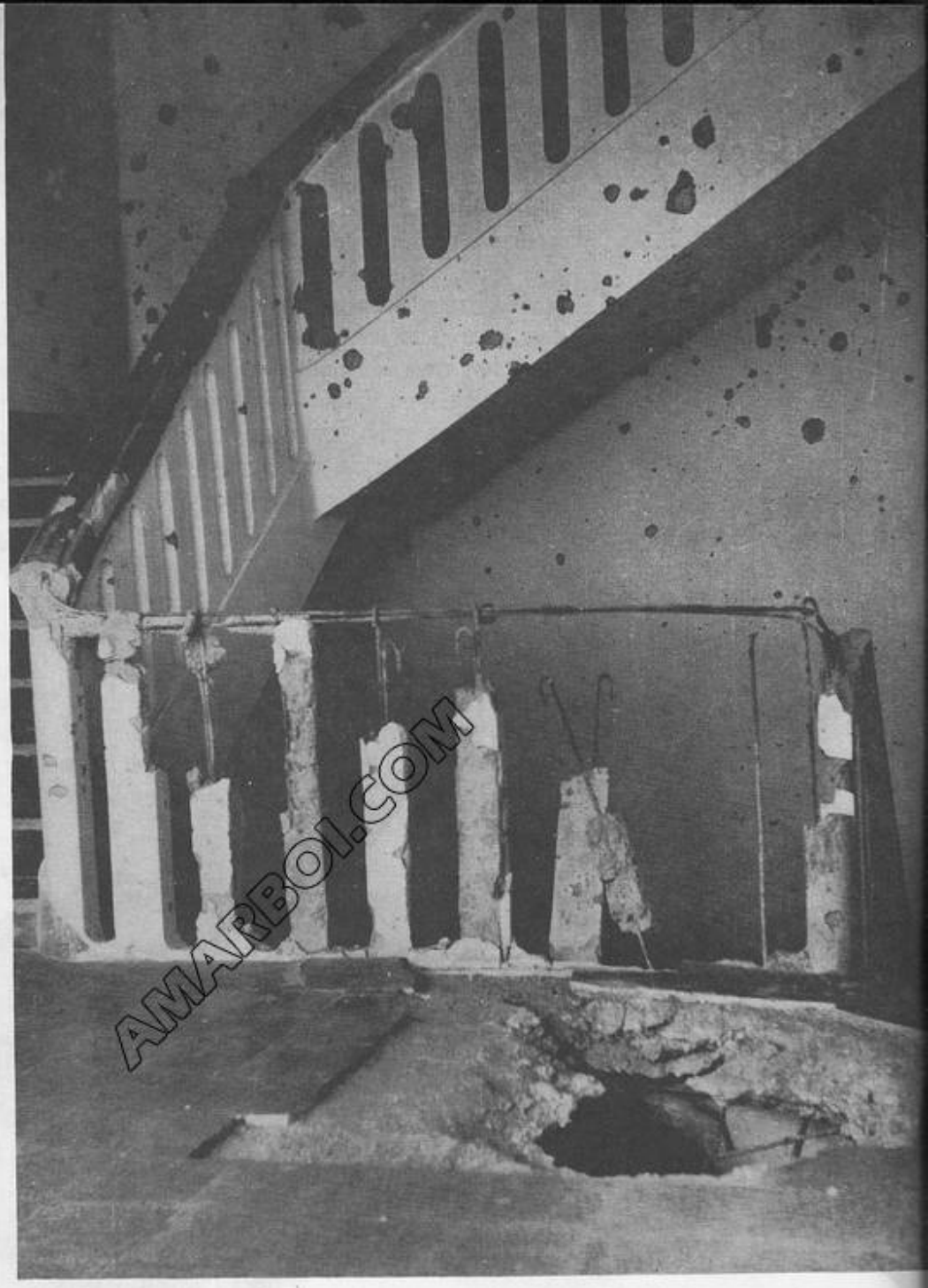

AMARBOI.COM

এলোপাথাড়ি গোলা এসে পড়ছিল। গীর্জা, মন্দির, মসজিদ, স্কুল কিছুই বাদ যায়নি। কৈফিয়ৎ কে নেবে? যে নেবার তিনি মিয়াওয়ালির জেলে। অবশ্য কারাগার তাঁকে শেষ অবধি ধরে রাখতে পারেনি। কংক্রিটের মেঝে, দোতলায় ওঠার ল্যান্ডিং, ঢালাইয়ের ভেতরকার লোহার রড ওদের আক্রোশের আওতার বাইরে বেরোতে পারেনি।

জনা কুড়ি যুবক সব তুচ্ছ করে এগোচ্ছিল। মেসিনগানের মুখ সেদিকে ঘুরে গেল। ছোট ছোট দোকান, জোড়াতালি দেওয়া আশ্রয় সব ধরে উঠল আগুনে। সৈন্যরা তখন ফ্ল্যাশ লাইট নিভিয়ে ফেলেছে।

মশাল হাতে একদল সৈন্য ইন্টারকন্টিনেন্টালে এল। বাংলাদেশের পতাকা টেনে নামিয়ে ছিঁড়লো। সুখ হল না। তখন তাতে আগুন দিল। রাত সওয়া চারটে। হোটেল থেকে বড় বড় জাগ বোঝাই চা নিয়ে গিয়ে সৈন্যরা খাচ্ছে। সারাটা রাত বড় ধকল গেছে।

ভোর ৫টা ২০ নাগাদ ছ'টি চীনে টি-৫৪ ট্যাংক গড় গড় করে হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকল খানিক—তারপর কামান উঁচিয়ে বড় রাস্তায় ছুটলো।

বৃহস্পতিবার শুরুই হয়েছিল অদ্ভুত। ঘূর্ণি ঝড়ের প্রলয় থামলে রিলিফের জন্যে সৌদি আরব চারখানি হেলিকপটার দিয়েছিল। সেই চারটি কপটার বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকার আকাশে খুব নিচু দিয়ে অনেকক্ষণ ওড়াউড়ি করেছিল। মধ্যরাতে কোথায় কোথায় কাজ শুরু হবে তাই ঠিক করতে বেরিয়েছিল বোধহয়।

শুক্রবার সকাল ৭টায় বন্দী ঢাকা বেতার জানালো প্রেসিডেন্ট আগা মহম্মদ ইয়াহিয়া খান করাচি পেঁাছেছেন। তিনি এক ঘণ্টা পরেই বেতারে বলবেন। কিন্তু রেডিও শোনার সময় কোথায়? রিপোর্টাররা আবার বারোতলায় ভুট্টোর ঘরে ছুটে গেলেন। বডিগার্ডরা এবারো জাগাতে দিল না। বলল, বাইরে কি হচ্ছে জানি টানি না।

বুড়িগংগায় সদর ঘাটে টারমিনাল বিল্ডিংয়ের ছাদে সৈন্যরা মেশিনগান বসাচ্ছে। নদী পারাপারের জন্যে বউ মেয়েরা কাঁখে বাচ্চা নিয়ে দাঁড়ানো। বুড়োরা চোখ তুলে সৈন্যদের দেখছে। তারপর কট্ কট্ কট্ কট্। অবিরাম। একটুক্ষণ আগের জ্যান্ত মানুষগুলোকে সৈন্যরাই ঠেলে বুড়িগংগায় ভাসিয়ে দিল। নির্ভুল নিশানা।

বেলা সাড়ে আটটায় কড়া পাহারায় ভুট্টো এয়ারপোর্টে চললেন। পরণে ছাই রঙের সুট। নীল টাই। দিব্যি চটপটে। দু'পাশে রাইফেলধারী দেহরক্ষী। রিপোর্টারদের প্রশ্নের আগেই ভুট্টো পর পর দু'বার বললেন, 'আমার কিছু বলার নেই। আমার কিছু বলার নেই।'

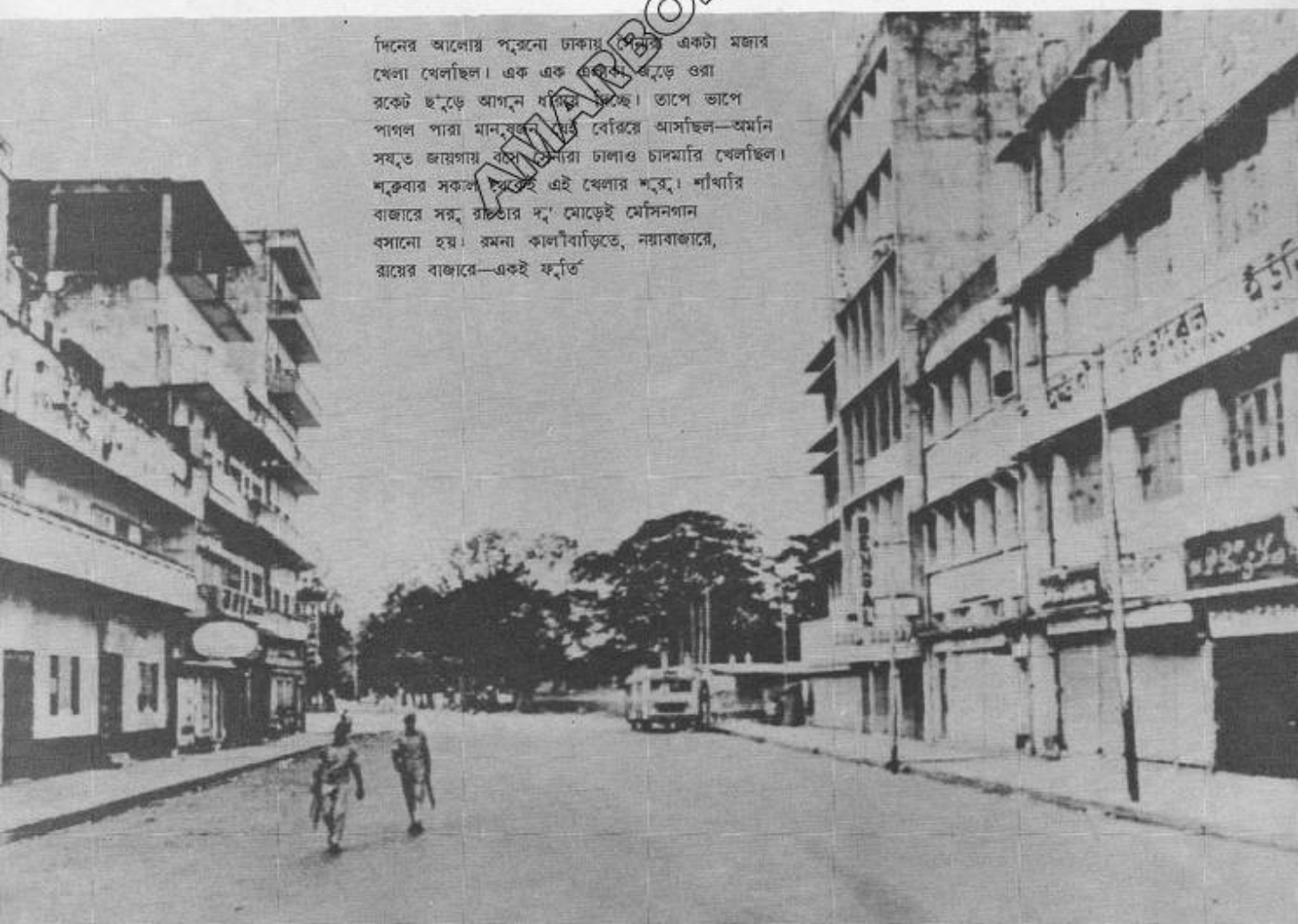

AMARBOI.COM

দিনের আলোয় পুরনো ঢাকায় সৈন্যরা একটা মজার খেলা খেলছিল। এক এক এলাকা জুড়ে ওরা রকেট ছুঁড়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। তাপে ভাপে পাগল পারা মানুষজন যেই বেরিয়ে আসছিল—অমনি সযুত জায়গায় বসে সৈন্যরা ঢালাও চাদমারি খেলছিল। শুক্রবার সকাল থেকেই এই খেলার শুরু। শাঁখারি বাজারে সরু রাস্তার দু' মোড়েই মেসিনগান বসানো হয়। রমনা কালীবাড়িতে, নয়াবাজারে, রায়ের বাজারে—একই ফুর্তি

ভুট্টো চলে যেতেই একজন লেফটেনাণ্ট করনেল সাংবাদিকদের বলল, যাও—ভেতরে যাও। হোটেলের ইনচার্জ সেই ক্যাপটেন আরও এক কাঠি। সে বলল, বিদেশী বলে যায় আসে না। কথা না শুনলেই গুলি। হোটেল ম্যানেজারকে শাসালো, পনর মিনিটের মধ্যে পাকিস্তানী পতাকা টাঙাও। নইলে গুলি।

সকাল ন'টায়, ঢাকা বেতারে টিক্কা খাঁর হুকুম: ২৪ ঘণ্টার কারফু। না মানলে গুলি। বেলা বাড়ছে। রোদও চড়ছে। ঢাকার ফাঁকা রাস্তায় শুধু সৈন্য আর সৈন্য। ট্যাংক। গ্রেনেডের ছড়াছড়ি। পিঠে সাবমেসিনগান ঝুলছে সবার। গুলির হিসেব দিতে হবে না। মানুষেরও হিসেব দিতে হবে না কাউকে।

পথে, কলতলায়, সাইকেল রিক্সায়, দোকানঘরে—যে যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে আছে। মৃত্যুর নিপুণ শিল্পী ইয়াহিয়ার এক একটি অপূর্ব ফ্রিজ শট। ঘুমের ভেতর আচমকা সৈন্য দেখে সবাই ভেবেছিল স্বপ্ন। সব ক'টি মরা মুখে সেই দুঃস্বপ্নের ছাপ।

দিনের আলোয় পুরনো ঢাকায় সৈন্যরা একটা মজার খেলা খেলছিল। এক এক এলাকা জুড়ে ওরা রকেট ছুঁড়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। তাপে ভাপে পাগলপারা মানুষজন যেই বেরিয়ে আসছিল—অমনি সযত্ন জায়গায় বসে সৈন্যরা ঢালাও চাদমারি খেলছিল। শুক্রবার সকাল থেকেই এই খেলার শুরু। শাঁখারি বাজারে সরু রাস্তার দু' মোড়েই মেসিনগান বসানো হয়। রমনা কালীবাড়িতে, নয়াবাজারে, রায়ের বাজারে—একই ফুর্তি।

বেলা দশটায় ঢাকা বেতারে সামরিক আইনের কুটকচালি চলল খানিক। ষোল দফার ফতোয়া। কিন্তু কে শুনবে। বেলা বারোটা থেকেই সারা পুরনো ঢাকা সৈন্যরা তোলপাড় করে তুলল।

মৃত্যুর নিপুণ শিল্পী ইয়াহিয়ার এক

AMARBOI.COM

ইংলিশ রোড্, ফ্রেঞ্চ রোড্, সিটি বাজার—সব জায়গায় বাড়িঘর দোকান মাটিতে মিশিয়ে দিল ট্যাংক। সঙ্গে ছুটল জিপ থেকে দু' ধারের জানলা বরাবর গুলির ফোয়ারা। পেছনে আগুন ধরানোর দল। নেভানোর কেউ নেই।

একেবারে অঙ্ক কষে কাজ। রিপোর্টাররা দেখেও খবর পাঠাতে পারছেন্ না। সব রাস্তায় ঘাতক স্বয়ং দাঁড়িয়ে। আগের সেই লেফটেনাণ্ট করনেল আবার এল, রিপোর্টারদের বলল, রিল্যাকস্! সুইমিং পুলে সাঁতরাও। তখন বেলা সাড়ে বারোটা।

এই অবিরাম আনন্দের ভেতরেও সময় করে নিয়ে বিকেল চারটে নাগাদ একদল সোলজার ইত্তেফাক কাগজের অফিসে গিয়ে হাজির হল। সঙ্গে একটি প্যাটন ট্যাংক।

বৃহস্পতিবার রাত থেকেই সাংবাদিক সমেত বেশ ক'জন ভেতরে আছেন। বাইরে গুলি। প্রথমেই মেসিনগানের গুলি দিয়ে কাগজের নেমপ্লেট উড়িয়ে দিল সৈন্যরা। তখন অফিসের মুখোমুখি প্যাটন ট্যাংকটা দাঁড়িয়ে। একজন সাংবাদিক উঁকি দিয়েই মেঝেতে শুয়ে পড়লেন। হামাগুড়ি দিয়ে নিউজ রুমে ফিরে এলেন তিনি। বাইরে কি হচ্ছে দেখতে গিয়ে ক্যাণ্টিন বয় লুটিয়ে পড়ল।

এদিকে প্যাটন খানিকটা পিছিয়ে তিন মিনিট ধরে মেসিন রুমে গোলা ফেলল। তারপর ৪০ মিনিট সময় নিয়ে অফিসের পেছনের দিকে পোজিসন নিল। সেখান থেকে সম্পাদকের টেবিলে গোলা। কিছুক্ষণ চুপচাপ। সৈন্যরা গ্রেনেড ছুঁড়তে ছুঁড়তে ভেতরে ঢুকছে। আগুন ধরে উঠল। তবু সম্পাদক সিরাজুদ্দিন বেরোবেন না, খবরের কাগজের অফিস পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ। এখানে না বাঁচলে কোথাও বাঁচব না। কিন্তু আর থাকা যাচ্ছিল না।

একটি অপূর্ব ফ্রিজ শট

AMARBOI.COM

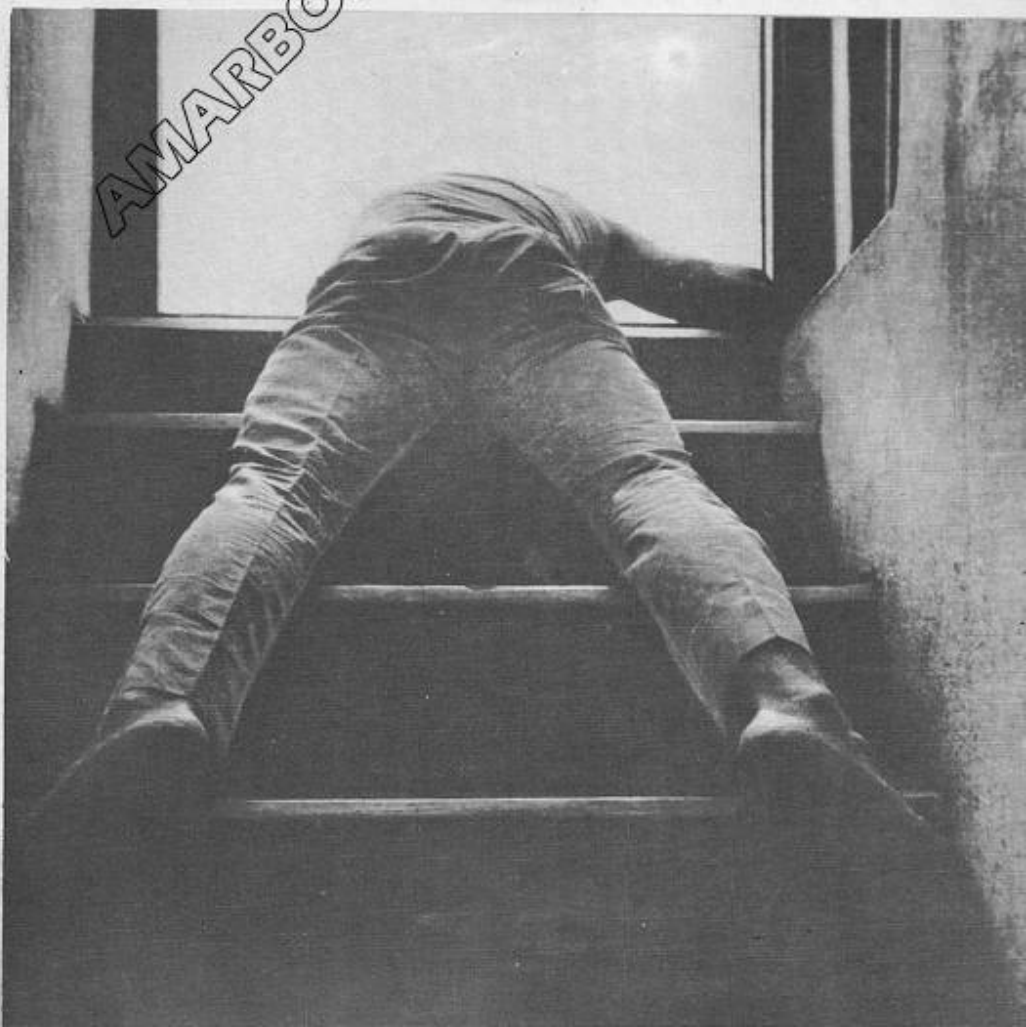

পাক ফৌজ তখন ক্যানটনমেনটে ক্যানটনমেনটে অবরুদ্ধ। যশোর দুর্গ কয়েক হাজার মানুষ দা, কুড়োল হাতে ঘিরে রেখেছে। এপ্রিলের গোড়ায় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম চক্করে ইয়াহিয়ার বোমারু বিমান নির্বিচারে ছো মেরে ইসলামের নামে, অখণ্ডতার নামে মন্দির গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল, মসজিদের ছাদে বোমা নামিয়ে দিচ্ছিল। মিনারে অশ্বত্থের শেকড় বাতাসে নিরালম্ব দোলে। ধর্ম, মানবতা ধসানো গহ্বরে তাকিয়ে মৌলবি সাহেব কোন তল খুঁজে পাচ্ছেন না।

AMARBOI.COM

তাপ বাড়ছেই। পেছনের দিকে অল্পবয়সীরা কাঁধের ওপর পায়ে পায়ে দাঁড়িয়ে মানুষের তৈরি মই বানিয়ে ফেলল। কবি ইকবাল হোসেন এই মই বেয়ে নামতে পারেননি। তাঁর দগ্ধ দেহ পরে পাওয়া যায়।

নেমে এসেও সবাই দেখলেন মিলিটারি রাস্তা আটকে দাঁড়ানো। তখন আবার সবাই একই ভাবে ওপরে উঠলেন। মেসিন ঘর জ্বলছে। বেরোবার কোন পথ নেই। এমন সময় পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোক আর তাঁর ছেলে জানলা গলিয়ে একখানা বাঁশ ঠেলে দিলেন। সেই বাঁশ ধরে ঝুলে ঝুলে সাতজন সাংবাদিক জ্বলন্ত বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন।

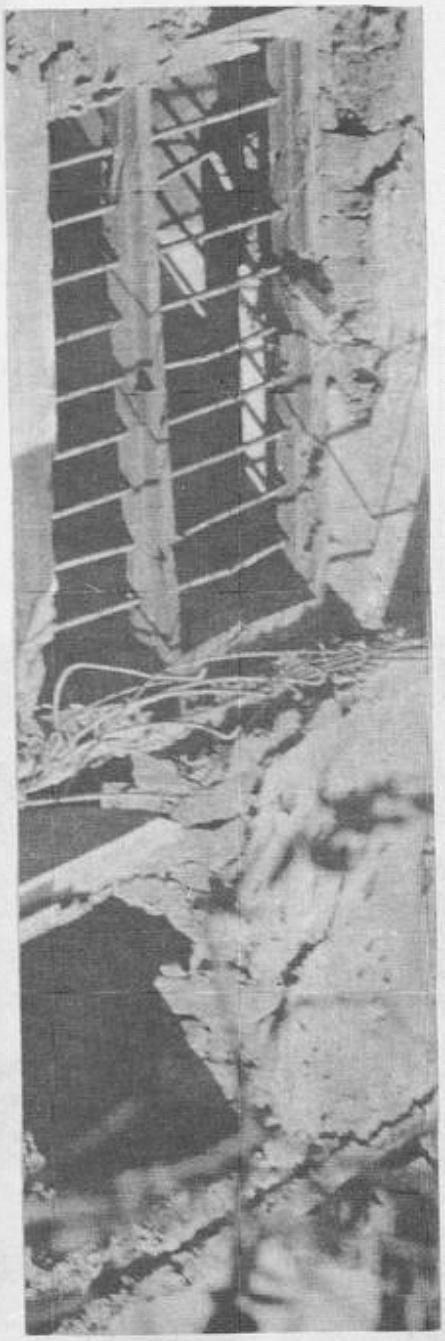

সন্ধ্যে ছ'টায় মিলিটারির জনসংযোগ দফতরের কর্তা মেজর সিদ্দিকি সালিক রিপোর্টারদের ফোনে জানালো, গভরনর টিক্কা খাঁ চান—আপনারা চলে যান। সেই রসিক লেফটেনান্ট করনেলটি আবার এল, গম্ভীর, বিনা ভনিতায় বলল, আমরা চাই তোমরা চলে যাও। তোমাদের পক্ষে খুব বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। একেবারে রক্তারক্তি—

পুরনো ঢাকা তখনো জ্বলছে। ছুটন্ত জিপের দু'ধারে গুলির ছররা। হাজারে হাজারে মানুষ সকালবেলাই পায়ে হেঁটে রওনা হয়েছিলেন। যে করে হোক নরক থেকে বেরোতে হবে। কিন্তু বেরোবার পথে পথে মিলিটারি দাঁড়িয়ে। আবার ফেরা।

ট্রেসার বুলেট ঢাকার আকাশ আলোয় চিরে ফেলছে বার বার। আগুনে, অন্ধকারে সারা শহর কবন্ধ হয়ে পড়ে আছে। নিরাশ্রয়, নিরস্ত্র মানুষের কেউ এ-গলি সে-গলিতে লেপটে পড়ে থাকছে। ট্যাংক কিংবা জিপগাড়ি চলে গেলেই আবার ওরা হাঁটছে। জানে না কোথায় যাবে।

শুক্রবার রাত সওয়া আটটা। কুড়ি ঘন্টার ওপর পঁয়ত্রিশজন বিদেশী রিপোর্টার ইন্টারকন্টিনেন্টালে আটক। এমন সময় সবাইকে বিছানাপত্তরসুদ্ধ মিলিটারি ট্রাকে তোলা হল। করাচি চালান দেওয়া হবে। আগে পিছনে কড়া পাহারা দিয়ে সাংবাদিকদের এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বাইরে ঘুটে ঘুটে অন্ধকার। কার আদেশে থামতে হল। বেতারে জাতির (!) উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট আগা মহম্মদ ইয়াহিয়া খাঁর ভাষণ। রিপোর্টারদের শুনতে হল। মাইডিয়ার কান্ট্রিমেন—আসলাম আলাইকোম্।...শেখ মুজিবর রহমানস্ অ্যাকসন...ইজ অ্যান্ অ্যাক্ট অব ট্রিজন...

যেভাবেই হোক রবার্ট কেলরকে ওরা পায়নি। খানিক পরে তাকেও পাকড়াও করে এয়ারপোরটে চালান দিল। চারা মরে পড়ে আছে। এখানে ওখানে এক এক মহল্লা ধরে জ্বলছে। পথে পথে ব্যারিকেড। জিপ চালাচ্ছিল গোঁফওয়ালা এক তরুণ ক্যাপটেন। খুব মেজাজী গলায় বলল, উই উইল ফিক্স দিস পিপল্।

রাত সাড়ে এগারোটা। প্লেনের দেখা নেই। টাইপরাইটার, ক্যামেরা, ফিল্ম—এমনকি বউয়ের লেখা চিঠিও ওরা কেড়ে নিল। রাত আড়াইটে অবধি প্রায় উলঙ্গ করে তল্লাসি। ওরা একটা জিনিসের জন্যে মরীয়া হয়ে খুঁজছে। বাংলাদেশের পতাকা। রাত তিনটেয় পি আই য়ের ৭০৭ জেট প্লেন এসে দাঁড়াল। এয়ারপোর্টের এককোণে এইমাত্র পেট ভর্তি সোলজার নামিয়ে দিয়ে এসেছে। ওরা সব কেড়ে নিল। কিন্তু কোন রসিদ দিল না। মুখে বলল, 'করাচি পেঁছে ফেরৎ পাবে!'

শুক্রবার শেষ রাতে সৈন্যরা বড়ই ক্লান্ত। রেল লাইনের দু'ধারে বাঁশের ঘর। মাথা নীচু করে না-ঢুকলে লাগবে। রাইফেলের ডগা থেকে ফ্লেম থ্রোয়ার ছুটে গেল। পাখির বাসায় সাপ ফণা তুলে দাঁড়ালে ডিম ফুটেও নাকি ছানা ছুটে পালায়। মেসিনগান আগেই সাজিয়ে মিলিটারি বসে ছিল।

ঠিক চৌত্রিশ ঘন্টা পরে শনিবার বেলা বারোটায় ক্লান্ত ঘাতকরা ক্যানটনমেনটে ফিরে গেল। যাবার আগে ওরা কেউ কেউ একটি বিচিত্র খেলা খেলেছিল। পথে যাও বা দু' চারজন চলছিল—আসলে পালাচ্ছিল—তাদের তল্লাসি করার ইচ্ছে হলেই সৈন্যরা মুখে বাঁশি দিয়ে হুইসেল বাজাচ্ছিল। বাঁশি শুনলেই থামতে হবে। না থামলে গুলি। সেদিন সব সোলজারই মিউজিক্যাল চেয়ারের রেফারি।

AMARBOI.COM

একাত্তরের প'চিশে মার্চ।
নরক হয়ে ওঠা বাংলাদেশের
শহর গ্রাম থেকে
হাঁটা পথে, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে
নৌকোয় নদীনালা ডিঙিয়ে
হাজার হাজার মানুষ
বেরিয়ে পড়েছে নিরাপত্তার খোঁজে।
পাশের ছবিতে দেখা যাচ্ছে
শ্রীহট্টের সুরমা নদীর পারে
ভিড়ছে নৌকোর সারি।
ভারতের দিকে
পাড়ি দেবার জন্যে।

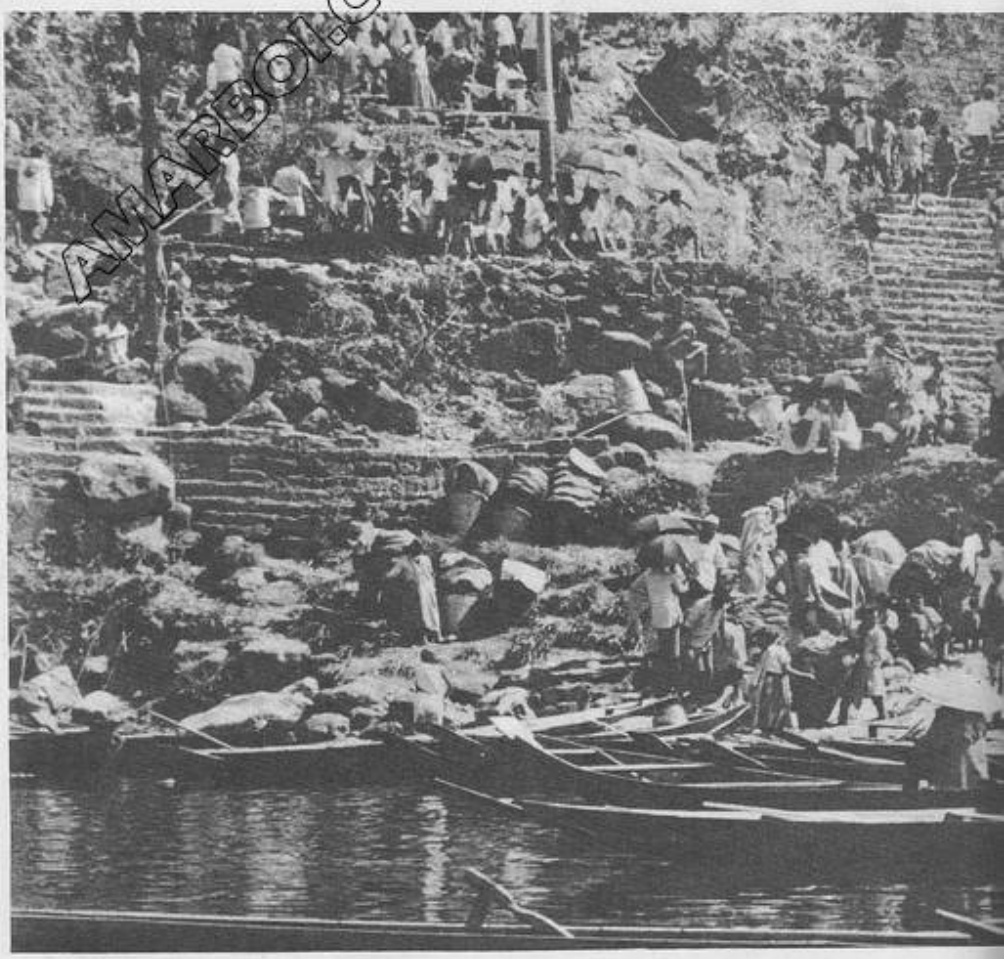

AMARBOI.COM

৪

অন্ধকার থেকে আলোয়

AMARBOI.COM

AMARBOI.COM

মহামারী আর কলেরা। পথে পথে মৃত্যুর মর্মান্তিক হাহাকার। আর মৃতদেহভোজী শকুন ও কুকুরের তৃপ্ত কোলাহল। মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর শিয়রে হতভাগিনী স্ত্রী। পাশে ক্ষুধার্ত ও অসহায় শিশু। সেদিনের ঘর হারানো অসংখ্য ছিন্নভিন্ন পরিবারের এ'রা একটি প্রতীক মাত্র।

এক শকুনের মুখ
থেকে পালিয়ে
শিবিরে পৌঁছবার আগেই
বহু শরণার্থী
আর এক শকুনের
খাদ্য হয়ে গেল

AMARBOI.COM

AMARBOI.COM

কোটি মানুষের ক্ষুধা মেটাতে গেলে রোজ কো

পিছনে শত্রুর কামানের হুংকার। সামনে
অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। তবু ওরা নিজের দেশের মায়া কাটিয়ে
দলে দলে চলেছেন আশ্রয়ের সন্ধানে। ওঁদের এই
মহাযাত্রায় রয়েছে অথর্ব বৃদ্ধা, ক্ষুধার্ত বৃদ্ধ, অনাথ
বালিকা, স্বামী ও স্বজন হারানো রমণীর দল। আর রয়েছে
পথের দুধারে মহামারীজনিত পচা শবের দুর্গন্ধ।

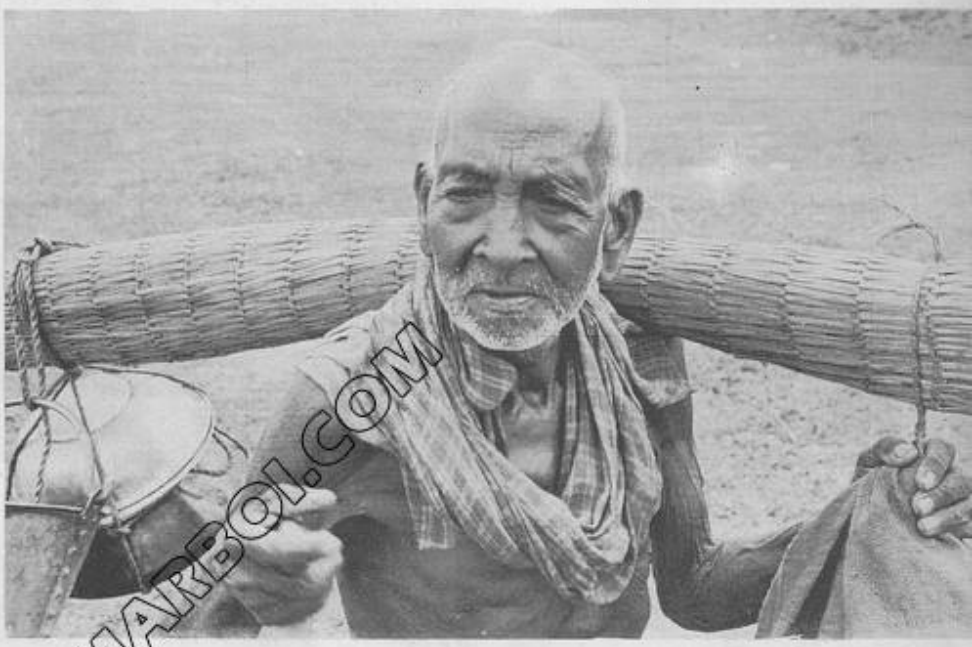

AMARBOI.COM

অধিক টাকা চাই

রোদ বৃষ্টি ঝড় কিছুই আর
প্রতিবন্ধক নয়। পাট ক্ষেতের কোল ঘেঁষে
কেউ চলেছে ভিজে কাপড় শুকোতে শুকোতে
কেউ পথের ক্লান্তি দূর করতে
বিশ্রাম নিচ্ছে ভাঙা ঘরের দাওয়ায়।
মুখে অনিশ্চিত জীবনের উদ্বেগ।

এরফান আলি ঢাকা বেতার শুনেছেন। শরণার্থীদের হালের বলদ, চাষের জমি, মাছের পুকুর, দোকান ঘর, বসতবাড়ি সবকিছুই অবাঙালী আর তাঁবেদারদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হচ্ছে

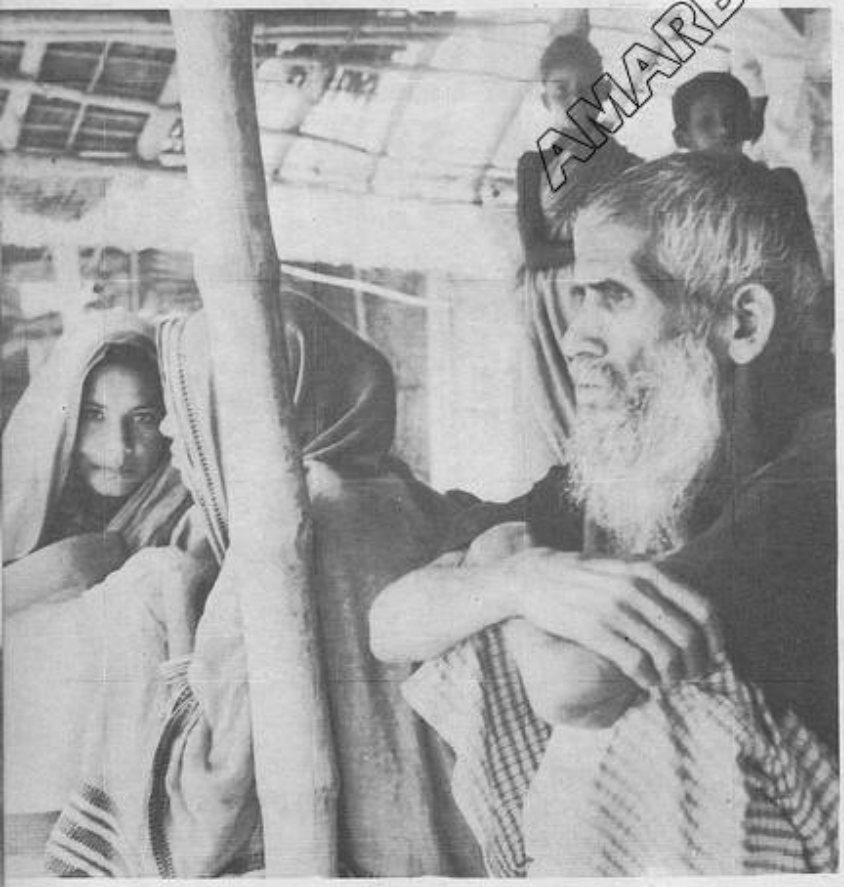

AMARBOI.COM

জল্লাদের হাত থেকে বাঁচানো
শিশুপুত্রের মাথায় জল ঢালছে
অভাগিনী জননী।
সদ্য বিধবা যুবতী আর সন্তান
বিয়োগে কাতর নবদম্পতির কান্নায়
ভারী হয়ে উঠেছে জৈষ্ঠের বাতাস

AMARBOI.COM

৯ মাসের বর্বর

উত্থান-পতনময় বহু ইতিহাসের
সাক্ষী শতবছরের পুরাতন এই
মুখ। দেখেছেন ইংরেজ এল, গেল।
দুভাগ হল সোনার দেশ।
দেখলেন আয়ুবের উদ্ধত শাসন।
ইয়াহিয়ার জঙ্গী বর্বরতা।
বৃদ্ধার সব গেছে। এখন আছে
কেবল বিড়ম্বনাময় জীবনের
মলিন স্মৃতিগুলি।
উপরে
প্রিয় দেশ এবং প্রিয় পরিজন
হারানো আরো বহু মুখের ছবি,
ব্যথিত, বিচলিত, বিষাদময়।
পাশে
নৌকোর উপরে নিস্ব
বাস্তুহারাদের কোনমতে বেঁচে থাকার
বঞ্চনাময় ঘরসংসার।

AMARBOI.COM

দিল্লীতে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান সাহাবুদ্দিন এক সম্বর্ধনায় সেদিন বলেছেন— খুন, অঙ্গহানী, ধর্ষণ, নিগ্রহ সব মিলিয়ে নয় মাসের বর্বর শাসনে বাংলাদেশে মোট সাত লক্ষ নারীর জীবন নষ্ট হয়েছে। ১২ জুলাই বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, সমগ্র বাংলাদেশে মোট তিন কোটি মানুষ গৃহহীন, ঠিকানাহীন

শাসনে বাংলাদেশে মোট ৭ লক্ষ নারীর জীবন নষ্ট

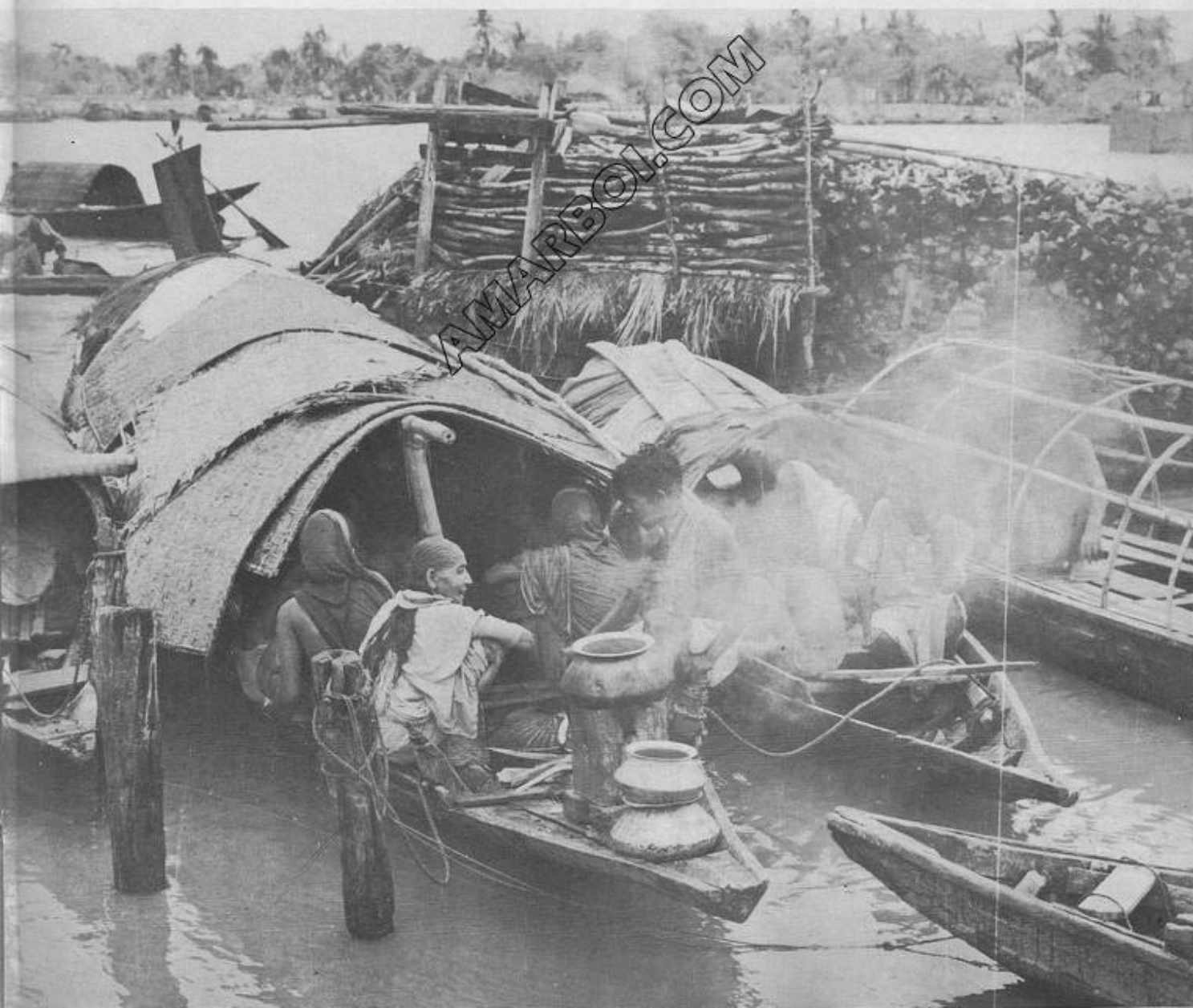

AMARBOI.COM

AMARBOI.COM

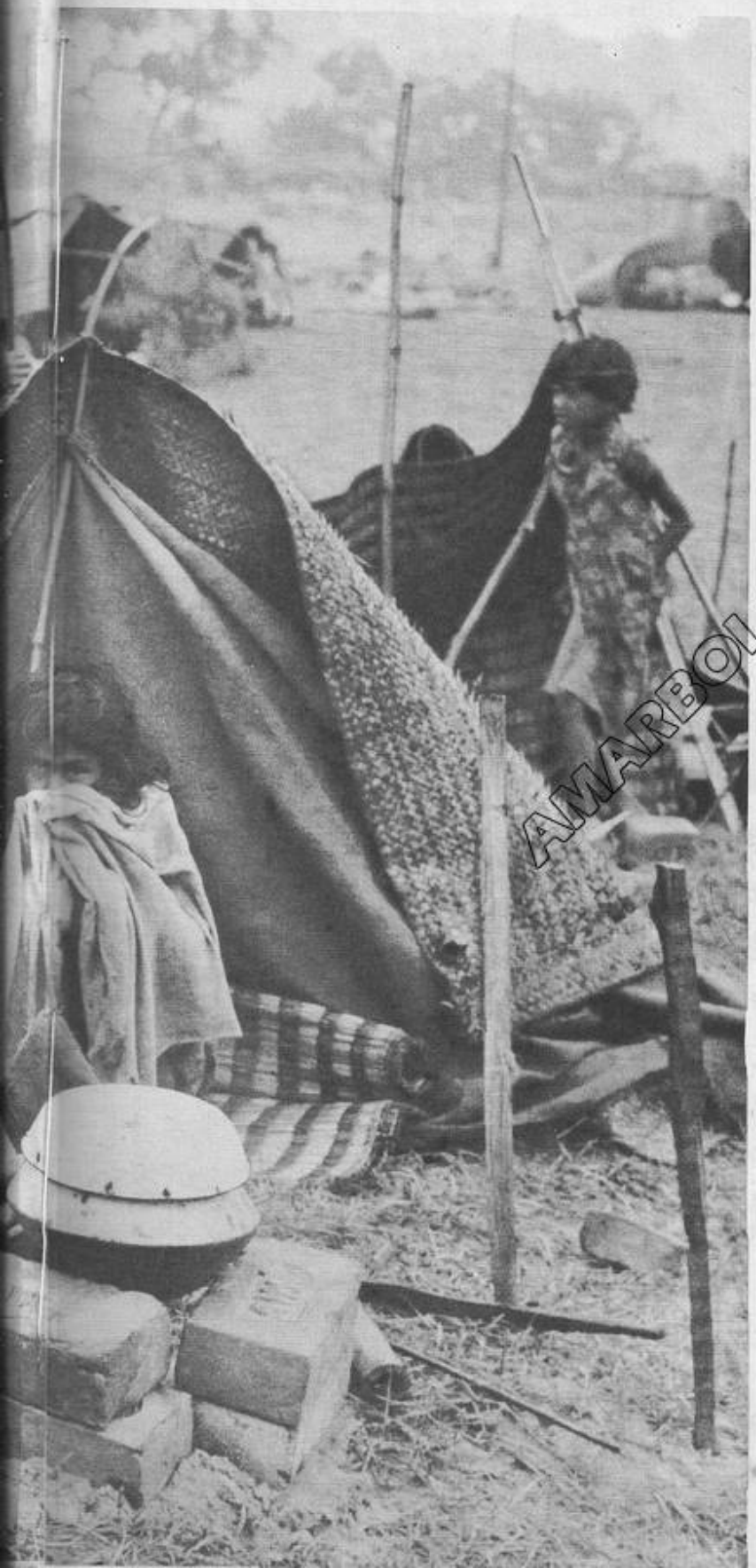

জ্যৈষ্ঠ যায়। আসে আষাঢ়।
শুরু হয় বৃষ্টির মাতন।
সেই মেঘের চাঁৎকারে কেঁপে কেঁপে
ওঠে আশ্রয়সন্ধানী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার
বুক। ছেঁড়া চাটাই মাথায় দিয়ে
বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে চাইছে ওরা।

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ের শিবিরে শিবিরে এত মানুষ যে, কোথাও কোথাও— যেমন মেঘালয়ে, কিংবা দিনাজপুরে শিবিরবাসীর সংখ্যা স্থানীয় জনসংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়। তবু তারই ভেতর সহনশীলতার এক চরম পরীক্ষা হয়ে গেল

AMARBOI.COM

AMARBOI.COM

জ্যৈষ্ঠ যায়। আসে আষাঢ়।
শুরু হয় বৃষ্টির মাতন।
সেই মেঘের চীৎকারে কেঁপে কেঁপে
ওঠে আশ্রয়সন্ধানী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার
বুক। ছেঁড়া চাটাই মাথায় দিয়ে
বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে চাইছে ওরা।

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা,
মেঘালয়ের শিবিরে শিবিরে এত
মানুষ যে, কোথাও কোথাও—
যেমন মেঘালয়ে, কিংবা দিনাজপুরে
শিবিরবাসীর সংখ্যা স্থানীয়
জনসংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়। তবু
তারই ভেতর সহনশীলতার এক
চরম পরীক্ষা হয়ে গেল

AMARBOI.COM

AMARBOI.COM

৮২,০৫৬ তাঁবু
আর ২৪ হাজার ত্রিপল
সংগ্রহ করা হল,
নানা জায়গার শিবিরে
এই সব ভাগ্য-বিড়ম্বিতদের
আশ্রয় গড়ার জন্যে

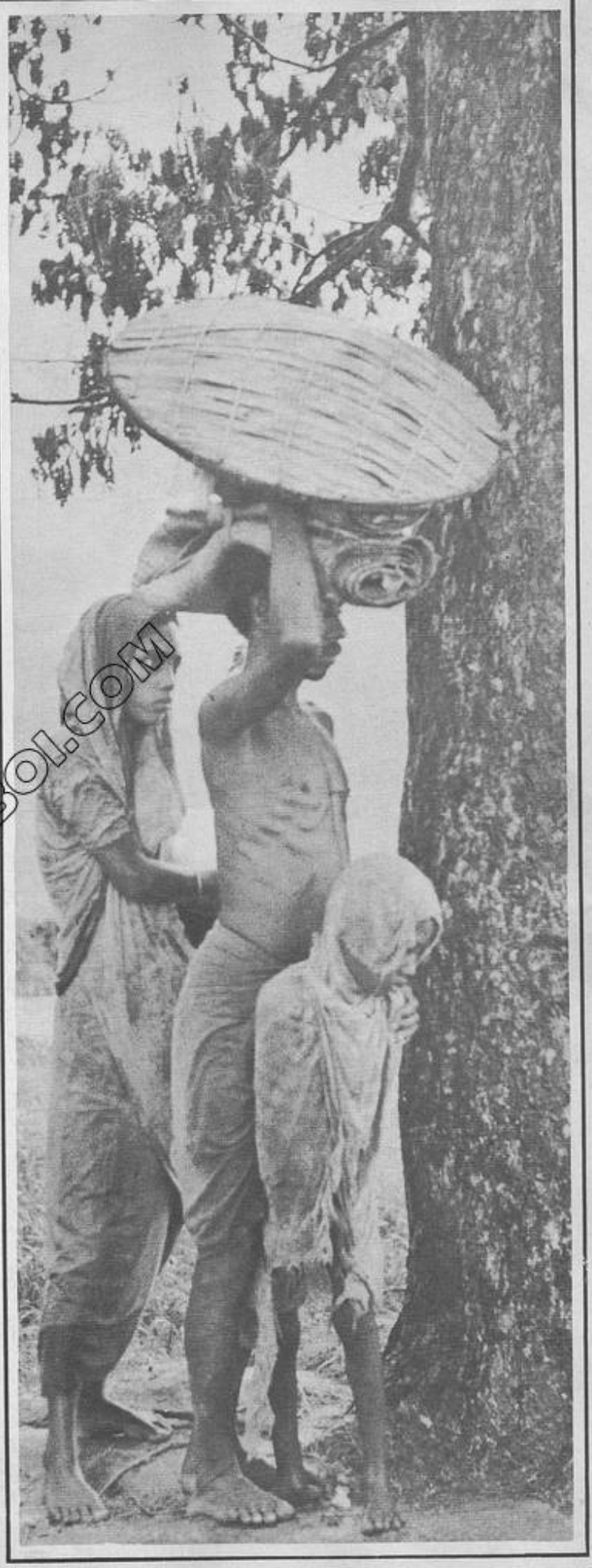

গরুর গাড়ীতে চেপে
ছেঁড়া ছাতা মাথায় দিয়ে চলেছে
বৃদ্ধা। আরেক বৃদ্ধাকে
সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে
তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ।
অন্যদের একমাত্র আশ্রয় বৃক্ষতল।

AMARBOI.COM

AMARBOI.COM

গোড়ায় দেখাশোনার ভার ছিল রাজ্যসরকারের হাতে। কিন্তু রোজ লক্ষ শরণার্থী আসতে শুরু হলে সব ব্যবস্থা বুঝি ভেঙে পড়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকার নিজের তত্ত্বাবধানে তখন কলকাতায় শরণার্থী ত্রাণ দপ্তর খুলে বসলেন। দেখাশোনার সর্বময় কর্তা করনেল লুথরা। খবরের কাগজ, ডাক টিকিট, রেভিনিউ স্ট্যাম্প, সিনেমার টিকিট শরণার্থী ত্রাণের জন্য এসবের ওপর অরডিনানস্ করে সারচারজ বসানো হল। ইয়াহিয়া তার এই অবাঞ্ছিত দেশবাসীকে বেমালুম অস্বীকার করতে চেয়েছিল। বলেছিল ঃ ওরা কলকাতার ফুটপাথবাসী। ভারত বানিয়ে বানিয়ে শরণার্থী আনিয়েছে। কিন্তু শেষমেশ কবুল করতে বাধ্য হয়েছিল, হ্যাঁ, বিশ লাখের মত মানুষ ভারতের প্ররোচনায় দেশ ছেড়ে চলে গেছে

এখনো এ'রা আশ্রয়হীন। এখনো শেষ হয়নি পথ চলা। পথের মধ্যেই দুঃখের সংসার ছড়িয়ে দিয়ে বাঁচা। শিশু সন্তানেরা কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে মায়ের কোলে। কারো চোখে ঘুম নেই খিদের জ্বালায়। নীচের ছবিতে একরত্তি মেয়েটি একমুঠো ভাতের জন্যে তাকিয়ে আছে উনুনে চাপানো হাঁড়ির দিকে। তার সব-হারানো জীবনের এই মর্মান্তিক মুহূর্তটুকুর নীরব সাক্ষী হয়ে পাশে শুয়ে রয়েছে পথের কুকুরটি।

AMARBOI.COM

অবশেষে ভারতের মাটিতে। জনস্রোত যেন জলস্রোত। হাজারে হাজারে মানুষ ছুটে আসছে ভারতের দিকে, আহার ও আশ্রয়ের খোঁজে। হাটে মাঠে ঘাটে তাঁবু খাটিয়ে তৈরী হতে লাগলো শরণার্থী শিবির। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ত্রিপুরা, মেঘালয়ে ভরে গেল শিবিরে শিবিরে।

ডান দিকের পাতায়

পথ চলা শেষ। আবার স্বাভাবিক জীবন শিবিরে শিবিরে। নতুন সংসার। দুধের শিশু রোদ বাঁচিয়ে ঘুম যায় ছাতার নীচে। কোলের শিশু দোল খায় দড়ির দোলনায়। পাঁচ ভাই বোন একটা থালায় ভাগ করে খায় দিনের আহার। নাপিত সেজে ছেলের চুল ছেঁটে দেয় বাবা। হাত-আয়না হাতে নিয়ে কুলবধূ সিঁথিতে পরায় এয়োতী সিঁদুরের টিপ।

প্রয়োজনের তুলনায় বাইরের

AMARBOI.COM

তাঁবেদার ঢাকা বেতার
তখনো বলে চলেছে—
ভারতে শরনার্থী শিবির
আসলে নরক। কাঁটাতারে
ঘেরা বন্দী শিবির

সাহায্য সমুদ্রে গোষ্পদ

AMARBOI.COM

বিদেশী সমাজকর্মীদের কাছে ভাষা সেদিন

AMARBOI.COM

'কাসা', রামকৃষ্ণমিশন, 'অকস্‌ফাম' ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ—দেশী-বিদেশী কোন সেবাপ্রতিষ্ঠানই পিছিয়ে ছিলেন না। বিদেশী সমাজকর্মীরা বাংলাদেশের শরণার্থীনীর হাত দু'খানি ধরে তাঁর দুঃখের শরিক হতে চাইছেন

বাধা ছিল না

AMARBOI.COM

নানা দেশ থেকে আসছে ভালবাসার দান হিসেবে চাল, ওষুধ, তাঁবু, আরও কত কী। রুশ দেশ থেকে আসা একটি বিশেষ বিমান থেকে জিনিষপত্র নামানো হচ্ছে দমদম বিমান বন্দরে।

ভারত সরকার হিসেব করে বলেছিলেন, শরণার্থীদের সবাইকে মার্চ নাগাদ বাংলাদেশে পাঠানো অবধি ব্যয় দাঁড়াবে ৩৭২ কোটি টাকা। শরণার্থীরা যখন স্রোতের মত নিরাপত্তার আশায় ভারতের মাটিতে এসে আছড়ে পড়ছিলেন—তখন ভ্যাটিকান সমেত ১৭টি দেশ নগদে, জিনিসপত্রে মোট ৭২ কোটি টাকার সাহায্য দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে হিসেব নিকেশ করে দেখা গিয়েছে, ওই প্রতিশ্রুতির শতকরা মোটে ৩৮ ভাগ শেষ অবধি এসে পৌঁছেছে। অর্থাৎ ২৬ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার মত। এই টাকায় শরণার্থীদের মোট দশ দিন খাওয়ানো সম্ভব হয়েছে। প্রতিশ্রুতির ঘোষণাগুলি যেভাবে কাগজে কাগজে প্রচারিত হয়েছিল—প্রতিশ্রুতি রক্ষায় এই বিপুল ফারাকের কথা কিন্তু সামান্যই প্রকাশ হয়েছে

AMARBOI.COM

AMARBOI.COM

শরণার্থীদের সংগে ব্রিটিশ এম· পি আরথার বটমলি। শরণার্থীরা তাঁর কাছ থেকে জানতে চায় কে বৃটেনের বেশী বন্ধু? খুনী ইয়াহিয়া না গণতন্ত্রী বাংলাদেশ:

পাশে রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্বাস্তু বিভাগের হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খাঁ এসেছেন শরণার্থী দর্শনে। বহু জনের বহু অশ্রুসজল বেদনার ইতিহাস শুনে আশ্বাস দিলেন অনেক কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতভাগ্যদের কপালে কিছুই জোটেনি।

লবণহ্রদে বাহাত্তর ইঞ্চি পাইপের আশ্রয়ে

অবশেষে এলেন টেড কেনেডী—আমেরিকার বিখ্যাত কেনেডিভ্রাতাদের কনিষ্ঠ ও অবশিষ্ট কুলপ্রদীপ। সব দেখলেন, শুনলেন। নিজের দেশে ফিরে গিয়ে তাঁকে দেখা গেল বিক্ষোভের ঝড় তুলতে। নিকশন প্রশাসনের বিরুদ্ধে।

প্রথম ছবিতে তাঁকে দেখা যাচ্ছে জল বৃষ্টি উপেক্ষা করে চলেছেন শরণার্থীদের শিবির-জীবন প্রত্যক্ষ করতে। পাশের ছবিতে পাইপবাসী মানুষেরও পাশে দেখা যাচ্ছে তাঁকে।

AMARBOI.COM

নিরাশ্রয় নল-মানবদের একেবারে মুখোমুখি

AMARBOI.COM

সাহারা আর লবণহ্রদের শিবির ঘুরে রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হাইকমিশনার প্রিন্স সাগিরুদ্দিনের মালুম হল—সমস্যা কি বিরাট। ফিরে গিয়ে জুলাইয়ের মাঝামাঝি তিনি লনডনে বললেন, প্রয়োজনের তুলনায় বাইরের সাহায্য সমুদ্রে গোষ্পদ।

বন্দী ঢাকা বেতারের ঘোষণা মোতাবেক—শিবিরে কাঁটাতারের বেড়া ছিল সত্যি। কিন্তু এত মানুষের সুশৃঙ্খল, সহাস্য সমাবেশ পৃথিবীতে ইতিপূর্বে কোথায় কবে আর ঘটেছে?

AMARBOI.COM

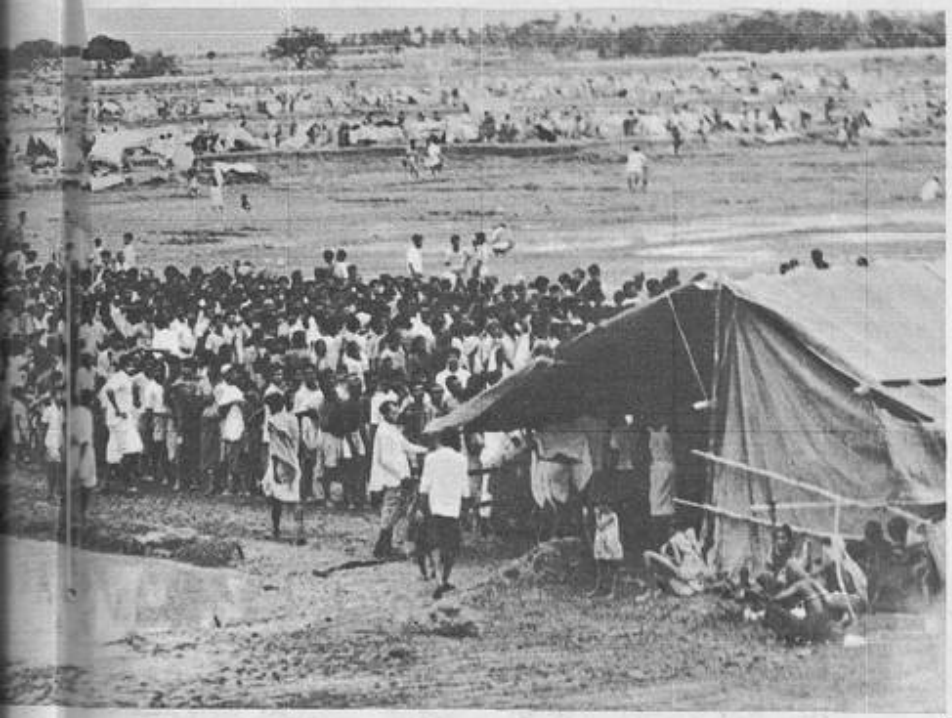

আগসটের গোড়ায় সেনেটর কেনেডির সঙ্গে এসেছিলেন শরণার্থীদের পুষ্টির অভাব নিরূপণের জন্যে বিশেষজ্ঞ। তাঁর হিসেবমত দিনে কয়েক হাজার করে শিশুর মৃত্যু হওয়ার কথা। তা ঘটেনি। ওষুধ তৈরির বেসরকারী প্রতিষ্টানগুলি নানান ওষুধ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। কলকাতার মেডিকাল ছাত্ররা, তরুণ চিকিৎসকরা শিবিরে শিবিরে ঘুরেছেন। বনগাঁয় বারো বেডের ফিল্ড হাসপাতালে রাজস্থানের ডাক্তার ফরিদপুরের তরুণের বাহু থেকে পাক-বুলেট বের করে অসাধ্য সাধন করেছেন

এর নাম সাহারা। না, মরুভূমি নয়। দমদমের কাছে পরিত্যক্ত এক ভূখণ্ড। শরণার্থীদের ঢেউ প্রতিদিন এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে সাহারার শুকনো মাটিতে।

AMARBOI.COM

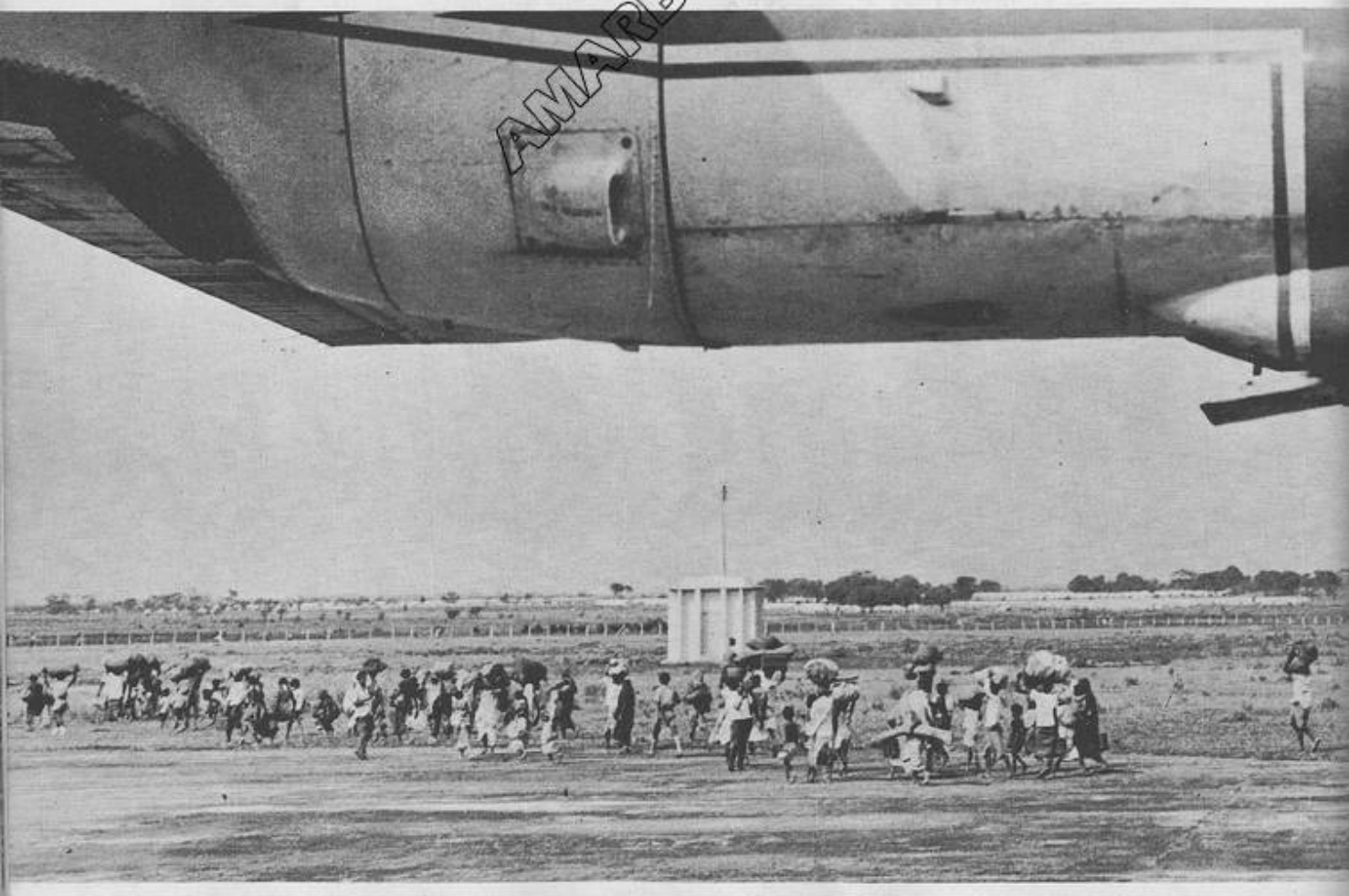

AMARBOI.COM

শরণার্থীদের অপসারণে এগিয়ে এসেছে রুশ বিমান, মারকিন বিমান। মারকিন বিমানে আগরতলার শরণার্থীরা গেলেন গৌহাটী। আর রুশ বিমানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দণ্ডকারণ্যের মানা। সেখানে তাদেব জন্যে অপেক্ষা করছে নতুন জীবন। অন্ধকার থেকে নতুন আলোর দিকে শুরু হল শরণার্থীদের নব অভিযান।

AMARBOI.COM

বাংলা নামে দেশ

AMARBOI.COM

AMARBOI.COM

এক একটি মানুষ এক একটি দুর্গ

লাহোর থেকে রাওয়ালপিনডি যাওয়ার পথে খারিয়া। সেখানে পাক সাঁজোয়া বাহিনীর হেড কোয়ার্টার। দশ বছরের পুরনো জবরদস্ত ডিক্টেটর '৬৯ সনের ফেব্রুয়ারিতে জেনারেলদের নিয়ে গোপনেই বৈঠকে বসলেন। মুজিব তো নাজেহাল করে ছাড়ছে। একটা পাকাপাকি সমাধান চাই।

রফা করতে করতে আয়ুব বাঙালীদের মন ভেজানোর জন্যে সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙালী নিচ্ছিলেন হুহুকরে। কিন্তু খারিয়ার সেই কূট মন্ত্রণা সভায় কোন বাঙালীকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

ভারত স্বাধীন না হলে এরা কোনদিন ব্রিগেডিয়ারের বেশি হতে পারতেন না। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে মাত্র কয়েক বছরে ফাঁকা ময়দানে জেনারেল হয়ে মাথা বিগড়ে গেল। তারপর মারকিন মুলুক থেকে খয়রাতির কামান, বিমান ট্যাংক পেয়ে আরও গোলমাল হয়ে গেল। ওরা তাই সহজ সলুসন বের করলেন। বাঙালীদের সাবাড় কর।

নিজের কোতল-কান্ড চালু করার আগেই আয়ুব বাতিল হয়ে গেলেন। থেকে গেল খারিয়ার প্ল্যান। বাঙালী সাবাড়ের সেই শীতল সংকল্প ইয়াহিয়া অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। রফার সুযোগে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট গড়ে উঠেছে। ইয়াহিয়ার খড়্গ সেই কুখ্যাত বৃহস্পতিবারের রাতে জিরো আওয়ারে নেমে আসার সময় বাংলাদেশেই পুরোদস্তুর আরমির ট্রেনিং. পাওয়া সাড়ে চার হাজার ই বি আর ছিল। বাকি ৩৬০০জন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। সেদিন বাংলাদেশে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলের লোক ছিল একুশ হাজার। তার ভেতর শতকরা ৪০জন অবাঙালী। বেশির ভাগ অফিসারও তাই।

আর পুলিশ ছিল ৪০০০০।

ইয়াহিয়া ধাপে ধাপে এগোচ্ছিলেন।

১০ মার্চ। ১৯৭১। ঢাকায় ই পি আর-কে নিরস্ত্র করার নির্দেশ দেওয়া হল। পুলিশবাহিনীকে নিরস্ত্র করতে গিয়ে খোদ কমিশনারের অফিসের মধ্যেই গুলি বিনিময়। ৩জন নিহত। আই জি তসলিমুদ্দিন ডিস-আরম্ করতে অস্বীকার করলেন। পিনডি অয়ারলেসে সব শুনে অরডার দিল—ক্র্যাস। এ যে মিউটিনি।

মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের সময়েই দেখা যেত প্রেসিডেন্ট ভবনে পাহারাদার ই পি আর শুধু লাঠি হাতে আর পাক আরমির সোলজাররা অটোমেটিক কাঁধে।

AMARBOI.COM

মুজিব বাহিনী

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুজিব বাহিনী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। মুজিব বাহিনী মুক্তিবাহিনীরই অঙ্গ। কিন্তু এই অঙ্গটি অনেক বেশী রাজনীতি-সচেতন এবং রাজনৈতিক লক্ষ্যাভিসারী। মুজিববাহিনী আওয়ামী লীগ এবং ছাত্র লীগের বাছাই করা তরুণ ও শিক্ষিত কর্মীদের নিয়ে গড়ে ওঠে। এই বাহিনী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন মুখ্যত বঙ্গবন্ধুর ভাগনে শেখ ফজলুল হক মনি, যুবনেতা আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ এবং আ. স. ম. আবদুর রব। এই বাহিনীর গোড়া পত্তন হয় বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার সময়। মারচ মাসের মাঝামাঝি সময়ে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের অসামরিক প্রশাসন নিজের হাতে গ্রহণ করেন এবং পঁয়ত্রিশটি নির্দেশ জারী করেন। এই নির্দেশ যাতে পালিত হয় তার ব্যবস্থা করা, জনজীবনের অচলাবস্থা দূর করা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করার গুরুদায়িত্ব আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের যুব স্বেচ্ছাকর্মীরা গ্রহণ করেন। মারচ মাসের শেষ দিকে যখন পাকিস্তানী সামরিক জুন্টার অশুভ উদ্দেশ্য অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন এই যুব স্বেচ্ছাসেবকরাই প্রথম প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ছাত্র ও যুবকদের প্রাথমিক সামরিক ট্রেনিং দান শুরু হয়। ২৩ মারচ তারিখে ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে এই ছাত্র ও যুব নেতারাই বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন এবং যুবসেনাদের সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করেন। ২৫ মারচ মধ্যরাত্রে এই যুবসেনাদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়েই পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ঢাকার

বাঙালীরা আয়ুব-ইয়াহিয়া কোমপানিকে হাড়ে হাড়ে চিনতেন। আশংকাও করছিলেন। ভয়ংকর কিছু আসন্ন—এ আর চাপা ছিল না। ঢাকার প্রেসিডেনট ভবনের বৈঠক থেকে জেনারেল পিরজাদা বেরিয়ে গেলেন। মুজিব ২৫ মার্চ রাতেই প্রায় মুক্ত চট্টগ্রামে টেলিফোনে টেলিফোনে জানাতে লাগলেন—

আক্রমণ আসন্ন। পিনডির প্রচারে কান দিও না। কিছুতেই অস্ত্র জমা দেবে না। পালটা পেটাও। স্বাধীনতাই আমাদের শেষ স্টেশন।

এর আগেই ১৯ মার্চ তিনি করনেল উসমানিকে দিয়ে ই বি আরের বাঙালী অফিসারদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তোমরা প্রস্তুত থাকো। ১৯৬৯-এর জুন মাস থেকেই শেখসাহেব ই বি আর, ই পি আর, পুলিশবাহিনীকে এই রকমই একটা পরিণতির কথা বলে আসছিলেন।

আগে ঠিক ছিল ২৪ মার্চ পিনডির ঘাতকরা ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু ইয়াহিয়া যাতে করাচি পাড়ি দিতে পারেন সেজন্য নরমেধ যজ্ঞের দিন-ক্ষণ চব্বিশ ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হল। চট্টগ্রাম অতটা অপেক্ষা করতে পারেনি। ঘটনা নিজেই নিজের মত করে ইতিহাস হয়েছে। 'সোয়াইত' জাহাজ থেকে বাঙালী খালাসিরা ভারি কামান, গোলাবারুদের বাক্স নামাতে অস্বীকার করল। চট্টগ্রামের মারশাল ল অ্যাডমিনস্ট্রেটর ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে আগেই ঢাকায় ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারপরেই ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। তাঁকে ৬জন অফিসার, ২০০ লোক দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের বেয়াদব খালাসিদের আদব মোতাবেক দুরস্ত করতে পাঠানো হল।

ফলম্? বিপরীত। অনুচর সমেত মেজর জিয়া বন্দরে হাজার হাজার দেশপ্রেমিক বাঙালীর সামিল হয়ে গেলেন। এল এম জি-র নলগুলো ঘুরে গিয়ে ক্যানটনমেনটের দিকেই তাক করল। তিনি সম্ভবত জানতেন না চৈত্রের বঙ্গোপসাগরে করাচির ডেস্টয়ার বাবর আর জাহাঙ্গীর তৈরি হয়েই ছিল। অয়ারলেসে খবর পেয়ে ওরা বন্দর লক্ষ্য করে আগুন বমি করতে লাগল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ভেতর চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় ঘাটি গেড়ে বাঙালীরা বিপ্লবী হলেন। নেতা মেজর জিয়া। কয়েক ঘণ্টায় চট্টগ্রাম তার পায়ের নীচে। রেডিও স্টেশন দখলে।

একটি বিপুল নাটকের নানান অংক তখন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় আপনাআপনি অভিনীত হচ্ছিল।

ইয়াহিয়া-ভুট্টো ম্যানেজিং এজেন্সির বসন্ত কাল টাইমটেবিল মাফিক শুরু হয় ২৫ মারচ। ১৯৭১। মধ্যরাতে।

AMARBOI.COM

বিভিন্ন ছাত্রাবাসে আকস্মিকভাবে হামলা চালায় এবং অসংখ্য ছাত্র ও শিক্ষককে হত্যা করে। কিন্তু ছাত্র ও যুবনেতারা আত্মরক্ষায় সক্ষম হন। তারা নিরাপদ এলাকায় সরে আসেন এবং নিজেরা সামরিক ট্রেনিং গ্রহণ করা ছাড়াও ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ই. পি. আর-এর অফিসারদের সহযোগিতায় মুক্তিসেনাদের সংগঠিত শক্তি হিসাবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। মুক্তি-যুদ্ধকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করা ছাড়াও এই যুদ্ধের নেতৃত্ব যাতে কোন উগ্র ও চরমপন্থী দলের হাতে চলে না যায়, মুজিব বাহিনী সেদিকে লক্ষ্য রাখেন। কোন চরমপন্থী গ্রুপ বা দলের কারসাজিতে মুক্তিযোদ্ধারা যাতে বিভ্রান্ত না হয় এবং জাতীয়তাবাদী লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়, মুজিব বাহিনী সেদিকেও লক্ষ্য রাখেন। সাধারণ ভাবে জনসাধারণের মন থেকে হতাশা দূর করা এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় রাজনৈতিক লক্ষ্যে স্থির থাকা—এ দুয়ের জন্যই মুজিব বাহিনীর প্রশংসা প্রাপ্য।

ডিসেম্বর মাসে মুজিব বাহিনীর প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার তরুণ বিশেষ ধরনের গেরিলা শিক্ষা শেষ করেন। এদের কারও বয়স একুশ বছরের বেশী নয়।

তার আধঘণ্টা আগে ঢাকার কাছাকাছি আধা-ক্যানটনমেনট জয়দেবপুরে ই বি আরের বাঙালী কর্তা করনেল রাকিবকে অফিসারস্ মেসে বাচ্চা পানজাবী ক্যাপটেন নাগভি হুইস্কির অষ্টম পেগটি এগিয়ে দিল। রাকিব আসলে এই ছোকরা ক্যাপটেনের পিতৃবন্ধু। কিন্তু তাতে কি? নাগভি তখন 'অখণ্ড পাকিস্তান' এবং 'সাচ্চা মুসলমান' নামক দু'টি কড়া নেশার ঘোরে পুরো মাতাল। অবলীলায় কোমর থেকে পিস্তল বের করে করনেল রাকিবকে শেষ করে দিল।

পিনডির মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের ছক মত প্রায় একই ভাবে যশোরে ই বি আরের বাঙালী প্রধান করনেল জালালুদ্দিন প্রাণ দিলেন। তাঁর পরের বাঙালী অফিসার মেজর ওসমান তখন চুয়াডাঙ্গায়।

রাকিব গেলেন। রইলেন মেজর শফিউল্লা। তিনি তাঁর পুরো বাহিনী নিয়ে লড়াই করতে করতে জয়দেবপুর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। যা কিছু অস্ত্রশস্ত্র পেলেন সঙ্গে নিলেন। ই বি আরের মেজর খালেদ মুসারেফ সদলবলে তখন কি কাজে ময়নামতি ক্যানটনমেনটের বাইরে ছিলেন। ইয়াহিয়ার কবন্ধ খড়্গ সময়মত তাঁদের না পেয়ে ব্যর্থ হল।

টিক্কা খাঁ বেশিদূর দেখতে পেত না বলেই ভেবেছিল তিন দিনে বাংলাদেশ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। প্রথম আঘাতে ঢাকা যখন প্রায় মাথা ঘুরে পড়েছে—ঠিক তখনই ২৬ মারচ চট্টগ্রাম রেডিও 'স্বাধীন বাংলা বেতার' নাম দিয়ে ঈথার তরঙ্গে ভেসে এল। অনেক পরে ইয়াহিয়া শ্বেতপত্রের নামে যেসব নীরক্ত মিথ্যা চালাতে চেয়েছিল—তার ভেতরে একটি সত্য কবুল না করে পারেনি। তা হল—মারচের শেষ দিকে চট্টগ্রাম কিছুদিন আমাদের কবজার বাইরে ছিল।

২৫ মার্চ মাঝরাত থেকে ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইন গুঁড়িয়ে দিতে গিয়ে পাক আরমির রাত প্রায় ভোর হয়ে যায়। পুলিশ, ই পি আর, ই বি আর—যে যেখানে পেরেছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সরে পড়েছে। অনেকেই ভাবছিলেন—ইয়াহিয়া-মুজিব মিটমাট হয়ে গেল বলে। ঢাকার হাওয়ায় তেমনি একটা গন্ধ চারিয়ে গিয়েছিল চারদিকে। তাই অনেকেই ঘুমের ভেতরে ব্যারাকে আর জাগেননি। অনেককে দেখা যায়—২৬ মার্চের সকালে আরমির ট্রাকে ক্যানটনমেনটে চলেছেন। তাঁদের খবর কোনদিন পাওয়া যাবে না।

ঢাকা, কুমিল্লা, যশোরে পিনডি অনেকদিন ধরে ক্যানটনমেনট বানিয়েছে। চট্টগ্রামে বানিয়েছে নৌঘাটি। সৈদপুরে সাঁজোয়া বাহিনীর আড্ডা। জয়দেবপুর আধা সেনা ছাউনি। এত করেও হোথা বারবার বাদশাজাদার তন্দ্রা যেতেছিল টুটি। তাই অধিকন্তু ন দোষায়। বাঙালী সাবাড়ের মুখে মুখে পানজাবী সৈন্যরা শ্রীহট্ট, রাজশাহী, বগুড়াতেও ছড়িয়ে পড়ে।

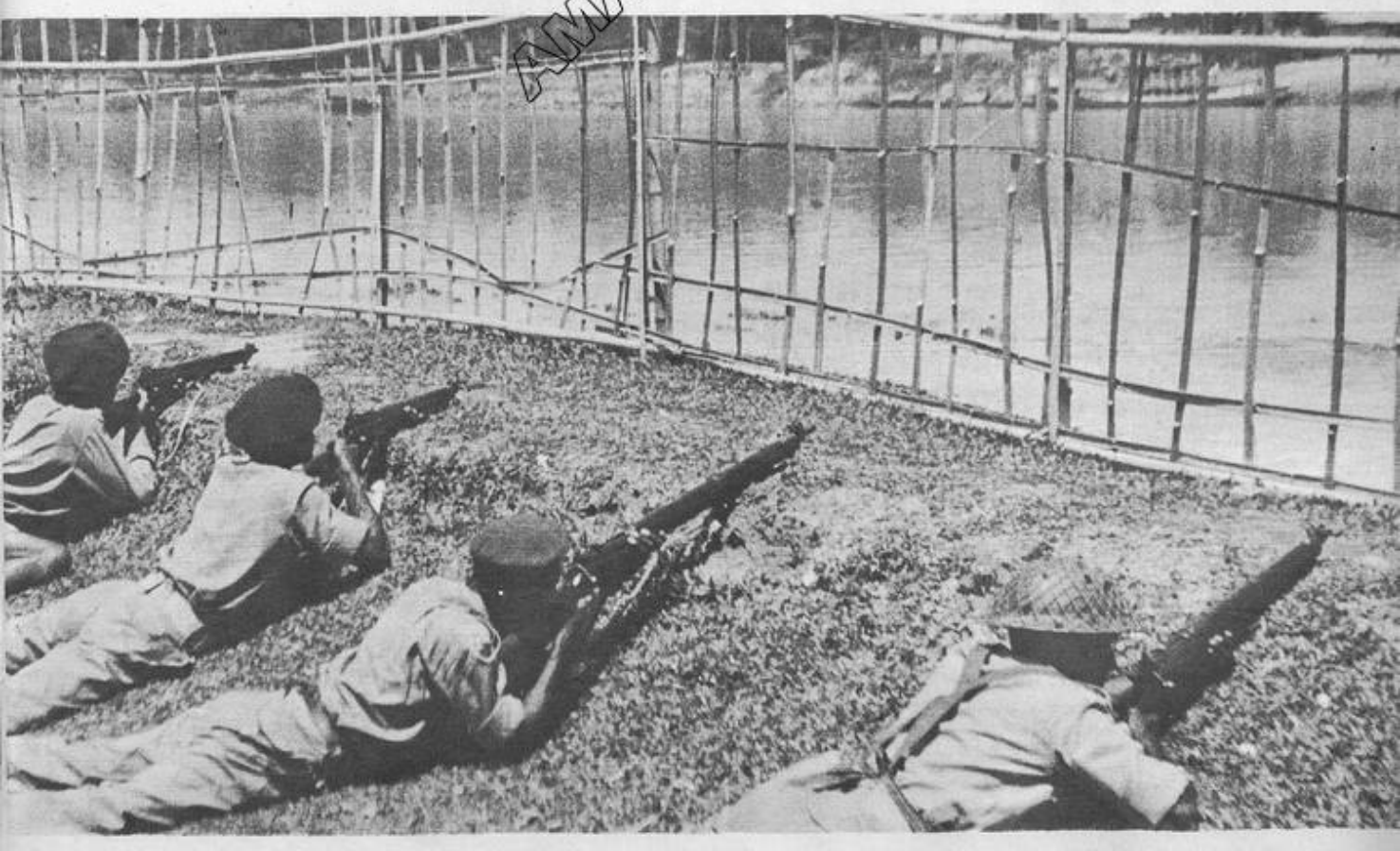

AMARBOI.COM

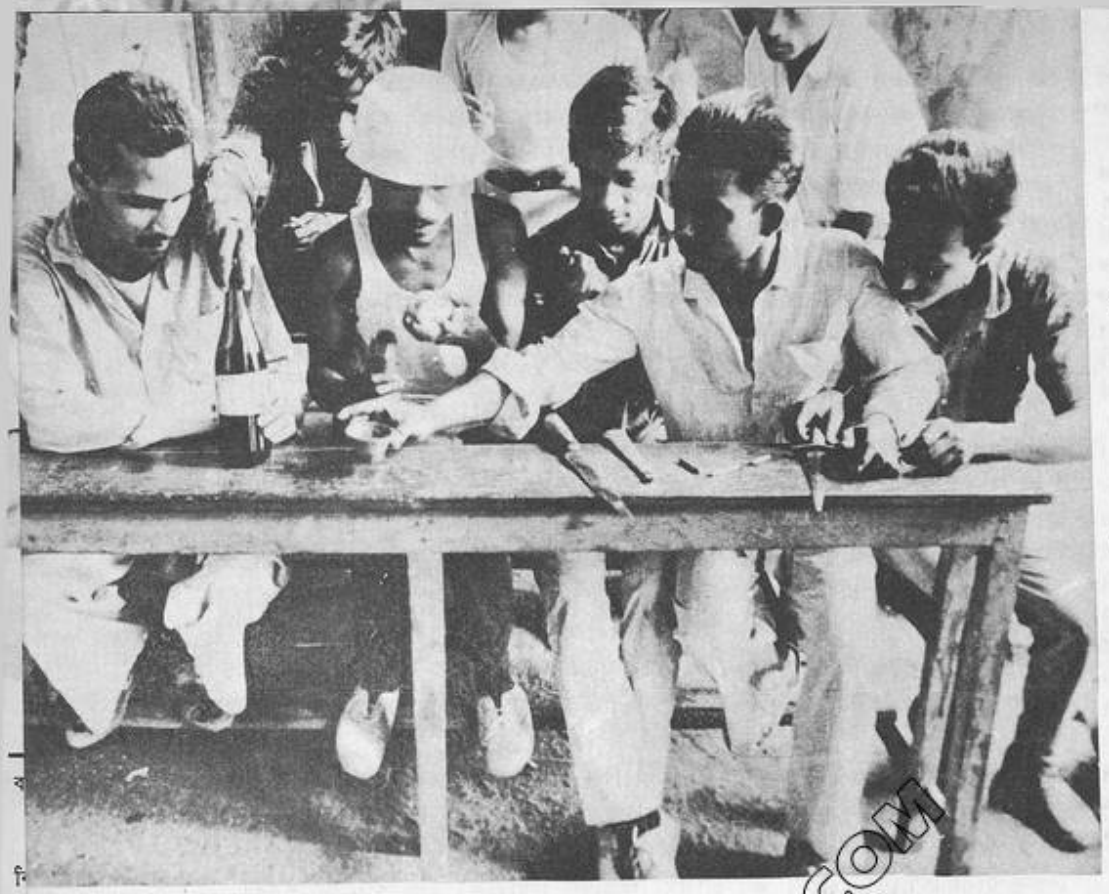

হাতবোমা তৈরির ক্লাশ। লোহার টুকরো, টিনের কৌটো, পাট, পটাশ, অ্যাসিডের বোতল। কোন উপায় ছিল না। এপরিলের মাঝামাঝি এইসব সামান্য জিনিস নিয়েই পেণ্টাগণের ফ্লেম থ্রোয়ার, পিকিংয়ের টি৫৪ ট্যাংকের সঙ্গে যুঝতে হয়েছিল। ঊরদি, খাবার, রাইফেল, আশ্রয়—কিছুই ছিল না সেদিন।

কাদের বাহিনী

কাদের বাহিনী বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীরই আরেকটি শক্তিশালী অংশ। এই দলের নেতার নাম কাদের সিদ্দিকী। আরো পরিচিত নাম টাইগার সিদ্দিকী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে টাইগার সিদ্দিকী কিম্বদন্তীর নায়ক। পঁচিশ বছর বয়সের এই তরুণ একদল তরুণ সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনায় বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি করেন। কাদের বাহিনীর তৎপরতার কেন্দ্র ছিল মধুপুরের জঙ্গল। এই এলাকায়

বালুচিস্তানে নির্মম নিধনে নাম কিনে টিক্কা খাঁ বাংলাদেশেও নাম কিনতে চেয়েছিল। তার হাতে ছিল সাড়ে বারো হাজার পদাতিক। এক রেজিমেণ্ট ট্যাংক। বিস্তর কামান, বিমান। কিন্তু তার খোয়াব মাফিক, তিনদিনেই সব যখন ঠিক হল না—তখন জাহাজে—ঘোরা পথে বিমানে গোক লস্কর, অস্ত্রশস্ত্র এসে পেঁছতে লাগল। দশ হাজার সৈন্য নিয়ে জাহাজ এসে পৌঁছল চট্টগ্রামে ১৮ এপ্রিল। বিমান এসে নামতে শুরু করল। টিক্কা খাঁ শংকিত। যে চারাকে নিমেষেই নির্মূল করার খোয়াব দেখছিলেন তা মহীরুহের আকার ধারণ করতে শুরু করেছে। আরও সৈন্য চাই, আরও অস্ত্র চাই। ঢাকা থেকে খবর গেল পিণ্ডিতে।

এপরিলের শেষ নাগাদ টিক্কা একেবারে মহাবলী। নিয়মিত সৈন্য=৩৭৮০০। শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী=২২০০০। ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড্ ফোর্স=১৭০০০। মুজাহিদ=৪৫০০। কামান=২০০। ট্যাংক=৮৪। স্যাবার জেট=২৩। নদীপথে গোলন্দাজির জন্যে=৬টি ব্যাটারি। ট্যাংক ছড়িয়ে পড়ল ঢাকা, চট্টগ্রাম, সৈদপুর, রংপুরে। বর্ষা নামতেই পাক নেভি সক্রিয় হয়ে উঠল।

এদিক সেদিক এলোপাথাড়ি মার খেতে খেতে এবং সুযোগ মত মার দিতে দিতে প্রাক্তন ই বি আরের তিন মেজর—শফিউল্লা, জিয়া, মুসারেফ—৬ এপরিল নাগাদ কুমিল্লার তেলিয়াপাড়ার চা-বাগানে এসে ওঁদের অপারেশনাল হেড কোয়ার্টার করলেন।

ওদিকে চুয়াডাঙা এলাকায় সক্রিয় হয়ে উঠলেন মেজর ওসমান। মুসারেফ তখন মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কুমিল্লা এলাকায়, জিয়া চট্টগ্রামে, শফিউল্লা সিলেটে।

এঁদের এবং অবশিষ্ট ই পি আর ও পুলিশকে ঘিরে আওয়ামি লীগের ছাত্র-যুবকদের নেতৃত্বে দেশপ্রেমিকরা জড়ো হতে লাগলেন। তাঁরাই জন্ম দিলেন নাতিদূর ভবিষ্যতের মুক্তিবাহিনীর বীজ। সেই হল শুরু। তখন ই বি আর সব মিলিয়ে হাজার তিনেক একত্র হয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ই পি আর, পুলিশ মিলিয়ে আর ৭ হাজার এলেন। মোট দাঁড়াল ১০ হাজার।

নাটকের শেষাঙ্কে তাকিয়ে দেখছি—১৬ ডিসেমবর—মুক্তিবাহিনী=৬০,০০০। তার ভেতর সামরিক ট্রেনিং পাওয়া নিয়মিত যোদ্ধা=১৮০০০। গেরিলা যোদ্ধা=৪২০০০ (এর ভেতর বিশেষ ধরনের ট্রেনিং পাওয়া মুজিববাহিনী=৫৫০০)। অবশ্য নৌবাহিনীর কমানডোদের সর্বদাই মুক্তিবাহিনী থেকে আলাদা করে রাখা হয়।

AMARBOI.COM

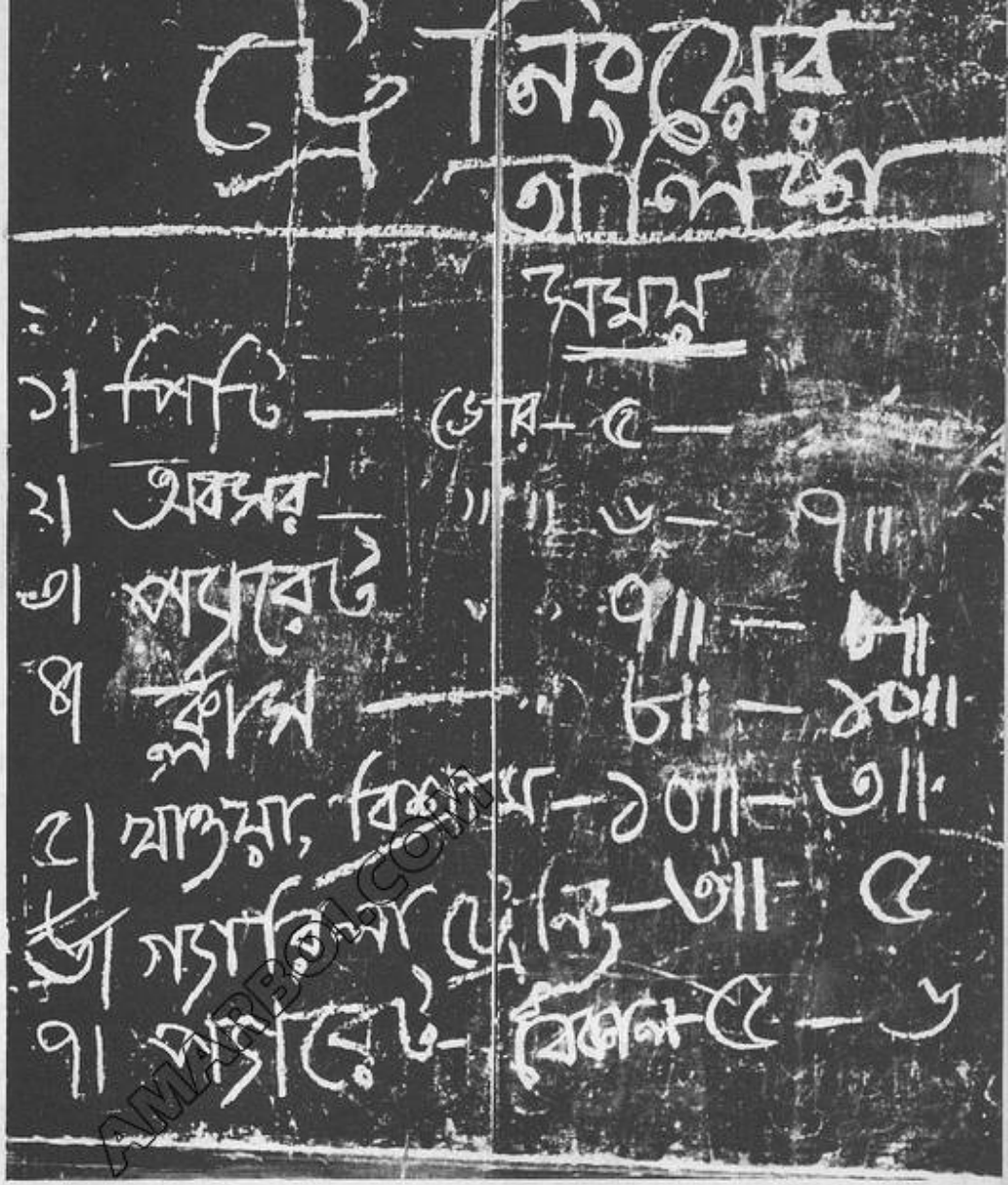

দখলদার বাহিনী কখনও তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। সিদ্দিকী প্রবল পাকিস্তানী আক্রমণের মুখেও তার এলাকা থেকে সরে যাননি। তিনি জনসাধারণের মধ্যে মিশে রয়েছেন, পাল্টা আক্রমণের সুষ্ঠু পরিকল্পনা তৈরী করেছেন এবং তা কাজে পরিণত করে শত্রুর কাছ থেকে ভারী অস্ত্র ও গুলী বারুদ ছিনিয়ে নিয়েছেন। কাদের বাহিনীতে ছিল সকল বয়সের, সকল গ্রুপের এবং সকল শ্রেণীর লোকেরা। ডিসেম্বরে তার এই বাহিনীর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৮০০০-এ। এরা গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণ করে। কাদের বাহিনীর যুদ্ধ পরিচালনার বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা কখনও অস্ত্র সাহায্য পাওয়ার আশায় বসে থাকেননি। দখলদার বাহিনীর উপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ চালিয়ে তাদের পর্যুদস্ত করেছেন এবং অস্ত্র ছিনিয়ে এনে মুক্তিযুদ্ধে তা ব্যবহার করেছেন। কাদের সিদ্দিকী ছাত্র-জীবনে দু'বছর ছিলেন ক্যাডেট ট্রেনিং কলেজে। কিন্তু সামরিক জীবন পছন্দ না হওয়ায় ক্যাডেট কলেজ তিনি ছেড়ে দেন। ১৯৭১ সালের মারচ মাসে তাকেই গেরিলা মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে ময়মনসিং-টাঙ্গাইল এলাকার নেতৃত্ব দিতে হয়। ডিসেমবর মাসে সম্মিলিত মিত্র সেনাদের বিজয়ী অগ্রবাহিনী ময়মনসিং-টাঙ্গাইলের মুক্ত এলাকা দিয়েই প্রথম ঢাকা পৌঁছোয়।

AMARBOI.COM

এপরিলে—মুক্তিবাহিনী অসংবদ্ধ অগোছালো দেশপ্রেমিকের দল। তাঁরা শুধু জেদের বশে নিপুণ নিষ্ঠুর পাক আরমিকে কোথাও কোথাও একেবারে মুখোমুখি আক্রমণ করতে লাগল। অথচ পিনডির সোলজারদের তুলনায় এদের হাতে অস্ত্র বলতে কি-ই বা ছিল। কিন্তু তাতেই বেতনভুক সুশৃংখল সৈন্যরা শহরে শহরে আটকে থাকল—বাইরে আর বেরোতে পারল না।

মুজিব গ্রেফতার। সর্বত্র সংঘশক্তি প্রায় তছনচ। এই শূন্য অবস্থাকে ভরাট করে তোলার জন্যে মেজর জিয়া রবিবার ২৮ মার্চ চট্টগ্রাম রেডিও থেকে অস্থায়ী সরকার ঘোষণা করলেন। তার প্রধান তিনি নিজেই। মনোবল বজায় রাখতে সব জেনেও বললেন, মুজিবের নির্দেশেই এই সরকার—তিনি যেমন বলছেন তেমন কাজ হচ্ছে।

এপরিলের ১২ তারিখ মুজিবনগরে অস্থায়ী সরকার গঠিত হল। তার দু'দিন পরে করনেল ওসমানিকে সি-ইন-সি করে যুক্ত কমান্ড গড়ে তোলা হল। কে কোন্ এলাকার কমান্ডার —তাও স্থির করে দেওয়া হল। তখনই এই বাহিনীর নাম হল 'মুক্তিফৌজ'।
প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আমেদ এলাকাওয়ারি ঘোষণা করলেনঃ
শ্রীহট্ট-কুমিল্লা এলাকায় কমান্ডার মেজর মুসারেফ, চট্টগ্রাম-নোয়াখালির কমান্ডার মেজর জিয়া, ময়মনসিং-টাঙ্গাইলের কমান্ডার মেজর শফিউল্লা, খুলনা-যশোরের কমান্ডার মেজর ওসমান।
এপরিলের মাঝামাঝি এই মুক্তিফৌজ ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়ল। কিন্তু তখনই গেরিলা যুদ্ধের আদর্শ জমি তৈরি হয়ে উঠেছে।

নতুন জাতি জন্ম নিল

শনিবার। ১৭ এপরিল। ১৯৭১

সকালবেলা কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলা গাঁয়ের নাম বদলে গেল। নাম হল মুজিবনগর। বিরাট বিশাল বিস্তৃত আম্রকানন। সেই আম্রবনে নতুন রাষ্ট্র—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জন্ম নিল। সাড়ে সাতকোটি বাঙালীর স্বাধীন সার্বভৌম দেশ।

সেই আম্রবনে নতুন রাষ্ট্রের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঘোষণা করলেনঃ পলাশীর আম্র কাননের যুদ্ধে ১৭৫৭ সালে বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা হারিয়েছিল। আজ সেই প্রাচীন জায়গার আরেক আম্রকাননের নীচে ১৯৭১ সালে সেই স্বাধীনতা ফিরে এল, জন্ম নিল স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র।

পুরোপুরি বাঙালী অনুষ্ঠান। সশস্ত্র বাহিনীর অভিবাদন নিয়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বাংলায় জবাব দিলেন। নতুন রাষ্ট্রের ঘোষণাপত্রও বাংলায়।

অনুপস্থিত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান। তাঁর হয়ে সৈয়দ নজরুল ইসলাম মন্ত্রীদের নাম বললেন। প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করলেন করনেল উসমানিকে। বিশ্ববাসীর কাছে চাইলেন কূটনৈতিক স্বীকৃতি, সামরিক সাহায্য।

শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত শেখ মুজিবর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান। উপরাষ্ট্রপ্রধান অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে কাজ করে যাবেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম বললেন, আমি তাজুদ্দিন আমেদকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেছি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে খোন্দকার মোসতাক আমেদ সাহেবকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেছি। মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ করে মুক্তিবাহিনীর প্রধান হিসাবে করনেল উসমানিকে প্রধান সেনাপতি এবং করনেল আবদুর রবকে চিফ অব স্টাফ পদে নিয়োগ করেছি। তিনি বললেন, হাটে বাজারে, নদীনালায় আমার সৈনিকরা লড়েছেন, লড়ছেন, লড়বেন। আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সনের ২৬ মাচ থেকে কার্যকর।

প্রধান সেনাপতি করনেল উসমানিকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সমাবেশের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিতেই জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ল। প্রধান সেনাপতি বললেন, 'দরকার হলে আমরা বিশ বছর ধরে লড়াই করব। হতে পারে এযুগের ছেলেরা লড়াই করে শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু পরের যুগের ছেলেরা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে। বাংলাদেশ যদি রক্ষা না পায় তাহলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সমস্ত মানবিকতাবোধ নষ্ট হয়ে যাবে।'

প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আমেদ বললেন, পাকিস্তান ঘাতক ইয়াহিয়ার হাতে নিহত। মৃতের পাহাড়ে পাকিস্তান এখন গোরস্থান। আমরাই পৃথিবীর অষ্টম বৃহৎ জনবহুল রাষ্ট্র। বাংলাদেশের ৯০ ভাগ আমাদের দখলে। হানাদারদের সম্পূর্ণ বিতাড়িত করার আগে মুক্তিবাহিনী থামবে না। ক্যানটনমেনট ছাড়া গোটা দেশে আমাদের অধিকার বিস্তৃত।

মাত্র কয়েক মাইল দূরে শুক্রবারও পাক বোমারু বিমান বোমাবর্ষণ করেছে। বাতাসে তখনো বারুদের গন্ধ। শত শত মুক্তিফৌজ, হাজার হাজার মুক্তিকামী জনতার মুখে দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের সঙ্কল্প। ১০০ বিঘার আম্রকুঞ্জে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক পরিবেশ। মুক্তঅঙ্গনের মঞ্চে কার্পেট বিছানো। স্বাধীন বাংলার পতাকাদণ্ডের সামনে সশস্ত্র মুক্তিফৌজ। কাছেই যে বিধ্বস্ত রণাঙ্গন তা বোঝার উপায় ছিল না—যেন শান্ত বাংলাদেশেরই কোন নিভৃত স্নিগ্ধ গ্রাম। বহু চাষী এসেছেন, এসেছেন বহু মহিলা।

অনাদিকালের বাংলাদেশের আদুল গায়ে সেইসব পল্লী বালকেরা সভার চারপাশে জড় হয়ে মনের সুখে ফোটোগ্রাফারদের ফেলে দেওয়া ফ্ল্যাশ বালবগুলো কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিল।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বললেন, আজ না জিতি কাল জিতব। কাল না জিতি পরশু জিতবই। দেশের একখণ্ড জমিতেও শত্রু রাখব না। রাখব না। ইনশাহ্ আল্লা—জয় বাংলা।

AMARBOI.COM

মে-জুন-জুলাই তিন মাস ধরে তেরটি শিবিরে গেরিলাদের ঝাড়াই বাছাই করে ট্রেনিং দেওয়া হল গেরিলা আর নিয়মিত সৈন্য একদম ভিন্ন শিবিরে ট্রেনিং পেত। গেরিলাদের পয়লা দলটি ট্রেনিং পেয়ে জুলাইয়ের শেষ নাগাদ বেরিয়ে এল।

মনে রাখতে হবে, ঠিক এই সময় ইয়াহিয়ার রাজাকর বাহিনীরও জন্ম।

মোট ১২ হাজার রাজাকর তৈরি হয়েছিল। সাতদিনের ট্রেনিং দিয়ে নিয়াজি এদের বাজারে ছাড়তো। মাস মাইনে ৭৫ টাকা আর ২০ কেজি চাল। অনুপ্রেরণা—লুটতরাজি।

পাশাপাশি মুক্তিফৌজের আসল বারুদ ছিল—স্বাধীনতা।

করনেল ওসমানি সেসময়কার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, প্রথমদিকে আমরা মুখোমুখি সংঘর্ষের কথাই চিন্তা করেছিলাম। সেইরকমই ছিল আমাদের প্রস্তুতি। আশা ছিল পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলো এই অসম যুদ্ধ থামাবার জন্য সচেষ্ট হবে। বলবে পাকিস্তানকে, হঠে যাও বাংলা মুলুক থেকে। যখন তা হল না, আমরা আমাদের রণকৌশল পাল্টাতে বাধ্য হলাম। মে মাসের মাঝামাঝি আমরা গেরিলা যুদ্ধের পথ বেছে নিলাম। সম্মুখ সমরে না গিয়ে তখন আমরা কমাণ্ডো হয়ে গেলাম। জুনের পয়লা হপ্তায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় সংসদের বিরোধী নেতৃবৃন্দকে বললেন, মুক্তিবাহিনী জয়ী হবেই।

তার আগে কি হঠাৎ কুষ্টিয়ার একটি ঘটনাঃ স্যাবার নেমে এসে ছোঁ মেরে বোমা ফেলছে। ১৮।১৯।২০ বছরের ছেলেরা রাইফেলে তাক করে বিমান লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। বাধা দেওয়ার আর যে কিছু ছিল না সেদিন। এক সময় বুলেট ফুরিয়ে গেল।

মাঠ থেকে পিচ রাস্তা। একটু একটু করে বুকে হেঁটে এগোনো। সামনেই রাজশাহী শহর। বর্ষার ঠিক আগে পেছনে পদ্মার চরে পাখি নেই, মানুষ নেই, নৌকো নেই কোন। শহরের বাসিন্দা দখলদার সোলজার আর তাঁবেদার দালালের দল।

ভাদ্রে ভরা নদী। রংপুরের নীলফামারিতে তিস্তার বুকে ডিঙি নৌকোয় মুক্তিফৌজ। পাক গানবোটের অপেক্ষায়।

AMARBOI.COM

কিন্তু স্যাবারের ঘন ঘন আবির্ভাব বন্ধ হল না।
একটু একটু অনুকূল পবন বইতে শুরু করেছে। দু' মাস হয়ে গেছে—চট্টগ্রাম-কুমিল্লা-শ্রীহট্ট-ঢাকা লাইনে নিয়াজি ট্রেন চালু করতে পারেনি। গেরিলারা যেখানে যে সেতুটি পেয়েছে—উড়িয়ে দিয়েছে। ত্রিপুরা-আসাম-শ্রীহট্ট সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকা তখন গেরিলাদের স্বর্গ।
২১ জুলাই নয়াদিল্লি পরিষ্কার ঘোষণা করল,
প্রয়োজন হলে মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্র সরবরাহ করা হবে।
আগসটে জলপথে একের পর এক সাফল্যের খবর আসছিল। চট্টগ্রাম আর চালনায় নৌ কমান্ডোরা জলের নীচে ডুব দিয়ে জাহাজে মাইন বসিয়ে দিয়ে এল। চারটি বড় বড় বিদেশী জাহাজ টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গেল। এর আগেই সড়কে, রেলে যোগাযোগ ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হয়েছিল। এবার বিদেশী জাহাজ বাংলাদেশে ভিড়তেই অস্বীকার করল। ইয়াহিয়ার সৈনারা তখন শুধু নদীপথে বাংলাদেশের জেলায় জেলায় এগোচ্ছিল। ফলে এই ভাড়াটে হানাদার বাহিনী প্রায় জবুথবু হয়ে পড়ল।
১১০ জন এম এন এ আর ২০০ জন এম পি এ জুলাইয়ের মাঝামাঝি একত্রে বৈঠকে বসে যা স্থির করেছিলেন—২৮ আগসট তা ঘোষিত হল ঃ এবার থেকে মুক্তিফৌজ, মুক্তিযোদ্ধা সব মিলিয়ে নাম হবে 'মুক্তিবাহিনী'। এর ভেতর বিমান, নৌবহরকেও ধরতে হবে।
সেপটেমবরে বাংলাদেশের শহরগুলো দিনে থাকত ইয়াহিয়ার হাতে—রাতে সেখানে শুধু গেরিলাদের ফরমান চালু থাকত। শুধু ঢাকায় ৮০০ গেরিলা ঢোকেন। নিয়াজি ফরমান অ্যান্ড কোমপানি দিনের বেলায় বেধড়ক অত্যাচার করেও গেরিলাদের টিকি খুঁজে পেত না—শুধু নিজেদের শত্রুর সংখ্যাই বাড়িয়ে দিত?
ইয়াহিয়ার সৈন্যরা তখন মরীয়া। তবু অল্পদিনেই মুক্তিবাহিনী রংপুরের তিলকা, চিলামারি, কালিগঞ্জ, সালদানদী, ফেনীর একটা বড় এলাকা কেড়ে নিয়েছে। এছাড়াও অনেক জায়গা

রাজশাহীর চারজন মেডিক্যাল স্টুডেন্ট যশোরের গোরাগঞ্জে হাতাহাতি লড়াই করে সবে ফিরেছেন। গায়ে খান সেনাদের উর্দি—হাতে খান সেনাদের অটোমেটিক। খান সেনাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া প্যাকিং বাক্সের খাবার খেজুর পাতার চ্যাটাইতে বসে ওঁরা ভাগ করে নিচ্ছেন।

AMARBOI.COM

AMARBOI.COM

মহম্মদ ইমরান

২৯ ডিসেম্বর। ১৯৭১। সাংবাদিক রণজিৎ রায় ছিলেন বাংলাদেশের মাদারিপুর শহরে। ওদিন ২০০ মুক্তিসেনার কুচকাওয়াজ হল সেখানে। খাকি পোশাক, হাতে অস্ত্র। কারো কারো হাতে অবশ্য অস্ত্র ছিল না। চার পাশের জনতা তাদের সহর্ষ অভিনন্দন জানালো। কুচকাওয়াজে ২০০জন যোগ দিলেও সারা মহকুমায় মুক্তিফৌজের প্রায় ৬০০ গেরিলা সক্রিয় ছিলেন। মাদারিপুর মুক্ত করেছেন এই গেরিলারাই। তাই সেদিনকার কুচকাওয়াজ মাদারিপুর শহরের বুকে এক বিরাট আনন্দ:

নিতান্ত অল্পবয়সী ছেলেরাও গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। বিপদের মুখেও এরা চমৎকার ভাবে কাজ করেছে। কুচকাওয়াজের সময় সাংবাদিকরা সবাই চা খাচ্ছিলেন। এমন সময় বছর দশেকের একটি ছেলে স্টেনগান হাতে নিয়ে এগিয়ে এল।

বলল, আমার নাম মহম্মদ ইমরান। আমি পাংগাসিয়া স্কুলের ক্লাস ফোরের ছাত্র। পাকিস্তানীরা যখন আসে আমি স্কুলেই ছিলাম। তারপর আমি তিন মাস ধরে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি আমিও একজন গেরিলা। শত্রুর বাংকার লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছুঁড়েছি। আক্রমণ চালিয়ে রুল করে আবার ফিরে গিয়েছি নিজেদের নিরাপদ ঘাঁটিতে। ছেলেটি চমৎকারভাবে গেরিলা, গ্রেনেড্, বাংকার, রুল শব্দগুলো ব্যবহার করছিল।

শত্রুর সুলুক সন্ধান জেনে মুক্তিবাহিনীর রেগুলাররা ফিরলেন: সন্ধ্যার আগেই অপারেশনাল হেডকোয়াটারে খবর পোঁছতে হবে। ইছামতী এখন ওঁদের বন্ধু।

তখন বাহিনীর হাতে। সেসব জায়গায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিজেদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেললেন। মুক্ত জায়গা পাকাপাকি হাতে রাখার জন্যে জোর ব্যবস্থাও নিচ্ছিল মুক্তিবাহিনী।

১১ অকটোবর মুক্তিবাহিনীর জীবনে একটা বড় দিন। সেদিন ওদের অফিসার আর নিয়মিত সৈন্যদের প্রথম দলটি ট্রেনিং শেষ করে বেরিয়ে এলেন।

ঢাকায় তখন দুঃসাহসী গেরিলাদের দাপট। সময় হলেই ওরা বেরিয়ে পড়ে। অকটোবরের পনর তারিখ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভরনর মোনেম খাঁর ভবলীলা সাঙ্গ হল।

সেই পনর তারিখেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আমেদ যুক্ত চিঠিতে ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে জানালেন, বাংলাদেশের অর্ধেক আমাদের দখলে।

ষোলই বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করলেন, পাঁচটি মোটরবোট নিয়ে মুক্তিবাহিনীর নৌশাখা জন্ম নিল। তখন রোজ নতুন ইতিহাস ঘটছে। ১৯ তারিখ বেপরোয়া গেরিলারা হোটেল ইন্টারকনটিনেনটাল কাঁপিয়ে বোমা ফাটালো—নিয়াজিকে জানিয়ে দিল—আমরা আছি, আমরা আছি।

ঢাকার সরকারকে রফতানির সবরকম রাস্তা হারাতে হয়েছে। মুক্তিবাহিনী স্থলপথ, জলপথে সেদিন ইয়াহিয়ার সৈন্যদের আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁবেদার দালালদেরও খুব দ্রুত সাবাড় করা হচ্ছিল।

আকাশে বাতাসে মুক্তিবাহিনীর আসন্ন জয়ের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল।

অকটোবরের শেষদিকে বাংলাদেশের থানাগুলোর সিকিভাগ মুক্তিবাহিনীর হাতে। ভারতের সঙ্গে মোট পৌনে তিনশো সীমান্ত চৌকির ভেতর

৬৪টি চৌকিতে নিয়াজি হাজার চেষ্টা করেও তার সৈন্য পাঠাতে পারল না।

১৯ তারিখ ঢাকায় ফরমান আলি নিজেই বললেন, গেরিলা তৎপরতা অনেক বেড়েছে। ওদের সংখ্যা অন্তত ৫০ হাজার। তার ভেতর ছাত্ররাও আছে।

অকটোবরের শেষদিনে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম একটা সুখবর ঘোষণা করলেন। মুক্তিবাহিনীর বিমানবহর গঠিত হয়েছে। তার প্রধান—গ্রুপ ক্যাপটেন খোন্দকার।

নবেমবরে বিকেলগুলো ছোট। রাতগুলো বড়। ভাড়াটে দখলদার সৈন্যদের প্রতি রাতেই মনে হত—এ রাত বুঝি আর কাবার হবে না। ভোরে উঠে দেখা যেত ফেরিঘাটগুলো নষ্ট করে রেখে গিয়েছে গেরিলারা। শহরের বাইরে সৈন্যরা বেরোতে পারে না। গেরিলারা সর্বত্র। অথচ নিমেষে উধাও। একেবারে ভোজবাজি। অথচ যা করার ঠিক করে যাচ্ছে।

গাঁয়ে গাঁয়ে নিয়াজির আদেশে পিটুনি কর বসলো। বোঝাই যাচ্ছিল, গ্রামাঞ্চল হাতছাড়া হয়ে গেছে। দিনের বেলাতেও পাক সৈন্যরা বিরাট দল বেঁধে বেরোতো—সঙ্গে থাকতো আগুন নেভানোর দমকল। তখনই ওদের হাবেভাবে বোঝা যাচ্ছিল—ওরা অবসন্ন, ক্লান্ত। নিয়তি যে পরাজয়—তা ওরা জানতো।

মুক্তিবাহিনীকে ধরবার জন্যে, দম ফেলার সময় নিতে ইয়াহিয়া তার মামাবাবুদের জোর ধরল। যা হোক করে রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষক বসিয়ে দাও। কিন্তু সে চেষ্টা কাজে এল না।

চারদিক থেকে আটক পাক আরমি তখন ঢাকার চারদিকের কয়েকটি গ্রাম একদম মুছে ফেলল। সেদিন ছিল ৩০ নবেমবর।

পাছে ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে থেকে মুক্তিবাহিনী খাস ঢাকার গলা টিপে ধরে—তাই নজরের সুবিধের জন্যে ৩০০ মানুষ আর কয়েকটা গ্রাম শেষ করে ফেলা হল।

রাস্তায়, রেলপথে ব্রিজ নেই। ফেরিতে সেনা পারাপার দেখলেই গেরিলারা গুলি ছুঁড়ছে। জলপথ তখন কণ্টকপথ। যোগাযোগ—রসদ—যাতায়াতের জন্যে পি আই এ-র বোয়িংগুলোকে ডাকা হল।

গেরিলারা সামনাসামনি লড়াইয়ে না গিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার নীতি নিয়েছিল। তখন ৬০ হাজার যোদ্ধার মুক্তিবাহিনী চূড়ান্ত আঘাত হানতে তৈরি। এই বাহিনীর বীজ—ই বি আর, ই পি আর পাক আরমিকে আগাগোড়া জানত। অন্য যেকোন মুক্তিবাহিনীর পক্ষে শত্রুর চরিত্র জানতেই কয়েক বছর লেগে যায়।

মারকিন সমরবাহিনীর ট্রেনিং পাওয়া সবুজ টুপি মাথায় পাক আরমির একটি বিশেষ দল গোড়াতেই কাজে নামে। এরা মুক্তিযুদ্ধের পালটা ব্যবস্থা নিতেই এসেছিল।

তারাই বিশেষ করে মরীয়া হয়ে ভয়ংকর ভয়ংকর রকমের প্রতিশোধ নিতে লাগল।

ইয়াহিয়া রাতারাতি দু' ডিভিশন সৈন্য তৈরি করল পশ্চিম পাকিস্তানে।

সারা বাংলাদেশ তখন ওদের কাছে শত্রুশিবির।

যেমন যেমন কাজ—তেমন তেমন ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছিল মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের। বেস ক্যামপে

AMARBOI.COM

'সিলেট—৪'

নদীর বাঁকে দেখা দিল শত্রুর সবচেয়ে বড় গানবোট "সিলেট-৪"। তার পেছনে চলেছে তিন তিনটি লঞ্চে পাক সৈন্য। ক্যাপ্টেন জয় চিন্তিত হলেন মুহূর্তের জন্যে। সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হল না। ফাইট একটা দিতেই হবে। নদীর বুকে এগিয়ে আসছে শত্রুসৈন্য। পাড়ে দাঁড়িয়ে মুক্তিবাহিনী। ভোর তখন ছ'টা বাজে। ক্যাপ্টেন জয় পজিসন নেবার নির্দেশ দিলেন। 'সিলেট-৪' তখন রেঞ্জের মধ্যে এসে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে এল, এম, জি থেকে ছুটলো গুলি। 'সিলেট-৪'-এর ওয়ারলেস যন্ত্রপাতি ধ্বংস হয়ে গেল। নিহত হল সামনের গানার। কিন্তু পেছনের গানার তখনও খাড়া রয়েছে। ছুটলো গুলি সেদিকে। পেছনের গানারও নিহত হল। সামনের ও পেছনের দুজন গানার হারিয়ে অন্য কোন গানারের পক্ষে মাথা ঠিক রেখে কাজ করা মুশকিল। বিধ্বস্ত 'সিলেট-৪'-কে এবার পর্দায় ঢেকে দিয়ে পেছন দিকে নিয়ে যাওয়া হল। সকাল ছটা থেকে বেলা ১টা অবধি বিরামহীন গুলি চালিয়েছে পাকসেনারা। প্রত্যেকটি গানবোট আর লঞ্চে বসনো ছিল রিকয়েললেস রাইফেল। এ-জাতীয় রাইফেল গোলন্দাজ বাহিনীর প্রথম অস্ত্র। রেঞ্জ কমপক্ষে পাঁচ হাজার গজ। কিন্তু সাত হাজার গজ পর্যন্ত আঘাত হানতে পারে। পাকসেনাবাহিনীর গুলি গোলায় নদীপাড়ের গাছপালার ডালপালা ভেঙে পড়ছিল। কানে তালা ধরে গেল। মুক্তিবাহিনীর সম্বল কিছু রাইফেল, দুটি এল. এম. জি— তাও আবার একসময় ফুরিয়ে এল গোলাগুলি। তবু চলছিল। কিন্তু আবার নদীর বাঁকে দেখা দিয়েছে নতুন গানবোট। তাছাড়া হঠাৎ পেছন থেকে গুলির শব্দে সবাই চমকে উঠলেন। দূরে দেখা যাচ্ছে পাকসৈন্যরা স্থলপথে, নদীপথে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে। বেলা একটায় মুক্তিবাহিনী ফিরে এলো। সাতজন পাকসৈন্য নিহত। ১৩ সেপ্টেম্বর রণস্থল, খুলনার হরিনগর।

ক'দিনের ট্রেনিং দিয়ে সেখান থেকে বাছাই করে বিশেষ বিশেষ ট্রেনিংয়ে ছেলেদের পাঠানো হত। বয়স সবার আঠারো থেকে তিরিশের ভেতর। সবাই প্রায় শিক্ষিত। ফলে ট্রেনিং সহজেই দেওয়া যেত। সুশিক্ষিত ছেলেদের নিয়ে তৈরি মুক্তিবাহিনীর মত এত শিক্ষিত বাহিনী পৃথিবীতে আর আছে কিনা সন্দেহ।

২৪ নবেমবর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করলেন, মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা বাংলাদেশের বিরাট এলাকা মুক্ত করেছে। পাকবাহিনীতে বহু হতাহত হয়েছে।

আত্মসমর্পণের পর অরোরাকে নিয়াজি বলেছিল, আপনাদের আরমিকে মুক্তিবাহিনী জোর মদত দিয়েছে।

নবেমবরের শেষে ইয়াহিয়ার ত্রাহি মধুসূদন বলে ডাক ছাড়ার অবস্থা। শ্রীহট্ট শহর অবরুদ্ধ। যশোরের দরজায় মুক্তিবাহিনীর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে।

AMARBOI.COM

কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, ময়মনসিং—তথৈবচ। নেভির ব্যাং রাজকুমাররা চালনা, চট্টগ্রামে ডুব দিয়ে দিয়ে জাহাজ ওড়াচ্ছে। আর পাক আরমি কিছু না করতে পেরে ভারত সীমান্তে আঠার মত লটকে আছে।

অথচ তখন বাংলাদেশের ভেতরে শুধু মুক্তিবাহিনীর পাঞ্জাই স্বীকৃত।

তারপর পূর্ব, পশ্চিম—দুই রণাঙ্গনে ভারতীয় জওয়ানরা এগোচ্ছেন।

পূর্ব খণ্ডে সঙ্গে 'সহযোগী বাহিনী'—মুক্তিবাহিনী। সেই মতই তাজুদ্দিন আমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর বোঝাপড়া হয়। দশ তারিখ রণাঙ্গনে অবিরাম জয়ের ভেতর দিল্লির ঘোষণা :

পূর্বখণ্ডে দুই বাহিনী মিলে মিত্রবাহিনী—সেনাপতি লেফটেনানট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। তখন মিত্রবাহিনী জগৎ জয় করেও ফেলতে পারত।

AMARBOI.COM

মেহেরপুর মুক্ত করে কুষ্টিয়ায় চলেছেন ই পি আর। কুষ্টিয়ার মুক্তির জন্য মার্চ। মাস তখন এপরিল, ১৯৭১। বাতাস শুকনো। সম্বল রাইফেল। ভাগ্যের গর্ভে সবই অনিশ্চিত। স্থির শুধু স্বাধীনতা।

AMARBOI.COM

দেশে দেশে দূতিয়ালি

১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ। শনিবার। লোকসভা বিতর্কে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী প্রথম বলেন, আমরা পূর্ববঙ্গের অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন। ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের জন্য শেখ মুজিবর রহমানের ভূমিকাকে আমরা প্রশংসা করি।

ওই দিনই সংসদে ভারতের বহির্বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং বলেন, পূর্ববঙ্গের দিকেই আমাদের সহানুভূতি। ৩১ মার্চ সংসদে সর্বসম্মত প্রস্তাব নিয়ে বলা হল, ভারতের সমগ্র জনসাধারণ পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন জানাচ্ছে।

পরে কিছু সময়ে সংসদে প্রধানমন্ত্রী যা বলেন, তার মর্মার্থঃ আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম ব্যবস্থাই আমরা নেব। পিনডিকে তিনি স্পষ্টই বললেন, বাংলাদেশে রাজনৈতিক সমাধান করতেই হবে। বিশ্বকে ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বসে থাকলে চলবে না—তাকে এগিয়ে এসে হস্তক্ষেপ করতে হবে।

এপরিল—ক্রুয়েল এপরিল! স্বাধীনতা যোদ্ধাদের পাকবাহিনী কামানে, বিমানে, ট্যাংকে সাবাড় করছে তখন। তার ভেতর পিকিং থেকে পিনডিকে সমর্থন জানানো হল।

সেদিন ছিল ৯ তারিখ। ২০ এপরিল আরও খারাপ খবর এল, মাও পিনডিকে অস্ত্র সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। তখন ভারতের দিকে শরণার্থীদের ঢল নেমেছে।

মে মাসেই কূটনীতির পথে ভারত তৎপর হয়ে উঠল। তারই চেষ্টায় বুডাপেসটে বিশ্ব শান্তি পরিষদের বৈঠকে, তারপর হেলসিংকিতে সোসালিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সম্মেলনে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজনীয়তা ও শরণার্থীদের দেশে ফেরার উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করার উপর জোর দেওয়া হল।

শ্রীমতী গান্ধী সংসদে, জনসভায়, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এবং রাষ্ট্র নায়কদের সঙ্গে নিভৃত আলোচনায় এই কথাটিই বারবার বোঝাতে চাইলেন—সামরিক নয়, রাজনৈতিক সমাধান শরণার্থীদের দেশে ফেরার মত নিরাপদ অবস্থা সৃষ্টি করবে। নির্বাচিত আওয়ামি লীগের জনপ্রতিনিধিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানই ভারতের কাছে গ্রহণযোগ্য। শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দিতে হবে। পিনডিকে ভারত নয়—শেখ মুজিব ও বাংলাদেশের সঙ্গেই কথা বলতে হবে।

৮ মে ভারত সরকার বিশ্বের রাজধানীতে রাজধানীতে সংসদ সদস্যদের একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। এই প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ভারতের বক্তব্য

নিত্যদিন ক্যু

গণহত্যার শুরু থেকে যুদ্ধ—প্রায় ন' মাসে দেশে দেশে পূর্বতন অটুট পাকিস্তানের দূতাবাসগুলোতেও নিত্য ক্যু হয়েছে। বিবেকের নির্দেশে। শুরু হয়েছিল এপ্রিলের গোড়ায়—দিল্লিতে পাক হাইকমিশনের দু'জন কর্মী ভারতের রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলেন। তারপর থেকে বল গড়িয়ে চলল।

এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে মুজিবনগরে বাংলা নামে দেশের আনুষ্ঠানিক জন্মগ্রহণের পরদিনই কলকাতার ডেপুটি পাক হাইকমিশন নিজেকে ভারতে বাংলাদেশের দূতাবাস বলে ঘোষণা করল। তারপর ক্যানবেরা, দামাসকাস, কাঠমাণ্ডু, ম্যানিলা সর্বত্র এক কাহিনী।

দুঃখের দিনগুলো প্রায় যখন ফুরিয়ে এসেছে—তখন দিল্লির পাক হাইকমিশন থেকে বাঙালীরা সপরিবারে নীচু দেওয়াল টপকে কষাইখানার বাইরে বেরিয়ে আসছিলেন। পারলেন না হুসেন আলী। সস্ত্রীক, তিন কন্যা সমেত আহত হুসেন আলি বন্দী হলেন। কারণ, তিনি পাক গোয়েন্দাচক্রের পাণ্ডা আবদুল গণির ব্যক্তিগত সহকারী। অতএব হুসেন আলিকে বেরোতে দিলে যে সব কারিকুরি ফাঁস হয়ে যায়। অবশ্য তার দুই ছেলে—৮ বছরের মুরাদ, ৬ বছরের মুরশেদ বেরিয়ে এসেছিল। দিল্লির স্কুলের ছেলেরা ওদের সঙ্গে ওদের বাবা, মা, দিদিদের মুক্তির জন্যে হাইকমিশনের গেটে ধর্না দিল। তার একমাস পরেই ইয়াহিয়ার বিমান বোমা ফেলে ভারতের ঘাড়ে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল।

তার অনেক আগে—

মঙ্গলবার । ৬ এপ্রিল । ১৯৭১

কে এম সাহাবুদ্দিন, আমজাদুল হক ভারত সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে পেলেন। পূর্ববঙ্গের মানুষ এই দু'জন বিবেকের নির্দেশে দিল্লির পাক হাইকমিশনের কাজে ইস্তফা দিয়ে বাংলাদেশের কাছে আনুগত্য জানালেন। তার সপ্তাহ খানেক আগে ওদের বদলির আদেশ দেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এই ধরনের ঘটনা এই প্রথম ঘটল।

সাহাবুদ্দিন, আমজাদুল হক নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই শেখ মুজিবর রহমানের অনুরক্ত। গভীর দেশপ্রেমিক এই দু'জন মানুষ ষোলআনা বাঙালী। বিবেকের নির্দেশে ওঁরা যখন বাংলাদেশের কাছে আনুগত্য জানালো—তখন ওঁদের বাবা মা ঢাকায়।

পাকিস্তানে বেতারে অবশ্য বলা হল, ওই দু'জন পাক কূটনীতিক নিখোঁজ হয়েছেন।

মুজিবনগরে নতুন রাষ্ট্র নতুন জাতির জন্মের পরদিন রবিবার বেলা বারোটায় কলকাতার ন' নম্বর সারকাস অ্যাভুনিউয়ে ইতিহাস সৃষ্টি হল। কলকাতায় পাক হাইকমিশনের ভবন শীর্ষে দেখা গেল নতুন নিশান।

এই প্রথম একটি পাক দূতাবাস ইসলামাবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে

হোসেন আলি

বুঝিয়ে বলবেন। শরণার্থীদের চাপ বাড়ছেই। লক্ষ লক্ষ শরণার্থী। মে মাসের মাঝামাঝি ভারত দুনিয়ার দরবারে সাহায্যের আবেদন জানালো। পরদিন পিনডিকে কড়া নোট পাঠিয়ে নয়াদিল্লি পরিষ্কার গলায় বলল, শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরার উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করতেই হবে। শ্রীমতী গান্ধী মুক্তিকামীদের উদ্দেশ্যে বললেন, বাংলাদেশ জয়ী হবেই। জুন মাসে বর্ডারের ভেতর পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয় শরণার্থীতে থৈ থৈ অবস্থা। তার ভেতর মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভারত বিশ্বের বড় বড় রাজধানীকে ভারতের বক্তব্য জানাতে দূত পাঠিয়েছে। এ মাসের অন্যতম দূতঃ বহির্বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং। তিনি মসকো, বন্, প্যারিস, ওয়াশিংটন, লনডনে গেলেন। পদগর্নি, ব্রানট্, হিউম, হিথ্—সবাই বললেন, রাজনৈতিক সমাধান চাই। শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরার উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রক এক বিবৃতিতে রাজনৈতিক সমাধানের কথাই বললেন। কিন্তু রজারস্ ও নিকসনকে সব বলেও স্বর্ণ সিং তাঁদের টলাতে পারলেন না। তবে তাঁরা মুখে বললেন, অস্ত্র সাহায্য তো পাঠাচ্ছি না। নতুন করে পিনডিকে আর অস্ত্র পাঠানো হবে না। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিউম ঘোষণা করলেন, অবস্থা স্বাভাবিক না হলে পাকিস্তানকে সাহায্য দেব না।

অধিকাংশ বৃহৎ শক্তি বিশ্বের এই ভূখণ্ডে শক্তিসাম্য অপরিবর্তিতই রাখতে চাইছিল। ওয়াশিংটনের চোখে গণহত্যা পাকিস্তানের 'ঘরোয়া ব্যাপার।' মারকিন মহল আসল সমস্যায় না গিয়ে শরণার্থী ত্রাণে নানান প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে আসছিল। ওদের চোখে—বাংলাদেশ যেন উহ্য, পুরো ব্যাপারটাকেই তারা ভারত-পাকিস্তান বিরোধের চেহারা দিতে চেষ্টা করছিল। এই উট পাখিরা যাতে চোখ মেলে বাস্তব অবস্থার দিকে তাকায়—সেজন্যে ভারত অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। সর্দার স্বর্ণ সিং বিদেশ সফর সেরে সংসদে দাঁড়িয়ে জানালেন, আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্র দেবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তার ক'দিনের মধ্যেই নিউ ইয়রক টাইমস আমেরিকার ধাপ্পাবাজি ফাঁস করে দিল। ভাগ্যের পরিহাস! 'সুন্দরবন' আর 'পদ্মা' নামের দু'খানি জাহাজ বাজার থেকে সস্তা দরে অস্ত্র নিয়ে পাকিস্তানে পাড়ি দিয়েছে। আরও জাহাজ বোঝাই হচ্ছে। শেষ অবধি পেণ্টাগণ পাকিস্তানকে অস্ত্র যোগানোর কথা

www.amarboi.com

সরকারীভাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাদের পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করল। জানিয়ে দিল, এটা আর পাকিস্তানী দূতাবাস নয়। প্রাক্তন ডেপুটি পাক হাইকমিশনার হোসেন আলি বললেন, এই হল বাংলাদেশ সরকারের দূতাবাস—এই হল আমাদের একমাত্র পরিচয়—আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় অন্য কোন পরিচয় আমাদের রইল না।

রবিবারই বাংলাদেশ মিশন অফিসে কেন্দ্রীয় হলঘর থেকে জিন্নার ছবি সরিয়ে ফেলা হল। সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদ ইকবালের ছবিও। সেখানে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানের ছবি—কবি নজরুল ইসলামের ছবি টাঙানো হল। বাড়ির গেটে পাক হাইকমিশনের নাম-ফলক সরিয়ে দিয়ে সেখানে লেখা হলঃ বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশন।

বেগম আলির চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। বললেন, গত কয়েকদিন ধরে এই বাড়ির বাগানে ঘুরেছি। একা একা কেঁদেছি। স্বামীকে বলেছি ইসলামাবাদে মরতে যাব না। যদি মরতে হয় বাংলাদেশে লড়াই করে মরব।

শনিবারও যিনি ছিলেন পাক ডেপুটি হাইকমিশনার—রবিবার সেই এম হোসেন আলি পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের পতাকা তুললেন। সেদিন ছিল ১৮ এপরিল, ১৯৭১।

রবিবার ভোরে দমকা হাওয়া দিয়ে ঝড় উঠেছিল। তাতে এতদিনকার পাক পতাকাটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। দূতাবাসের একজন কর্মী আরেকটি পতাকা ওড়াতে যাচ্ছিলেন। হোসেন আলি তাঁকে বারণ করে তাঁর হাতে বাংলাদেশের একটি পতাকা তুলে দেন। তারপর তিনি নিজে দড়ি টেনে সেই পতাকা উড়িয়ে দিলেন।

কে এম সাহাবুদ্দিন

AMARBOI.COM

কবুল করল। সংসদ সদস্যরা মারকিন দূতাবাসের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ জানালেন। ভারত তার উদ্বেগ প্রকাশ করে পরিষ্কার বলল, পাকিস্তানগামী অস্ত্রবাহী জাহাজ থামান। আমেরিকা কর্ণপাত করল না। ভারত-মারকিন সম্পর্কে চিড় ধরল। আমেরিকা বলতে চায়, অস্ত্র, অর্থ পাঠানো বন্ধ করে আমরা পাকিস্তানকে নৈরাশ্যের দর্শনের দিকে ঠেলে দিতে চাই না। বরং অস্ত্র, অর্থ যুগিয়ে পাকিস্তানকে বশে রাখার কলকাঠি আমাদের হাতে রাখতে পারব।

জুনের মাঝামাঝি ভারত সরকার আরব দেশগুলিতে একই উদ্দেশ্যে আরও দুটি প্রতিনিধিদল পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। অসট্রেলিয়ার নেতৃবৃন্দকে ভারতের বক্তব্য বুঝিয়ে বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় একই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮ জুন ব্যাংককে পৌঁছলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফকরুদ্দিন আলি আমেদ এবং শাহনাওয়াজ খান আরবের দেশে দেশে পাড়ি দিলেন। আমেরিকা তখনো জাহাজ বোঝাই দিয়ে পাকিস্তানকে অস্ত্র পাঠাচ্ছে। অস্ত্র সাহায্য বন্ধ করতে ভারত সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালো। কিন্তু ওয়াশিংটনের উট পাখিরা তাতে কান দিল না। ২৫ জুন স্বর্ণ সিং বললেন, ভারত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী মারকিন রাষ্ট্রদূতকে ডেকে নিয়ে জানালেন, পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক। অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করুন। একথা নয়াদিল্লিতে তিনি প্রেসিডেন্ট নিকসনের উপদেষ্টা হেনরি কিসিংগারকেও বললেন।

এতদিনে বিদেশে কূটনৈতিক তৎপরতার ফল ফলতে শুরু করেছে। জুলাই মাসেই ফ্রানস ও পশ্চিম জারমানি পাকিস্তানকে সবরকম সাহায্য পাঠানো বন্ধ করল। আমেরিকা অস্ত্র পাঠানো বন্ধ না করে ততদিনে মাতব্বরির রাস্তা ধরেছে। জুলাইয়ের শেষদিকে ভারত পরিষ্কার বললঃ পশ্চিমবঙ্গের দিকে সীমান্তে রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষক বসানোর জন্য মারকিন প্রচেষ্টাকে অমিত্রোচিত কাজ বলে গণ্য করা হবে।

ইয়াহিয়া শেখ মুজিবর রহমানকে ফাঁসি দেওয়ার কথাবার্তা বলতে শুরু করেছেন। আগসটের গোড়ার দিকে ভারতীয় সংসদের ৫০০জনের মত সদস্য মুজিবের প্রাণরক্ষার জন্য উ থানটের কাছে একত্রে আবেদন জানালেন। ১১ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বিশ্বের

হোসেন আলি নবগঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য জানিয়ে বললেন, তাঁর অফিস ভারতে বাংলাদেশের দূতাবাস। তিনি শীগগিরি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের পরামর্শ চাইবেন। 'আমরা আমাদের সারভিস বাংলাদেশ সরকারের হাতে সমর্পণ করছি। কয়েকদিন আগে থেকেই বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকারের কথা বিবেচনা করছিলাম।' আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হতেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

হোসেন আলি বললেন, আমরা কেউই ভারত সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইনি। সে প্রশ্নই ওঠে না। কলকাতায় আমরাই বাংলাদেশের প্রতিনিধি। এখন ভারত সরকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। হোসেন আলি বললেন, আমি বাংলাদেশে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব—পরামর্শ চাইব। আমি প্রায় বাইশ বছর ধরে পাকিস্তানের কূটনৈতিক সারভিসে আছি। আমি আমার জ্ঞান ও সাধ্যমত পূর্ণ আনুগত্য সহকারে পাকিস্তানের সেবা করেছি।

হোসেন আলি ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান ফরেন সারভিসে যোগ দেন। জন্ম পাবনার মধ্যবিত্ত পরিবারে শিক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

আমজাদুল হক

কলকাতার আগে তিনি সৌদি আরব, লনডন, হল্যানড্, ব্রহ্ম ও অসট্রেলিয়ায় নানা পদে কাজ করেছেন।

তারপর এল সেই মঙ্গলবার । ২ নবেমবর । ১৯৭১ । দিল্লির পাক হাইকমিশন ভবনের সামনে সকালে নাটকীয় কাণ্ড ঘটে গেল। অবশিষ্ট মোট এগারোজন বাঙালী কর্মীর মধ্যে দশজন প্রায় সপরিবারে বাইরে পালিয়ে এলেন। নাটকের একটি করুণ দিকও ছিল। ভারতে পাক গোয়েন্দাচক্রের পাণ্ডা আবদুল গণির ব্যক্তিগত সহকারী হুসেন আলি আসতে পারেননি। তাঁকে প্রচণ্ড মারধোর করে প্রকৃতপক্ষে বন্দী করে রাখা হয়েছে। সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী আর তিন মেয়ে। তাঁর দুই ছেলে অবশ্য পালিয়ে আসতে পেরেছে। খবর পেয়েই বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী তাঁর দু'জন সহকর্মী কে এম সাহাবুদ্দিন, আমজাদুল হককে সঙ্গে নিয়ে পাক হাইকমিশনের গেটে ছুটে যান। পাকিস্তানীরা তখন ভেতর থেকে দমাদম ইট পাটকেল ছুঁড়ছিল।

যাঁরা বাইরে বেরিয়ে এলেন—বেরিয়েই প্রথম কথা বললেনঃ জয় বাংলা। পাকিস্তানীরা বাঙালীদের দেখে দৌড়ে এসে মারধোর করতে শুরু করে। বাঙালীরা তার ভেতরেই পরিবারবর্গকে নীচু পাঁচিলের ওপার থেকে ছুঁড়ে দিতে থাকেন—নিজেরাও পাঁচিল টপকাতে থাকেন।

আহত, অজ্ঞান হুসেন আলিকে চিকিৎসার জন্য ইসলামাবাদ থেকে শেষ পর্যন্ত ডাক্তার আনতে হল। পাক হাইকমিশন ভারতীয় ডাক্তার আনতে সাহস পাচ্ছিল না। পাছে—সব গোপন খবর ফাঁস হয়ে যায়।

AMARBOI.COM

নেতৃবৃন্দকে মুজিবের প্রাণরক্ষার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন। কিছু কাজ হলঃ উ থানট্ বললেন, মুজিবকে ফাঁসি দিলে পাকিস্তানের বাইরেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। ইয়াহিয়া দুনিয়ার মাতব্বরদের জানাতে বাধ্য হলেন, মুজিব জীবিত। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক কারেদখানায় আটক আছেন।

আগসটের শেষদিকে বাংলাদেশের কথা বলতে চারজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দক্ষিণ আমেরিকা ও আফরিকার দেশে দেশে পাড়ি দিলেন।

ততদিনে চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। প্রতিবেশী নেপাল ভারতের বক্তব্যকেই সমর্থন করল। ৭ অকটোবর মসকো বলল—'পূর্ববঙ্গ।' নবেমবরের গোড়ায় মসকো পরিষ্কার গলায় বলল, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। মসকোর এই দ্বিধামুক্তির পিছনে ভারতের ভূমিকা অনেকখানি। ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরপেক্ষ দেশগুলিকে জানালো, বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আপনারা একটা ঐকমত্যে পৌঁছে আপনাদের বক্তব্য জানান। যতটা আশা করা গিয়েছিল, তা হল না। মরক্কো রাজনৈতিক সমাধানের প্রসঙ্গ তুলতেই দিল না। তখন নিরপেক্ষ ব্লক কোনক্রমে একটা আপস প্রস্তাব খাড়া করলেন। ততদিনে উ থানটও রাজনৈতিক সমাধানের দিকেই ঝুঁকেছেন। প্রধানমন্ত্রী ঝটিতি সফরে সেপটেমবরের শেষ সপ্তাহে মসকো গেলেন। তিনি ক্রেমলিনে নেতৃবৃন্দকে বোঝালেন, শরণার্থীদের দেশে ফিরে যাওয়ার মত অবস্থা সৃষ্টি করা কতখানি জরুরী।

বাংলাদেশ সমস্যাকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা বিরোধীয় বিষয় হিসাবে তুলে ধরার ষড়যন্ত্র অনেকদিনই চলছিল। ভারত এই বিষয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনরকম দ্বিপাক্ষিক আলোচনার প্রস্তাব অকটোবরের গোড়াতেই অগ্রাহ্য করে দিল। সেই সপ্তাহেই প্রাভদা সরাসরি দাবি জানালোঃ মুজিবকে মুক্তি দাও। বিশ্ব শান্তি পরিষদ বললেন, বাংলাদেশের সংগ্রাম—জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম।

২৪ অকটোবর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তিন সপ্তাহের জন্য পশ্চিমের ছয়টি দেশে সফরে বেরোলেন। মূল কথাঃ আমাদেরও ধৈর্যের সীমা আছে। বেলজিয়ম, অস্ট্রিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জারমানি—সর্বত্র শ্রীমতী গান্ধী তাঁর বহুঘোষিত নীতি বারবার ঘোষণা করলেন।

AMARBOI.COM

লনডনে একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বললেন, পিনডির সঙ্গে যদি যুদ্ধ বাধে তাতে আমাদের কোন বাইরের একস্ট্রা প্লেয়ার দরকার হবে না। আমরা নিজেরাই লড়ব। অক্সফোর্ডে তিনি ডক্টরেট উপাধি নিচ্ছিলেন। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন, তরুণ ছাত্ররা তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছে। তাদের হাতের প্ল্যাকার্ডে লেখাঃ 'থ্যাংক্ ইউ ইন্ডিয়া ফর ডুইং ওয়েলডান্ জব।' কিছু ইংরেজ সাংবাদিক বলেছিলেন, আপনি ইয়াহিয়ার সঙ্গে কথা বলুন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন, বিজিত ইউরোপের পান্ডা হিটলারের সঙ্গে চার্চিলের ব্রিটেন কি বৈঠকে বসেছিল? ইহুদি নিধনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ব্রিটেন কি দীর্ঘদিনের যুদ্ধ মাথায় তুলে নেয়নি?'

ওয়াশিংটনে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকে বসার আগে প্রেসিডেন্ট নিকসন বললেন, আপনিও এসেছেন—ক'দিনের কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদও উঠেছে। অর্থাৎ কিছু চানাচুর এবং চা—তার সঙ্গে নির্দায় সহানুভূতিও খানিক খানিক। কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। বোঝাই যাচ্ছিল, রাষ্ট্রনেতাদের ভাবগতিকে শ্রীমতী গান্ধী হাফিয়ে উঠেছেন। তিনি সারা আমেরিকার কাছে তাঁর বক্তব্য বলতে চাইছিলেন। সে সুযোগ এল। ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে শ্রীমতী গান্ধী সারা প্রশাসনকে টপকে একেবারে সরাসরি বিপুল আমেরিকার মুখোমুখি দাঁড়ালেন—ভারতের বক্তব্য খোলাখুলি বললেন। তখন তিনি আমেরিকার মায়েদের সহানুভূতি, সমর্থন মেশানো চিঠি পেতে শুরু করেছেন—স্কুলের বাচ্চারাও চাঁদা তুলে তাঁকে পাঠাতে আরম্ভ করেছে। বোঝাই যাচ্ছিল, আমেরিকার সাধারণ মানুষ থেকে প্রশাসন কত যোজন যোজন দূরে।

প্যারিসে তিনি বললেন, ফ্রানস্ আমাদের কাছে শুধু একটি দেশ নয়—আরও কিছু—একটি আদর্শ। ফরাসী প্রেসিডেন্ট বললেন, রাজনৈতিক সমাধান বই অন্য কোন পথ নেই। প্রধানমন্ত্রী দেশে ফেরার সাতদিনের মাথায় গরীবপুরের ট্যাংক লড়াই। তারপর একেবারে ১৬ ডিসেমবর বাংলাদেশের স্বাধীনতার দিন অবধি দ্রুতলয়ে সব ঘটে গিয়েছে। প্রায় রূপকথার ইচ্ছাপূরণের মত। এই সাফল্যের পিছনে নিভৃতে ও প্রকাশ্যে ভারতের কূটনৈতিক তৎপরতার দান অনেকখানি।

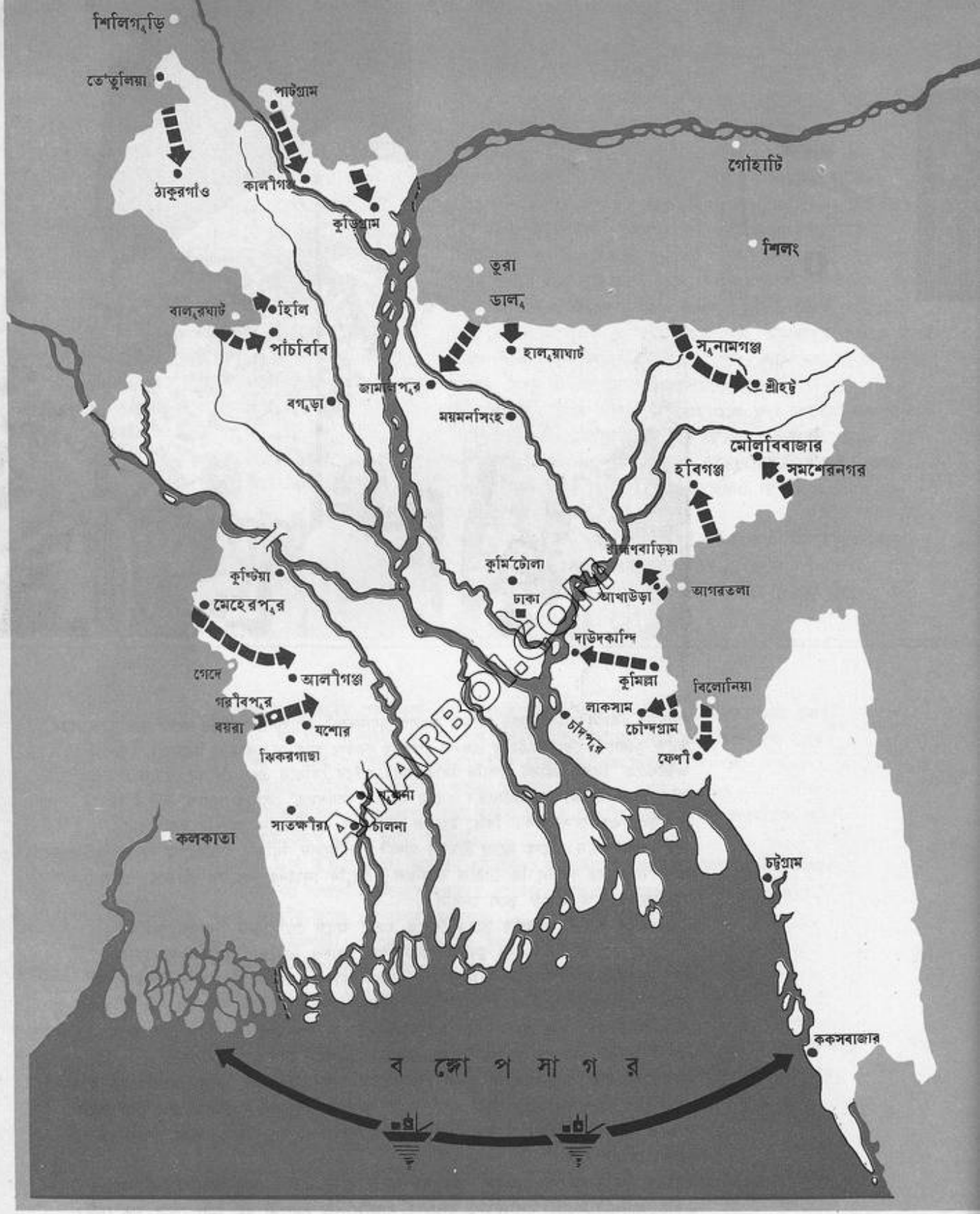

AMARBOI.COM

যুদ্ধে নামলে দু'সপ্তাহেই ঢাকা পৌঁছতে হবে। কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা। অর্জুনের মত লক্ষ্যভেদে নেমে ভারতীয় জওয়ান সেদিন চোখের সামনে দেখছিল শুধু ঢাকা। অন্য শহর বা ঘাঁটির জন্যে শক্তি ক্ষয় করা যাবে না। শত্রু ধোঁকা খেল। ভাবলো, তার চেয়ে অন্তত চতুর্গুণ শক্তি নিয়ে সর্বদিক থেকে ভারতীয় বাহিনী আক্রমণ করেছে। ফলে আতঙ্কে শত্রু সৈন্য কোন এক এলাকায় জড়ো হয়ে বাধা দিতে পারল না—বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে থাকতে বাধ্য হল।

৭

ইয়াহিয়ার শেষ লড়াই

মাত্র ছ ঘণ্টার জন্য সেদিন প্রধানমন্ত্রী কলকাতা এসেছিলেন। একমাত্র কর্মসূচী ব্রিগ্রেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের জনসভায় ভাষণ দান। সেদিন ৩ ডিসেম্বর।

আসলে কিন্তু একদিন পরে, অর্থাৎ ৪ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কলকাতা আসার কথা ছিল। জনসভার উদ্যোক্তারাও সেইমত পোস্টার দিয়েছিলেন। সরকারী ঘোষণায়ও সেই কথাই বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, ৪ ডিসেম্বর বিকেল ৪ টায় ব্রিগ্রেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেবেন, হঠাৎ সেই কর্মসূচী পাল্টে গেল। ১ ডিসেমবর দিল্লি থেকে খবর এল, প্রধানমন্ত্রী কলকাতা আসবেন ঠিকই—কিন্তু ৪ নয়, ৩ তারিখ। এবং, সেইদিনই ফিরে যাবেন।

পাক-ভারত সীমান্ত উত্তেজনা তখন চরমে। পূবে গণ্ডগোল। পশ্চিমে গণ্ডগোল। আগরতলা আক্রান্ত। আখাউড়া, হিলি, বয়রায় প্রায় রোজই সংঘর্ষ হচ্ছে। জীবননগরের ট্যাঙ্কের লড়াই-ও হয়ে গিয়েছে। কাশ্মীর সীমান্তেও গুলি গোলা চলা সুরু হয়েছে। জম্মুর ওপর বারকয়েক পাক মিরাজ হানা দিয়ে গিয়েছে। একেবারে চরম মুহূর্ত। এই সময় প্রধানমন্ত্রী কলকাতা আসছেন।

সকলের মুখেই তখন এক প্রশ্ন, প্রধানমন্ত্রী কেন কলকাতা আসছেন? কী এমন জরুরী এই জনসভা? গোটা পৃথিবী থেকে সাংবাদিকরা ছুটে এলেন কলকাতায়। প্রধানমন্ত্রী এই সময় কলকাতা কেন আসছেন তা বোঝার জন্য, প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় কী বলেন তা শোনার জন্য।

কৌতুহল আরও বাড়ল ১ ডিসেমবর—যখন দিল্লি থেকে প্রচারিত হল যে প্রধানমন্ত্রী তাঁর কলকাতার কর্মসূচী একদিন এগিয়ে দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী কলকাতা আসা নিয়েই প্রশ্নের অন্ত ছিল না। দিন এগিয়ে নেওয়ায় তা আরও বেড়ে গেল। সবাই আবার সুরু করে দিলেন জল্পনা কল্পনা, প্রধানমন্ত্রীর কলকাতা সফর এগিয়ে দেওয়ার কারণ কী! বিদেশী সাংবাদিকরা প্রশ্ন তুললেন, তাহলে কি নির্দিষ্ট দিনের একদিন আগেই শ্রীমতী গান্ধী লড়াই সুরু করবেন? সেই সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেবেন? এবং, দুটো ঘোষণাই হবে কলকাতায়? বলা বাহুল্য, বিদেশী সাংবাদিকদের অনেকেরই তখন অভিমত, ভারতই প্রথম যুদ্ধটা সুরু করবে।

প্রধানমন্ত্রী যথা সময়ে কলকাতা এলেন। যথা সময়ে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের জনসভায় ভাষণ দিতে গেলেন। এবং, যখন তাঁর ভাষণ শেষ হল তখন সবাই দেখলেন, নতুন কোনও চমকপ্রদ কথা বলেননি, দেননি কোনও রণহুঙ্কার—নেই যুদ্ধ সুরু করা বা বাংলাদেশ

AMARBOI.COM

সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথাও।
অনেকে হতাশ হলেন। অনেকে চুপচাপ বাড়ি ফিরে গেলেন। বিশ্বের সাংবাদিকরা কলকাতার তার ঘর থেকে খবর পাঠালেনঃ ইট ওয়াজ এ ডাল মিটিং। নো স্পেশাল অ্যানাউসমেনট। নো থ্রেট টু পাকিস্তান। নো রেকগনিশ্যান টু বাংলাদেশ গভর্নমেনট।
ওদিকে কিন্তু তখন পুরোদমে প্রতিক্রিয়া সুরু হয়ে গিয়েছে। বিদেশী সাংবাদিকরা যেমন অনুমান করেছিলেন তেমনি কোনও অনুমানের ভিত্তিতে বা নিজস্ব কোনও হিসাব অনুসারে ইয়াহিয়া খাঁ ততক্ষণে তার সেনা ও বিমান বাহিনীকে ভারতের উপর ঝাপিয়ে পড়ার হুকুম দিয়ে দিয়েছে। পাক সেনা বাহিনী ততক্ষণে আঘাত হেনেছে ভারতের পশ্চিম সীমান্তের নানা অঞ্চলে। পাক বিমান বাহিনীও আক্রমণ সুরু করেছে বিভিন্ন ভারতীয় শহরের উপর। ইয়াহিয়া খাঁর পরিকল্পনা, ইসরাইল যেমন মিশরকে ঘায়েল করেছিল পাকিস্তান তেমনি ঘায়েল করবে ভারতকে। ঝটিতি আক্রমণে ভারতকে শায়েস্তা করবে পাকিস্তান! মাটিতে মিশিয়ে দেবে ভারতীয় বিমানবাহিনীকে। যুদ্ধ সুরু করার আগেই যুদ্ধের আশা মিটিয়ে দেবে ভারতের!
প্রধানমন্ত্রী তখনও কলকাতায়। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের জনসভা শেষ করে রাজভবনে। রাজভবনেই প্রথম খবরটা পেলেন তিনি। পাকিস্তান লড়াই সুরু করে দিয়েছে। আকস্মিক বিমান আক্রমণ চালিয়েছে বিভিন্ন ভারতীয় শহরের উপর। ৫-৪০ মিনিটে আক্রমণ করেছে অমৃতসর। ৫-৪৭-এ শ্রীনগর। ৬-৮ মিনিটে কাশ্মীর উপতক্যার অবন্তীপুর। সাড়ে সাতটার সময় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বিমান উড়ল দমদম থেকে। দিল্লি ফিরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। বিমান বাহিনীর জঙ্গী বিমানও উড়ে চলল সঙ্গে সঙ্গে। আকস্মিক কোনও পাক হামলা হলে মোকাবিলা করতে।
দিল্লি ফিরেই প্রধানমন্ত্রী একে একে সব ব্যবস্থা নিলেন। কথা বললেন প্রতিরক্ষা-বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে। ডাকলেন মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠক। সারা ভারতে জারি করলেন আপৎকালীন অবস্থা। পরদিন সকালে ডাকা হল সংসদের জরুরী অধিবেশন। এবং, মধ্য রাত্রে জাতির উদ্দেশে দিলেন বেতার ভাষণ।
সে ভাষণও শান্ত ও সংযত। বললেনঃ পাকিস্তান আমাদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ যুদ্ধ বাংলাদেশের। এ যুদ্ধ আমাদের। দীর্ঘকালীন কৃচ্ছ্র ও আত্মত্যাগের জন্য আমাদের সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

তারও আগে বসেছিলেন শুধু তিন প্রতিরক্ষা প্রধান—সেনাবাহিনীর মানেকশ, বিমান বাহিনীর লাল এবং নৌবাহিনীর নন্দ। প্রথম পাকিস্তানী বিমান আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তিন প্রধানই তাঁদের সবগুলি দফতরে নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন: ওয়ার ইজ অন। হিট ব্যাক। হিট ব্যাক উইথ অল ইওর মাইট।
৩ ডিসেমবর। ১৯৭২। মধ্যরাত্রি থেকেই পুরো দমে সুরু হয়ে গেল ভারত-পাক যুদ্ধ। এবং, সেই সঙ্গে সুরু হয়ে গেল বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়। চতুর্দিক থেকে বাংলাদেশের দখলদার পাক বাহিনীর উপর আক্রমণ সুরু করল ভারতীয় সেনা, বিমান এবং নৌবাহিনী। আর, বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধারা।
সব যুদ্ধই কোনও একটা মুহূর্তে সুরু হয়। কিন্তু তা বলে কোনও যুদ্ধই ঠিক আকস্মিক সুরু হয় না। প্রত্যেকটা যুদ্ধের পেছনে থাকে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি। থাকে বিস্তারিত পরিকল্পনা। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিলেই সুরু হয় সেই প্রস্তুতি আর পরিকল্পনা। দুপক্ষেরই প্রস্তুতি আর পরিকল্পনা। যেমন এ যুদ্ধেরও ছিল। এবারের ভারত-পাক যুদ্ধের। এবং, তারই মূল অংশ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত লড়াইয়েরও।
এপরিল-মে থেকেই ভারতীয় এবং পাকিস্তানী প্রতিরক্ষা বাহিনী বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের নিজ নিজ পরিকল্পনা রচনার কাজ সুরু করে দিয়েছিল। আর, সেই সঙ্গেই সুরু হয়েছিল প্রস্তুতি।
সাধারণত লক্ষ্যটা স্থির করে দেন রাষ্ট্র নায়করা। সমর নায়করা সেই অনুসারে তাঁদের পরিকল্পনা রচনা করেন এবং প্রস্তুতি গড়েন। এপরিল মাসের শেষ দিকেই ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সামনে ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের কয়েকটা দিক তুলে ধরেছিলেন। বলেছিলেন: (এক) বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম চালাবে মূলত বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী। ভারতীয় সেনা বাহিনী ট্রেনিং এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মুক্তি বাহিনীকে সাহায্য করবে।
(দুই) মুক্তি বাহিনীকে ভারত সরকার সাহায্য দিচ্ছে বলে পাক বাহিনী যদি ভারতের উপর হামলা করে তাহলে ভারতীয় সেনা বাহিনীকে সেই আক্রমণের জবাব দিতে হবে।
(তিন) বাংলাদেশ সমস্যার যদি কোনও রাজনৈতিক সমাধান না হয় তাহলে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকেও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত লড়াইয়ে নামতে হতে পারে। (চার) যদি চূড়ান্ত লড়াইয়ে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে নামতে হয়ই তাহলে

AMARBOI.COM

তার লক্ষ্য হবে রাজধানী ঢাকা সহ গোটা বাংলাদেশকে দখলদার পাক বাহিনীর কবল মুক্ত করা। (পাঁচ) মুক্তি সংগ্রামে যদি প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী নামে তাহলে রাজধানী সহ গোটা বাংলাদেশকে খুব দ্রুতগতিতে মুক্ত করতে হবে। (ছয়) বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী অংশ নেওয়া মানেই হবে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ। সুতরাং, লড়াই শুধু পূর্বে হবে না, হবে পশ্চিমেও। এবং (সাত) পাক-ভারত লড়াই হলে উত্তর সীমান্তে চীনের কথাও মনে রাখতে হবে।

এই নির্দেশের উপর ভিত্তি করেই ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী দুভাবে তাঁদের পরিকল্পনা রচনা করল এবং প্রস্তুতি গড়ে তুলল।

(এক) মুক্তি বাহিনীকে ট্রেনিং দেওয়া এবং তাঁদের অস্ত্র সরবরাহ করা। (দুই) বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ের লড়াইয়ের জন্য পরিকল্পনা রচনা করা এবং তার প্রস্তুতি গড়ে তোলা।

বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ের পরিকল্পনা রচনা করতে গিয়ে আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে প্রথমেই কতকগুলি অসুবিধার কথা বিবেচনা করতে হয়। প্রথমত, বাংলাদেশের প্রকৃতি। বাংলাদেশে অসংখ্য নদী নালা। কতকগুলি নদী বিশাল। আর, বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র জলাভূমি এবং এইসব জলাভূমিতে শীতকালেও কিছু কিছু জল জমে থাকে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের নদী নালাগুলি অধিকাংশই উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। তাই পশ্চিম থেকে পূবে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত কঠিন। অথচ, ভারত থেকে বাংলাদেশে কোনও বড় সেনাবাহিনীকে পাঠাতে হলে নানা কারণে পশ্চিম দিক থেকে পাঠানোই সুবিধা। তৃতীয়ত, বাংলাদেশে রাস্তাঘাট অত্যন্ত কম। সামান্য কয়েকটি মাত্র পাকা রাস্তা আছে। সেগুলিও অসংখ্য নদী নালার ওপর দিয়ে গিয়েছে। চতুর্থত, প্রয়োজনীয় সংখ্যায় সৈন্য, বিমান এবং জাহাজ-বোট পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশে পাক দখলদার বাহিনীতে মোট সৈন্য এবং আধা সৈন্য প্রায় চার ডিভিশন। সামরিক বিশেষজ্ঞদের হিসাব মত ঘাঁটি থেকে কোনও সেনা বাহিনীকে উচ্ছেদ করতে হলে আক্রমণকারীর অন্তত তিনগুণ শক্তি চাই। অর্থাৎ, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের জন্য অন্তত বারো ডিভিশন ভারতীয় সৈন্য প্রয়োজন। অথচ তা পাওয়া যাবে না। কারণ, পশ্চিম খণ্ডেও বহু সৈন্য, বিমান এবং জাহাজ রাখা প্রয়োজন। আর, উত্তরের জন্যও কিছু সৈন্য এবং বিমান মজুত রাখতে হবে। পঞ্চমত, এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও খুব দ্রুত ঢাকা সহ বাংলাদেশকে মুক্ত করতে হবে—কিন্তু বাংলাদেশে এমন সতর্কভাবে লড়াই চালাতে হবে যাতে সাধারণ নাগরিকের কোনও ক্ষতি না হয়, দেশের কোনও সম্পদ ধ্বংস না হয় এবং লড়াইটা চলে শুধু পাক বাহিনীর সঙ্গে। অর্থাৎ, তাড়াতাড়ি লড়াই শেষ করতে হবে, কিন্তু আর পাঁচটা লড়াইয়ের মত সর্বাত্মক লড়াই করা যাবে না। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী বাংলাদেশের চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য একটা বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনা করল। সেই পরিকল্পনার পাঁচটা লক্ষ্য।

প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য, ক্ষিপ্রতা। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী স্থির করল যদি যুদ্ধে নামতেই হয় তাহলে দু সপ্তাহের মধ্যে ঢাকা পৌঁছতে হবে। কেন্দ্র বিন্দু ঢাকা। একমাত্র সেই দিকেই এগোতে হবে। অন্যান্য শহর বা ঘাঁটি দখলের জন্য সময় বা শক্তি নষ্ট করা হবে না। সেগুলিকে এড়িয়ে যেতে হবে।

দ্বিতীয় লক্ষ্য, শত্রু পক্ষকে ধোঁকা দেওয়া। তাকে বোঝাতে হবে যে তার চেয়ে অন্তত চারগুণ শক্তি নিয়ে ভারতীয় বাহিনী আক্রমণ করছে। আর তাকে দেখাতে হবে যে ভারতীয় বাহিনী সবদিক থেকেই আক্রমণ করতে যাচ্ছে। যাতে শত্রু পক্ষ তার সৈন্য বাহিনী কোনও একটা এলাকায় জড় না করতে পারে এবং বাংলাদেশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে রাখতে বাধ্য হয়।

তৃতীয় লক্ষ্য, সেই ছড়িয়ে পড়া পাক বাহিনীকে আবার একত্রিত হতে না দেওয়া। যাতে পাক বাহিনী রিগ্রুপড হয়ে কোনও দ্বিতীয় পর্যায়ের লড়াইয়ে না নামতে পারে এবং যাতে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সৈন্য সরিয়ে এনে তারা ঢাকা রক্ষার জন্য পদ্মা ও মেঘনার মাঝামাঝি অঞ্চলে কোনও শক্ত ব্যূহ না রচনা করতে পারে।

চতুর্থ লক্ষ্য, ভারতীয় বাহিনী যাতে পাক বাহিনীর সঙ্গে কোথাও কোনও বড় দীর্ঘ যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে পড়ে এবং যেন ভারতীয় বাহিনীর ক্ষতি যথা সম্ভব কম হয়। ভারতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনীর পরিচালকরা এটাও জানতেন যে কোথাও কোনও বড় দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধ হলে তাতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ক্ষতি হবে এবং জাতীয় সম্পদও ধ্বংস হতে বাধ্য। এইজন্য ভারতীয় বাহিনী প্রথম থেকেই ঠিক করল বাংলাদেশে ঢুকতে হলে বড় সড়কগুলি এড়িয়ে যাবে। এবং এগোবে কাঁচা পথ দিয়ে—যেখানে পাক

তিনটি পাক স্যাবার জেট ছুটে এসেছে। হঠাৎ এলো ভারতীয় ন্যাট। এসেই গুলি। স্যাবার জেট বেসামাল। আগুন ধরেছে। আগুন ছড়াচ্ছে। তারপর? তারপর তিনটি জেটই কুপোকাৎ। ন্যাট থেকে সিনে ক্যামেরায় তোলা ছবি।

AMARBOI.COM

ট্যাংক যুদ্ধে পালানোর সময় পাক ট্যাংক ক্রু লগবুকটিও ফেলে গেছে। চীনের তৈরি দু' ইঞ্চি মিজাইল, মারকিন ৭৫ মিলিমিটার মেশিন গান, ৮১ মিলিমিটার মরটার, ৫৭ ইঞ্চি চীনে রকেট—কত কি অঢেল।

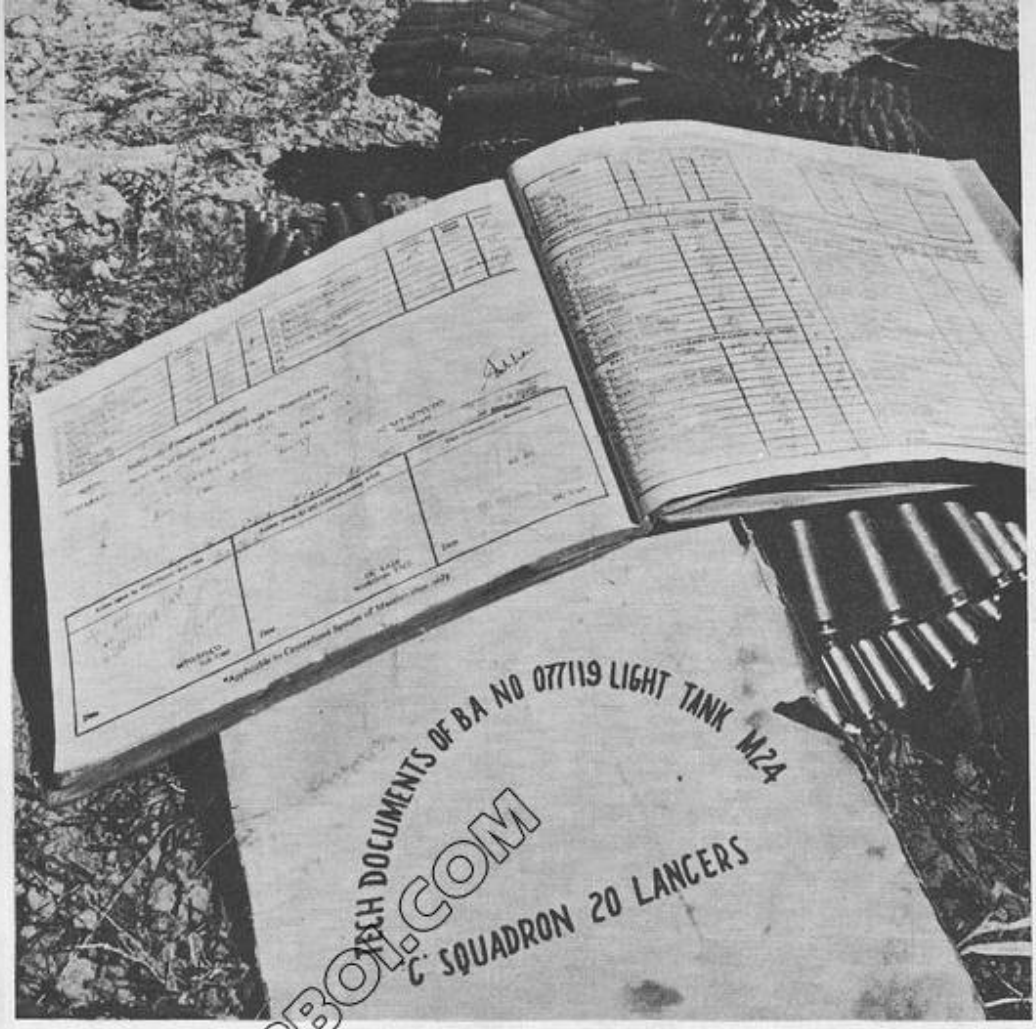

AMARBOI.COM

বাহিনী তাকে আশা করবে না, যেখানে পাক-বাহিনীর প্রতিরক্ষাব্যূহ বা মাইন থাকবে না, যেখানে শত্রুপক্ষ ভারী অস্ত্রশস্ত্র আনতে পারবে না এবং যেখানে জনবসতি খুবই কম থাকবে।

পঞ্চম লক্ষ্য, গোড়া থেকেই এমনভাবে আক্রমণটা চালানো এবং পরিচালনা করা যাতে বাংলাদেশের দখলদার পাক বাহিনীর মনোবল লড়াইয়ের প্রায় সুরুতেই ভেঙ্গে দেওয়া যায় এবং যাতে তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই না করে আগেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

এই পাঁচটা লক্ষ্য সামনে রেখে ভারত বাংলাদেশের প্রায় চতুর্দিকে এইভাবে তার সেনাবাহিনীকে সাজালো ঃ

২নং কোর। সদর দফতর: কৃষ্ণনগর প্রধান: লে: জে: টি. এন. রায়না। দুটো পার্বত্য ডিভিশন। ৯ম ও ৪র্থ। তৎসহ টি-৫৫ এস রুশ ট্যাঙ্কে সজ্জিত একটি মাঝারী আরমরড রেজিমেনট, পি. টি-৭৬ সাতারু রুশ ট্যাঙ্ক সজ্জিত আর একটি হাল্কা ট্যাঙ্ক রেজিমেনট একটা মাঝারী আরটিলারি রেজিমেনট—১৩০ মিলিমিটার দূর পাল্লার রুশ কামান সহ ব্রিজ তৈরী করতে পারে এমন একটি ইনজিনিয়ারিং ইউনিট। ৯ম ডিভিশন তার প্রধান ঘাঁটি করল ২৪ পরগণার বয়রার কাছাকাছি। ৪র্থ ডিভিশনের মূল ঘাঁটি হল কৃষ্ণনগর গেদের মাঝামাঝি।

৩৩নং কোর। সদর দফতর শিলিগুড়ি। প্রধান: লে: জে: এম. এল. থাপান। ৬ এবং ২০নং পার্বত্য ডিভিশন। তৎসহ রুশ পিটি-৭৬ এস ট্যাঙ্কে সজ্জিত একটা হাল্কা আরমরড রেজিমেনট, বৃটিশ ৫·৫ ইঞ্চি কামানে সজ্জিত একটি মাঝারী আরটিলারি রেজিমেনট এবং ব্রিজ তৈরি করার একটি ইনজিনিয়ারিং ইউনিট। ২০নং পার্বত্য ডিভিশন প্রধান ঘাঁটি করল বালুরঘাটের কাছে। ৬নং ডিভিশন

কোচবিহার জেলায়।
এই ৩৩নং কোরের আর একটা অংশের ঘাঁটি হল গোহাটিতে। পরিচিতি: ১০১নং কমিউনিকেশন জোন। প্রধান: মে: জে: জি. এস. গিল। শক্তি: দুই ব্রিগেড পদাতিক সৈন্য। জামালপুরের কাছে প্রচণ্ড এক লড়াইয়ে জেনারেল গিল আহত হওয়ার পর এই বাহিনীর প্রধান হলেন মে: জে: জি. নাগরা।
৪নং কোর। সদর দফতর: আগরতলা। প্রধান লে: জে: সগত সিং। ৮, ৫৭ এবং ২৩নং পার্বত্য ডিভিশন। তৎসহ, দু স্কোয়ারডন পি. টি-৭৬ এস রুশ সাঁতারু ট্যাঙ্ক, বৃটিশ ৫·৫ ইঞ্চি কামানে সজ্জিত একটা মাঝারী রেজিমেনট এবং ব্রিজ তৈরীর ইনজিনিয়ারিং ইউনিট। ঐ তিনটি পার্বত্য ডিভিশনকে ভাগ ভাগ করে বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তে বিভিন্ন এলাকায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল।
এটা ভারতীয় সেনা বাহিনীর হিসাব। এর সঙ্গে ছিল কর্নেল ওসমানির অধীনস্থ প্রায় ৬০,০০০ মুক্তিসেনা। এরা মোটামুটি দুভাগে বিভক্ত ছিলেন: মুক্তিফৌজ এবং মুজিববাহিনী বা মুক্তিবাহিনী (এফ এফ)। ট্রেনিং প্রাপ্ত ও পুনর্গঠিত মুক্তি বাহিনীর সৈন্যরা নব পর্যায়ে জুন মাস থেকেই বাংলাদেশের ভেতরে লড়াই চালাতে সাহায্য করেছিল। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন মে: জে: বি. এন. সরকার। যুদ্ধ যখন পুরোদমে সুরু হয়ে গেল এবং যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যক্ষভাবে লড়াইয়ে অংশ নিলেন তখন বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নিয়ে গঠিত হল একটি কমাণ্ড। এই কমাণ্ডের প্রধান হলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লে: জে: জগজিৎ সিং অরোরা।
এখানে দুটো জিনিষ বোধ হয় আগাম ব্যাখ্যা করে রাখা ভাল।
ওপরের তালিকা থেকেই দেখা যাচ্ছে ভারত বাংলাদেশের চতুর্দিকে যে সৈন্য সাজালো তারা অধিকাংশই পার্বত্য ডিভিশনের।
পার্বত্য ডিভিশন গঠনে যে-কোনও অন্য ডিভিশনের মতই, কিন্তু যেহেতু প্রধানত পাহাড়ে লড়াই করার জন্য পার্বত্য ডিভিশন গঠিত হয় সেইজন্য তাদের অস্ত্রশস্ত্র হয় একটু হাল্কা ধরনের। ট্যাঙ্ক বা ভারী কামান পার্বত্য ডিভিশনে থাকে না। এই জন্যই বাংলাদেশে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করতে গিয়ে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রতিটি পার্বত্য ডিভিশনের সঙ্গে বাড়তি ট্যাঙ্ক ও আরটিলারি রেজিমেনট যোগ করে। এর মধ্যে বেশ কিছু রুশ সাঁতারু ট্যাঙ্কও ছিল।
দ্বিতীয়ত, পার্বত্য ডিভিশনের সঙ্গে সাধারণত বড় ব্রিজ তৈরী করার মত ইউনিট থাকে না। কারণ, পাহাড়ের উপরে নদী চওড়া হয় না। অথচ বাংলাদেশ চওড়া নদীতে ভরা। কতকগুলি নদী বিশাল। এইজন্য বাংলাদেশে অপারেশনের দায়িত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

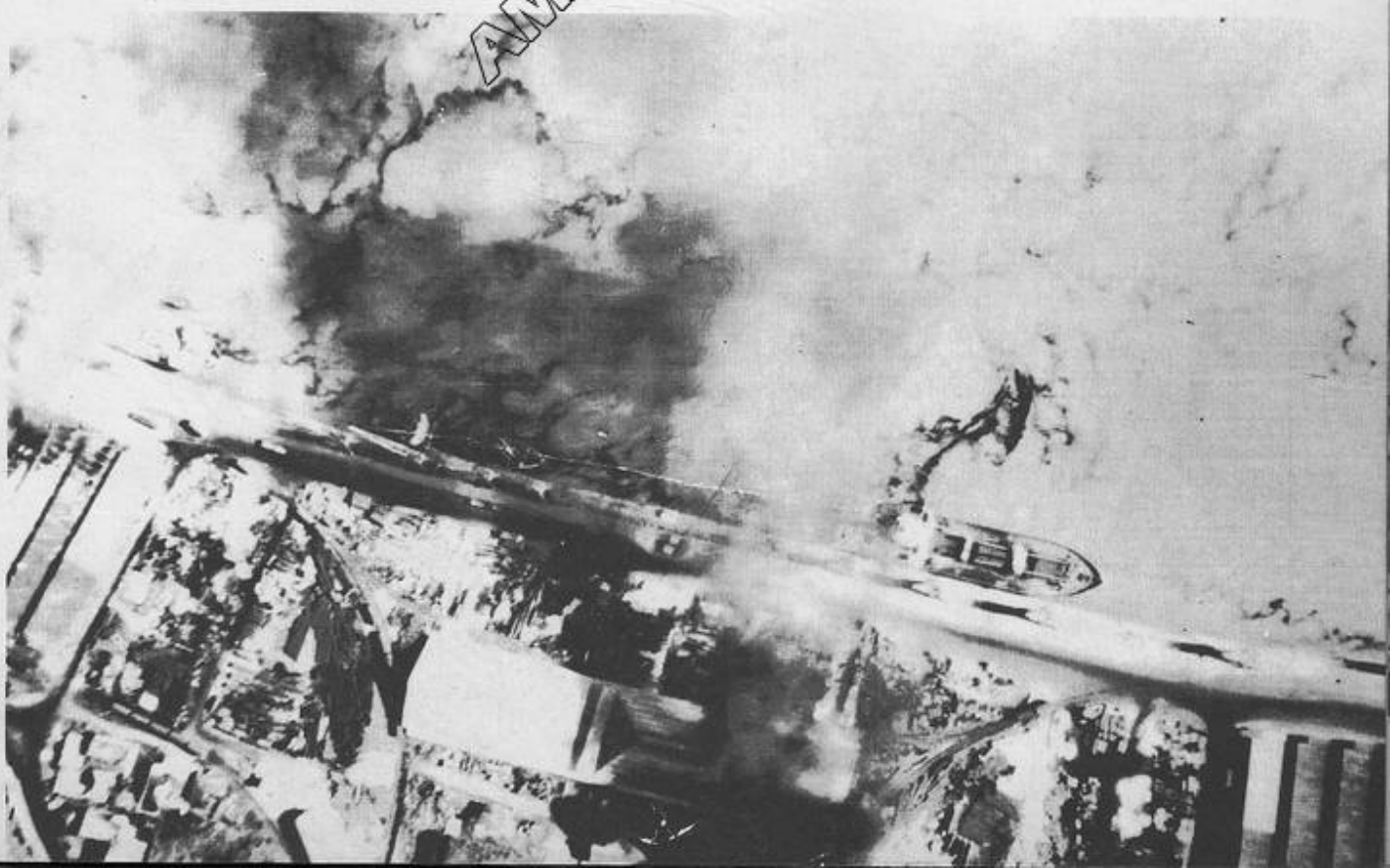

চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে বোমা ফেলে আর গোলা ছুঁড়ে তুলকালাম কাণ্ড করছে আমাদের নৌবাহিনীর 'বিক্রান্ত'। ছবিটি বিমান থেকে তোলা।

AMARBOI.COM

পাকিস্তান-বিরোধী এবং মুক্তিযোদ্ধা সমর্থকদের

প্রত্যেকটি পার্বত্য ডিভিশনের সঙ্গে বড় বড় ব্রিজ তৈরীর ইনজিনিয়ারিং ইউনিটও দেওয়া হল।

স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়করা বাংলাদেশের জন্য তিন পর্যায়ে তিন কিস্তি সামরিক পরিকল্পনা তৈরী করে। প্রথম পর্যায়, ২৫ মারচ থেকে এপরিলের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত। এই পর্যায়ের পাকিস্তানী সামরিক পরিকল্পনা ছিল: সমস্ত শহরগুলিতে ঝটিতি বাঙালীর উপর ঝাপিয়ে পড়, যাকেই স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে মনে হয় তাকেই শেষ করে দাও।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ যখন ট্রেনিং সহ পুনর্গঠিত মুক্তিবাহিনী গেরিলা কায়দায় আক্রমণ সুরু করল তখন পাক বাহিনীও বাংলাদেশে তার সামরিক পরিকল্পনা পাল্টাল। এই পর্যায়ে তারা শুধু সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করল না। গড়ে তুলল দুটো স্থানীয় বাহিনীও। এর একটা হল রাজাকর বাহিনী—সামান্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত অত্যাচারীর দল। আর একটা আলবদর বাহিনী—প্রধানত ধর্মান্ধ যুবক এবং গুণ্ডাশ্রেণীর লোকদের নিয়ে গঠিত অসামরিক বাহিনী। গেরিলা এবং পাক বিরোধীদের খতম করার জন্য পাক সামরিক বাহিনী এই দুই দালাল বাহিনীর সাহায্য নিল। রাজাকর বাহিনীর হাতে অস্ত্রও দেওয়া হল—প্রধানত রাইফেল। নানা রকমের দায়িত্ব পেল তারা। যেমন, গেরিলাদের খুঁজে বের করা, গেরিলাদের সহকারী এবং আশ্রয়দাতাদের উপর অত্যাচার চালানো ও তাদের নাম ধাম সেনাবাহিনীকে সরবরাহ করা, ব্রিজ রেললাইন ইত্যাদি পাহারা দেওয়া। আলবদর বাহিনীকেও মোটামুটি একই রকমের দায়িত্ব দেওয়া হল। এক পাহারা দেওয়া ছাড়া। তাদের সক্রিয় করে তোলা হল প্রধানত শহর অঞ্চলে। শহরে এবং শহরের আশপাশে যারা যারা পাকিস্তান বিরোধী এবং মুক্তি যোদ্ধাদের সমর্থক তাদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব পেল আলবদর। সেনাবাহিনী এই দুই বাহিনীর কাজ কর্ম নিয়মিত তদারক করত। এই দুই বাহিনীকেই সেনাবাহিনী ঢালাও সাহায্য দেওয়ারও ব্যবস্থা করেছিল।

রাজাকর বাহিনীর হাতে প্রধান অস্ত্র রাইফেল

AMARBOI.COM

শীতের শীর্ণ কপোতাক্ষ। তার বুকে ঝিকরগাছার ঢালাই ব্রিজ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। খুলনায় পালাবার সময় পাক সোলজাররা উড়িয়ে দিয়ে গেছে। পাশেই ভারতীয় জওয়ানরা সাত তাড়াতাড়ি ভাসন্ত ব্রিজ বানিয়ে ফেলেছেন।

খুঁজে বের করার দায়িত্ব পেল আলবদর

মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণ যত বাড়তে আরম্ভ করল পাক কর্তৃপক্ষও ততই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সাধারণ বাঙালীর উপর সেনাবাহিনী ও তার দুই দালাল গোষ্ঠীর অত্যাচারও ততই বেড়ে চলল।

একদিকে যখন সাধারণ মানুষের উপর, বিশেষ করে সাধারণ গ্রামবাসীর উপর অত্যাচার বাড়ল অন্যদিকে তখনই পাক সেনাবাহিনী সীমান্তেই মুক্তিবাহিনীর অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি চলে আসার চেষ্টা করল। বর্ষাকালে এই কাজে তাদের অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু বর্ষা একটু কমতেই তারা রাজাকরদের নিয়ে সীমান্তের যত কাছাকাছি সম্ভব চলে আসার চেষ্টা করল। সেপটেমবর মাস নাগাদ এই ব্যাপারটা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠল। ২৭৪টা সীমান্ত চৌকির মধ্যে ওরা প্রায় ২১০টায় পৌঁছে গেল। ২৫ মারচের পর পাক ফৌজ ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে প্রায় সব সীমান্ত চৌকি ছেড়ে দিতে হয়েছিল। এই রকম সময় পাক রাষ্ট্রনায়করা ঢাকার পাক কর্তৃপক্ষের জন্য আবার তাদের নতুন নির্দেশাবলী পাঠাল। এই নির্দেশাবলীর প্রথম ভাগটা ছিল পরিস্থিতি বিশ্লেষণ। সমগ্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পাক কর্তৃপক্ষ বলল: আমরা মনে করি ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পূর্ব পাকিস্তানের কতকগুলি সীমান্ত অঞ্চল দখল করার চেষ্টা করবে এবং ভারত সরকার সেই দখলকরা এলাকায় স্বাধীন বাংলা সরকার নামক বস্তুটিকে প্রতিষ্ঠিত করবে। তারপর সেই তথাকথিত স্বাধীন বাংলা সরকার দেখিয়ে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চাপ বাড়াবার চেষ্টা করবে। আমাদের মনে হয় না ভারত সরকার গোটা পূর্ব পাকিস্তান দখল করার পরিকল্পনা নিয়ে নামবে। সে সাহস তারা পাবে না। তারা চাইবে সীমান্তের কাছাকাছি কয়েকটা বড় শহরকে নিয়ে একটা তথাকথিত মুক্ত এলাকা গঠন করতে।

এই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে ইসলামাবাদ ঢাকাকে নির্দেশ দিল: সুতরাং, এমন ভাবে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সাজাতে হবে যাতে

AMARBOI.COM

মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন থেকে পাঠানো

ওরা পূর্ব পাকিস্তানের কোনও বড় এলাকা না দখল করতে পারে। আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সীমান্তেই সুদৃঢ় করতে হবে। এবং দেখতে হবে যেন ভারতীয় সেনাবাহিনী স্বনামে বা বেনামে পূর্ব পাকিস্তানের কোনও অঞ্চলে ঢুকে তা না দখল করতে পারে। সীমান্ত অঞ্চলে এক আধ মাইল ওরা ঢুকে পড়লে ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু বেশি দূর কিছুতেই এগোতে দেওয়া হবে না।

এই নির্দেশ পেয়েই বাংলাদেশে দখলদার পাক বাহিনীর প্রধান লে: জে: এ. এ. কে. নিয়াজি বোঝার চেষ্টা করল ভারতীয় সেনাবাহিনী কোন্ দিকটায় ঢোকার চেষ্টা করতে পারে। নানাভাবে খবর নিল। পাত্রমিত্রদের নিয়ে বার বার পরামর্শ করল। কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী কোন্ দিক দিয়ে এগিয়ে কোন্ এলাকা মুক্ত করতে চাইতে পারে। ততদিনে সীমান্তে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রস্তুতি পুরদমে সুরু হয়ে গিয়েছে। নিয়াজি সব দিকের খবর নিল।

এবং দেখল চতুর্দিকে প্রস্তুতি। যে কোনও দিক দিয়ে আক্রমণ হতে পারে।

এই অবস্থায় নিয়াজি একটা "মাষ্টার প্ল্যান" তৈরী করল। তাঁর পরিকল্পনাটা হল এই রকম: সীমান্তের সবগুলি পাকা রাস্তার উপর সুদৃঢ় প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করা হবে। ভারতীয় বাহিনী যেখানে যেখানে জড় হয়েছে তার ঠিক উল্টো দিকে সুদৃঢ় বাঙ্কার তৈরী করে তাতে ভারী কামান সহ পাক সেনাদের বসিয়ে দেওয়া হবে। যে রাস্তা দিয়েই ভারতীয় বাহিনী অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করুক সেই রাস্তায়ই তাকে বাধা দেওয়া হবে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করবে পাক সেনাবাহিনী। আর, অন্যান্য আধা সৈনিকরা লড়বে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে।

পরিকল্পনা পাকা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়াজি তার গোটা সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিল। সীমান্ত থেকে দেশের ভেতরে দশ পনেরো মাইল, কোথাও কোথাও ত্রিশ চল্লিশ মাইল পর্যন্ত বড় বড় সড়কের উপর অসংখ্য বাঙ্কার তৈরী করল এবং প্রধান প্রধান ভারতীয় ঘাঁটির মুখোমুখি ভারী কামান ও ট্যাঙ্ক সহ পাক সেনাবাহিনীকে দাঁড় করিয়ে দিল।

ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তারা তাই দেখে ভীষণ খুশী হলেন। তাঁরা বুঝলেন, পাখি ফাঁদে পা দিয়েছে। নিয়াজি তার সেনাবাহিনীকে দেশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে, গোটা সীমান্তটা রক্ষা করতে চাইছে এবং বুঝতেই পারছে না যে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে যোগদিলে ভারতীয় সেনাবাহিনী ঠিক কোন্ দিক দিয়ে এগোবে।

বাংলাদেশে নিয়াজির হাতে তখন পাক সেনাবাহিনীর প্রায় ৪২টা নিয়মিত ব্যাটেলিয়ান। ৩৫ ব্যাটেলিয়ন পাক সেনা এবং ৭ ব্যাটেলিয়ান পশ্চিম পাকিস্তানী রেনজার। আর আধা সামরিকদের মধ্যে ইসট পাকিস্তান

AMARBOI.COM

প্রচুর গোলাগুলি তখন পাক কর্তৃপক্ষের হাতে

যশোর দুর্গ দখল করেই আয়ুবের বানানো কংক্রিটের রাস্তা দিয়ে সাঁজোয়া গাড়ি জোর কদমে ছুটেছে। সামনে খুলনা। আর ৩৫ মাইল।

সিভিল আরমড ফোরসেসের ১৭টা উইংগ এবং ৫ উইংগ মোজাহেদ। অর্থাৎ মোট নিয়মিত সৈন্য প্রায় ৪০,০০০। এবং আধা সামরিক বাহিনীতে প্রায় ২৪,২০০ লোক। এছাড়াও পাক কর্তৃপক্ষের হাতে বাংলাদেশে আরও প্রায় ২৪,০০০ ইনডাসট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স ছিল।

মোট সৈন্য ছিল মাত্র ৪২ ব্যাটেলিয়ান; কিন্তু নামে ডিভিশন ছিল চারটা। ১৪, ৩৯, ৯ ও ১৬ এছাড়াও ৩৬নং ডিভিশন নামে আর একটা ডিভিশন ছিল মেজর জেনারেল জামসেদের অধীনে। প্রধানত আধা-সৈনিকরা এই ডিভিশনের আওতায় ছিল।

সীমান্তের চতুর্দিকে এই বাহিনীকে সাজিয়ে দিয়ে নিয়াজি বেশ একটু পরিতৃপ্ত হলেন। তার হাতে তখন গুলি গোলাও প্রচুর। নিয়াজি যত সৈন্য চেয়েছিল পাক কর্তৃপক্ষ কখনও তা তাকে দেয়নি, তার চাহিদা মত

ট্যাংক, বিমান ও কামানও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসেনি। কিন্তু পাকিস্তানের কর্তারা নিয়াজিকে গোলা বারুদ দিতে কোনও কার্পণ্য করেনি। যা চেয়েছিল তার চেয়েও বেশি দিয়েছিল। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন থেকে পাঠান প্রচুর গোলাগুলি তখন পাক কর্তৃপক্ষের হাতে।

নিয়াজির নবম ডিভিশন তখন যশোরের ঘাঁটিতে। নবম ডিভিশনের সৈন্যরা সাতক্ষীরা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে দাঁড়াল। ষোড়শ ডিভিশনের হেডকোয়াটার প্রথমে ছিল নাটোরে। সরিয়ে সেটাকে নিয়ে আসা হল বোগুরায়। গংগা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলের সমগ্র সীমান্তে ষোড়শ পাক ডিভিশনের সৈন্যরা বাংকার করে বসল। ১৪ এবং ৩৯নং ডিভিশনের ভাগে পড়ল পূর্ব সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব। উত্তর সীমান্তের জামালপুর থেকে দক্ষিণে কক্সবাজার পর্যন্ত ১৪ এবং ৩৯নং ডিভিশনের সৈন্যরা ছড়িয়ে।

বাংলাদেশে পাক বাহিনীর হাতে ছিল ৮৪টা মারকিন স্যাফি ট্যাংক। আর ছিল শ আড়াই মাঝারি বা ভারী কামান। নিয়াজি তারও সব সীমান্তের কাছাকাছি নিয়ে এল। এবং দৃশ্যমান প্রধান প্রধান ভারতীয় ঘাঁটিগুলির মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য এর প্রায় সব কিছু নিয়ে জড় করল পাঁচটা কেন্দ্রে—চৌগাছা, হিলি, জামালপুর, সিলেট এবং আখাউড়ায়। দুপক্ষই বুঝেছিল যা হওয়ার শীতকালেই হবে। তাই দুপক্ষই অকটোবর-নভেমবরের

মধ্যেই সীমান্তে সৈন্য সামন্ত সাজিয়ে বসল। ওদিকে তখন খোদ পাক সৈন্যবাহিনীও গেরিলাদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত।

গোটা সীমান্ত বরাবর এলাকায় রাত্রে পাক সৈন্যবাহিনীর পক্ষে চলাফেরাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। নিয়াজি বুঝল এবার একটা বড় দরের কিছু না করতে পারলেই নয়। তখন সীমান্তেও তার সৈন্যবাহিনী দাঁড়িয়ে গিয়েছে। নিয়াজির বুকে তাই তখন বেশ বল। হাজার হাজার লোককে বেগার খাটিয়ে গোটা সীমান্ত জুড়ে হাজার হাজার বাংকারও তৈরী হয়ে গিয়েছে। পাক সেনাবাহিনীর লোকজনরা সেই সব বাংকারে পজিশনও নিয়ে নিয়েছে। নিয়াজি তাই নতুন হুকুম দিল: প্রয়োজনে সীমান্তের ওপারে গিয়ে মুক্তিবাহিনীকে ঘায়েল করে এস।

AMARBOI.COM

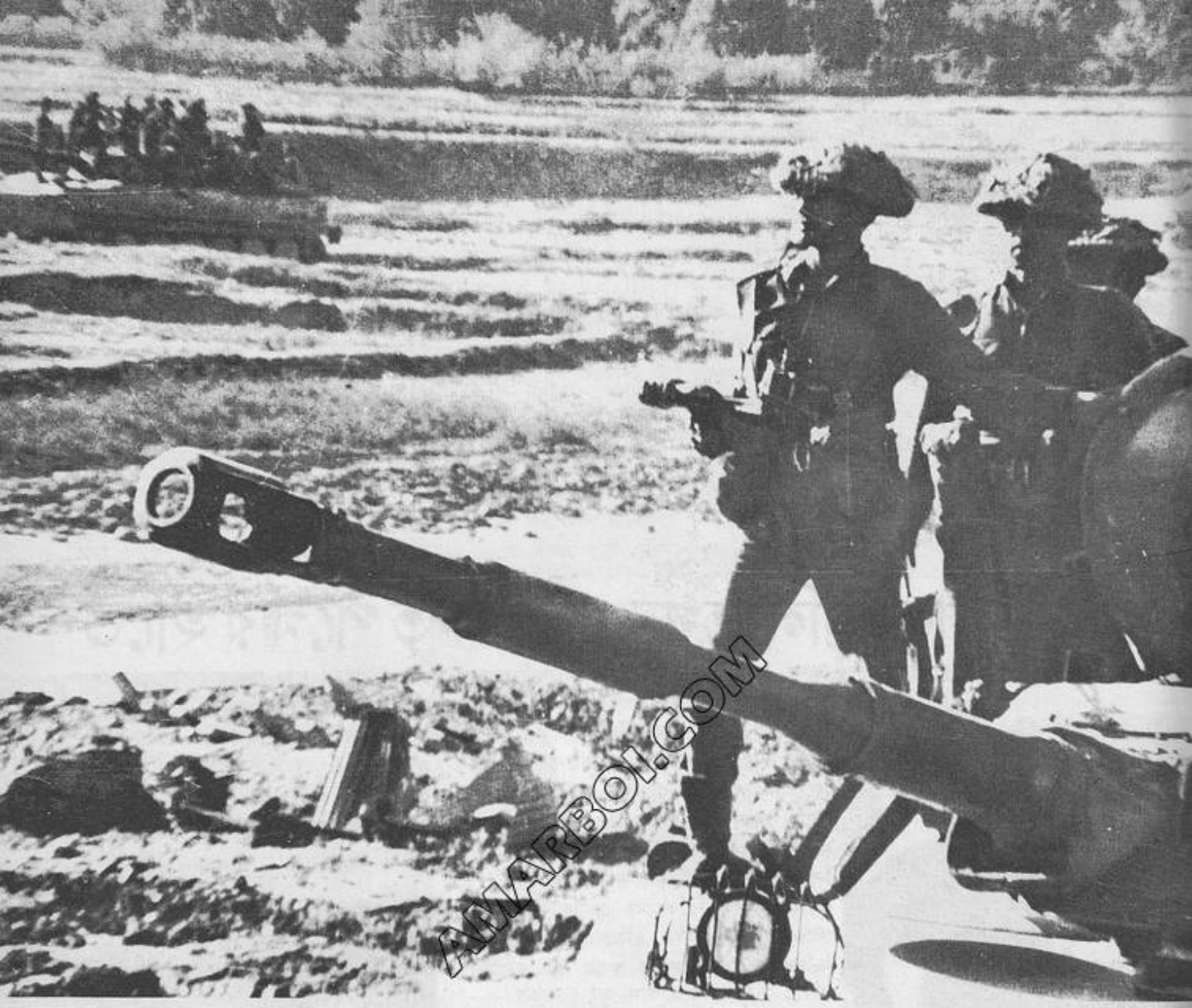

সামনেই বগুড়া। বৈজয়ন্ত ট্যাংক চলেছে বিজয় নিশান তুলতে।

যুদ্ধের পরে ঢাকায় জানা গিয়েছে, এই ব্যাপারে নিয়াজি ইসলামাবাদের কর্তাদেরও সম্মতি নিয়ে নিয়েছিল। নিয়াজি তাদের জানিয়েছিল যে মুক্তিবাহিনীকে তাড়া করলেই তারা ভারতের সীমান্তের মধ্যে ঢুকে যায়। তখন আর কিছুই করা যায় না।
করতে হলে সীমান্ত অতিক্রম করতে হয়।
পাকিস্তানের সামরিক রাষ্ট্রনায়করা তখনও মনে করছে, ভারত কিছুতেই পূর্ণ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে সাহস পাবে না। তাই তারা নিয়াজিকে জানাল, প্রয়োজনে সীমান্তের ওপারে গিয়ে মুক্তিবাহিনীকে ঘায়েল করে এস।
কর্তাদের অনুমতি পেয়ে নিয়াজিও হুকুম পাঠাল সব কটা ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারে: প্রয়োজনে সীমান্ত ক্রস কর।
নিয়াজি আর একটা ফাঁদে পা দিল।
নভেম্বরেই সুরু হয়ে গেল পাক সেনাবাহিনীর ভারতীয় সীমা অতিক্রম। সর্বত্র এই ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করল। চব্বিশ পরগণায়, নদীয়ায়, দিনাজপুরে, কোচবিহারে, আসামের বিভিন্ন প্রান্তে এবং ত্রিপুরার নানা অঞ্চলে।
ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনী অর্থাৎ বি. এস. এফও সঙ্গে সঙ্গে এর প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করল। সুরু হয়ে গেল সীমান্তের বিভিন্ন অঞ্চলে গোলাগুলি বিনিময়। এবং, প্রায় প্রতিদিনই এই জিনিষ বেড়ে চলল।
এর আগে কিন্তু আরও কতকগুলি ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। প্রথম সবচেয়ে বড় ঘটনা হল, পশ্চিমে পাকিস্তানের পূর্ণ সামরিক প্রস্তুতি। অকটোবরেই দেখা গেল পাকিস্তান প্রায় বারো ডিভিশন সৈন্যকে সীমান্তে নিয়ে এসে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছে।
দ্বিতীয় ঘটনা হল, নাশকতামূলক কাজ করার

AMARBOI.COM

জন্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকদের পূর্ব ভারতে ঢুকিয়ে দেওয়া। পশ্চিমবঙ্গে, আসামে এবং ত্রিপুরায় এই রকম কিছু লোকও ধরা পড়ল। তাদের কাছ থেকে জানা গেল যে ওই ধরনের কয়েক হাজার লোককে পাক কর্তৃপক্ষ পূর্ব ভারতে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাদের উপর নির্দেশ ছিল চরম মুহূর্ত এলেই ব্যাপক নাশকতামূলক কাজ সুরু করতে হবে। তাদের এও মোটামুটি বলে দেওয়া হয়েছিল যে ডিসেমবর নাগাদ চরম মুহূর্ত আসবে। এই সব দেখে শুনে ভারত সরকার বুঝেছিলেন, পাকিস্তান যুদ্ধ করবেই। তাই অকটোবর মাসে ভারতীয় প্রস্তুতিও বেশ ত্বরান্বিত করা হল। পূর্ব ভারতেও। পশ্চিম ভারতেও। ভারত তখন যে রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা বা আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছে তা নয়। কিন্তু রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সামরিক প্রস্তুতিও চালিয়ে যাচ্ছিল। পশ্চিমের পাক প্রস্তুতি দেখে এবং নাশকতামূলক কাজের লোক ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত অকটোবরেই মোটামুটি পরিষ্কার বুঝে গিয়েছিল, পাকিস্তান রাজনৈতিক সমাধানের দিকে যাবে না, বরং লড়াই-ই করবে। তাই তখন থেকেই ভারতের প্রস্তুতি জোরদার হয়েছিল।

প্রস্তুতি বিশেষ করে প্রয়োজন ছিল আসাম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরার জন্য। এইদিকে ভারতের প্রায় ষাট হাজার সৈন্যের জন্য রসদ ও গোলাবারুদ প্রয়োজন ছিল। অথচ, এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ত্রিপুরায় অবশ্য বিস্তৃত অঞ্চলে কোনও রেলপথও নেই। মিজো পাহাড়ে-ও প্রস্তুতি প্রয়োজন ছিল। মিজোপাহাড়-বাংলাদেশ সীমান্তে কোনও যানবাহনই পৌঁছতে পারে না। তাছাড়া প্রয়োজন ছিল ব্রিজ তৈরীর নানা সাজসরঞ্জামও। ভারত কখনও এই রকম নদীমাতৃক দেশে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়নি। তাই বাংলাদেশে লড়াই করার কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় প্রতিরক্ষা দফতরকে নদীনালা অতিক্রমের কথাও ভাবতে হল। সেজন্যও প্রয়োজন হল বিরাট প্রস্তুতি। নদীপথে বিরাট বাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন হতে পারে এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী কয়েক হাজার বোটও তৈরী করে রাখল। এরই কিছু বোট রাখা হল ফারাক্কার কাছাকাছি। আর কিছু রাখা হল ব্রহ্মপুত্রে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু এই বোটগুলি আর যুদ্ধের কাজেই লাগেনি।

এই সব ঘটনার পর ভারত সরকার যখন দেখলেন যে পাক বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবাংলা, আসাম, ত্রিপুরার গ্রামগুলির উপর আক্রমণ চালাচ্ছে তখন তাঁদের আর কোনও সন্দেহ রইল না যে, পাকিস্তান যুদ্ধ করতে চায়। তখন থেকে তাই সামরিক প্রস্তুতি আরও বাড়ানো হল।

ওদিকে সীমান্তের এপারে পাক হামলাও দিনকে দিন বেড়ে চলল। ক্রমে ক্রমে ব্যাপারটা অসহ্য হয়ে দাঁড়াল। বাংলাদেশের ভেতরে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ যত বাড়ল, সীমান্তের বিভিন্ন ভারতীয় এলাকায় পাক হামলাও ততই বাড়তে থাকল। প্রচণ্ড গুলিগোলা চলা সুরু হল সীমান্তের নানা অঞ্চলে। পাকিস্তানীরা প্রথম প্রথম হাল্কা মরটার চালাচ্ছিল। ক্রমে তারা ভারী দূরপাল্লার কামান ব্যবহার

AMARBOI.COM

মারকিন খয়রাতির কামান 'গ্রেফতার' করে ভারতীয় জওয়ানরা দর্শনা থেকে এগোচ্ছেন। সেদিন ছিল সোমবার—৫ ডিসেমবর।

দর্শনা পিছনে ফেলে জওয়ানরা এগিয়ে চলেছেন। বাংলাদেশের অলস অপরাহ্ন। খচ্চরের পিঠে লটবহর। নির্দোষ বাবলার ঝাড়, খেজুর গাছ ন' মাসের নির্যাতনের সব জানে—সবকিছুর সাক্ষী।

পাশের ছবিতে ভারতীয় জওয়ানরা চুয়াডাঙ্গার পথে চলেছেন। সেদিন ছিল রবিবার, ৫ ডিসেম্বর। সামনেই কুষ্টিয়া শহর।

AMARBOI.COM

সুরু করল। সীমান্তের ওপারে বসেই পাকিস্তানীরা ভারতীয় সীমান্তের এপারে কামানের গোলা ছুড়ে চলল। তখন তাদের লক্ষ্য আর মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান নয়। তখন তারা সোজা ভারতীয় ঘাঁটির উপর আক্রমণ সুরু করেছে।

নভেম্বরের গোড়ায় পাকিস্তানীরা ত্রিপুরায় প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ সুরু করল। তারা গোলাগুলি চালাল প্রধানত আখাউড়া অঞ্চল থেকে। এই গোলাবর্ষণে কমলপুর শহর এবং আশপাশের কতকগুলি গ্রাম বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হল। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীও নিয়মিত এর জবাব দিল। ওদিকে তখন মুক্তিবাহিনীও ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল লাইন ও সড়ক পথ কেটে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

আখাউড়ার কাছে পাকিস্তানীরা একটা বড় ঘাঁটি করেছিল। এর কারণও ছিল। বাংলাদেশের ট্রেণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় আখাউড়ার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চট্টগ্রাম-ঢাকা-শ্রীহট্ট-ময়মনসিং রেলপথে আখাউড়া প্রধান জংশন। রেলপথ চট্টগ্রাম থেকে এসে আখাউড়ায় দুভাগ হয়ে গিয়েছে। একটা উত্তর পূর্বে চলে গিয়েছে শ্রীহট্টের দিকে। আর একটা মেঘনা নদী ডিঙিগয়ে উত্তরে গিয়েছে ময়মনসিংহের পথে। দক্ষিণে লাইনটা গিয়েছে ঢাকায়। আখাউড়া তাই বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। ভারতের একেবারে লাগোয়া।

পাক সমরনায়করা জানত, সুযোগ পেলেই মুক্তিবাহিনী আখাউড়া দখল করে চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে বাংলাদেশের বাদবাকি অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তারা আরও জানত, লড়াই হলে ভারতীয় সেনাবাহিনীও সঙ্গে সঙ্গে আখাউড়া দখলের চেষ্টা করবে। তাই তারা আখাউড়ায় বেশ একটা শক্ত ঘাঁটি তৈরী করেছিল। এবং, এই শক্ত ঘাঁটি থেকেই ত্রিপুরার নানা এলাকায় অবিরাম গোলাবর্ষণ করছিল।

কিছুটা দক্ষিণে ফেণীর কাছাকাছি তারা আর একটা বড় ঘাঁটি তৈরী করেছিল। একই উদ্দেশ্য, চট্টগ্রাম-ঢাকা-শ্রীহট্ট যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টায় বাধাদান। এই ফেণীর ঘাঁটি থেকেও পাকিস্তানীরা ভারতীয় এলাকার উপর প্রচণ্ড গোলাগুলি চালানো সুরু করল।

পাঁচ ছয়দিন এইভাবে চলার পর ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী দেখল এগিয়ে গিয়ে পাক ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করে দিয়ে না এলে এই গোলা বর্ষণ বন্ধ করা যাবে না। কারণ, পাকিস্তানীরা কনক্রিটের বাঙ্কার তৈরী করে তার ভেতরে বসে গোলা চালাচ্ছে। দূর থেকে

গোলা ছুঁড়ে কনক্রিটের বাঙ্কারকে ঘায়েল করা যাচ্ছে না। তাই পূর্ব সীমান্তের ভারতীয় সৈন্যবাহিনী তখন এগিয়ে গিয়ে পাক ঘাঁটি ধ্বংস করার অনুমতি চাইল দিল্লিতে। সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে দিল্লিও সেই অনুমতি দিয়ে দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হল অ্যাকসন। ৮ নভেমবর ভারতীয় বাহিনী এগিয়ে গিয়ে ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী পাক ঘাঁটিগুলিতে জোর আঘাত হানল। পাকিস্তানীরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। সীমান্তবর্তী ঘাঁটিগুলি ছেড়ে তাদের পালাতে হল।

এই অ্যাকসনের দুটো প্রত্যক্ষ ফল হল। প্রথমত, ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকার উপর কামানের গোলা বর্ষণের ততটা ক্ষমতা আর পাকিস্তানীদের থাকল না। দ্বিতীয়ত, মুক্তি বাহিনীও আরও জোরে পাক বাহিনীর উপর আক্রমণ করার সুযোগ পেল। কারণ, পাক বাহিনী তখন শক্ত ঘাঁটি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে।

গোলাগুলি বিনিময় যেমন বাংলাদেশের পূর্ব প্রান্তে চলছিল তেমনি চলছিল পশ্চিম প্রান্তেও। পশ্চিম প্রান্তে সবচেয়ে বেশি চলছিল তিনটি এলাকায়—বালুরঘাটে, গেদেতে এবং বয়রায়। অকটোবরের শেষ থেকে প্রায় প্রতিদিনই পাক বাহিনী এই অঞ্চলে হানা দিচ্ছিল। বিভিন্ন ভারতীয় গ্রামের লোক পাক গোলা বর্ষণের ফলে মারাও যাচ্ছিলেন। নভেমবরের প্রথম সপ্তাহ থেকে পাকিস্তানীরা এই তিনটি ঘাঁটির উপর বড় বড় কামানের গোলা বর্ষণ সুরু করল। ভারতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনী এবং সীমান্ত রক্ষীরা তার জবাবও দিচ্ছিল। কিন্তু এখানেও সেই একই সমস্যা দেখা দিল। পাকিস্তানীরা বাঙ্কারের মধ্যে বসে দূর পাল্লার কামান চালাচ্ছে। কখনও কখনও সেই কামানের গোলাবর্ষণের আড়ালে এসে ভারতীয় গ্রামগুলির উপরও আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে বাধ্য হয়ে এখানেও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে এগিয়ে যেতে হল।

বয়রা অঞ্চলে সীমান্ত হল কপোতাক্ষ নদী। বয়রা থেকে একেবারে সোজা মাইল বারো-তেরোর মধ্যেই যশোর ক্যানটনমেনট। ভারতীয় সেনাবাহিনী কপোতাক্ষের পশ্চিম পারে জড় হতেই যশোর ক্যানটনমেনট থেকে পাক সেনাবাহিনীও এগিয়ে এসেছিল। কনক্রিটের অসংখ বাঙ্কারও তৈরী করেছিল। এবং, সেইসব বাঙ্কার থেকেই গোলা চালাচ্ছিল। ভারতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনী তখন দিল্লির নতুন

সীমান্তে বাঙ্কার থেকে পাক-গোলার অবিরাম হানা

AMARBOI.COM

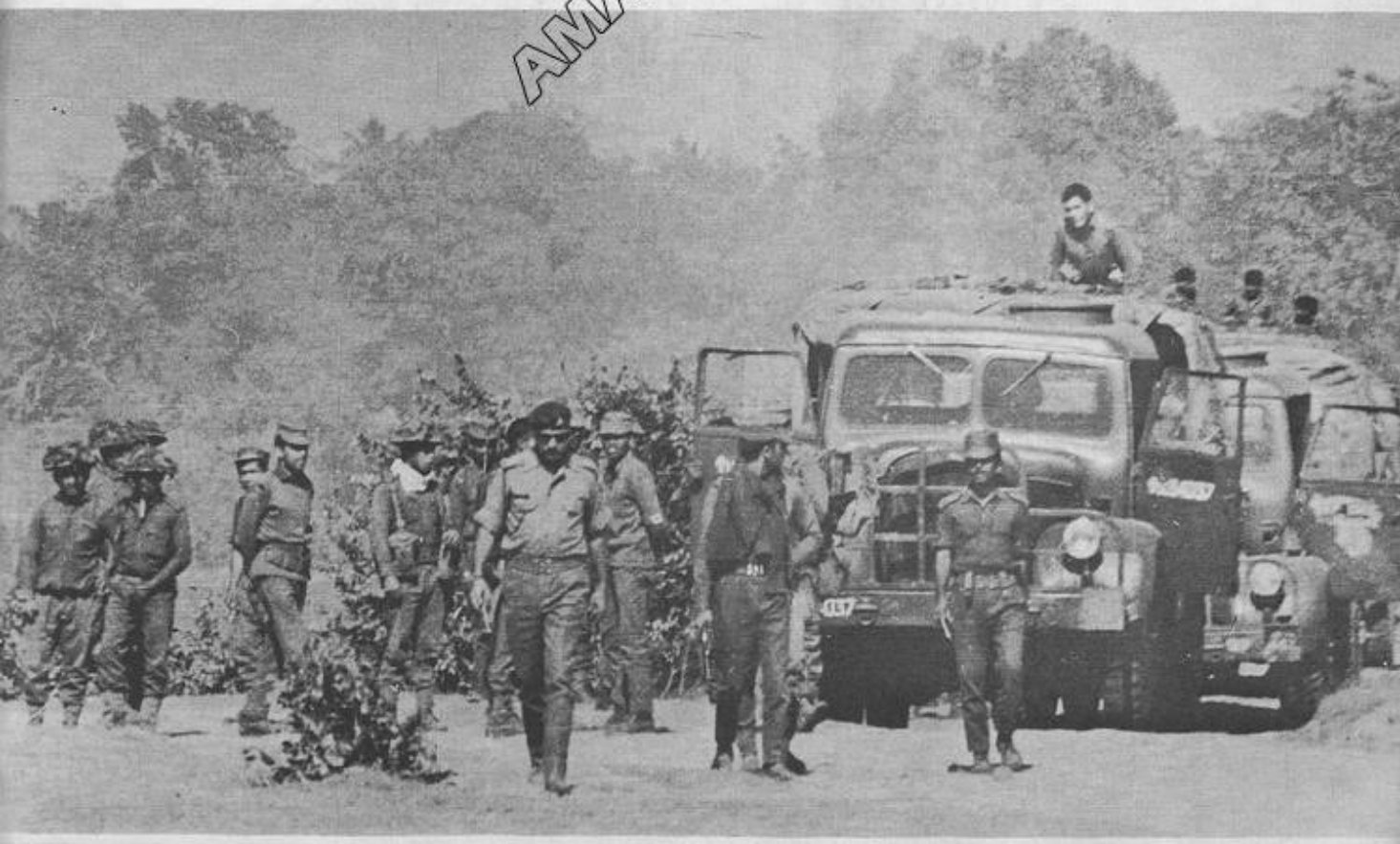

নির্দেশ পেয়ে গিয়েছে। সেই নির্দেশের মর্মকথা, প্রয়োজন হলে সর্বত্র এগিয়ে গিয়ে ওদের ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করে দিয়ে আসবে। যেন ওইসব ঘাঁটি থেকে আক্রমণ চালিয়ে ওরা না এপারের মানুষ মারতে পারে। ভারতীয় বাহিনী তাই কপোতাক্ষ অতিক্রম করে এগিয়ে গেল। সেদিন ২১ নভেম্বর।

ওদিক থেকে এগিয়ে এল পাকবাহিনীও। সঙ্গে নিয়ে এল ১৪টা চীনা স্যাফি ট্যাঙ্ক। ভারী ভারী কামান। এবং, প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্য।

সুরু হল তুমুল লড়াই। ভারতীয় বাহিনীও বাধ্য হয়ে ট্যাঙ্ক নিয়ে এসেছিল। ট্যাঙ্কে, কামানে, মেসিনগানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হওয়ার পর দেখা গেল প্রথম রাত্রির লড়াইয়ের শেষে পাকিস্তানের ছটা স্যাফি ট্যাঙ্কই ঘায়েল। গোটা আটেক পিছু হটে পালিয়েছে। ভারতীয় বাহিনী কিন্তু সেখানেই পাক বাহিনীকে ছাড়ল না। আরও এগিয়ে গেল। জগন্নাথপুর এবং গরীবপুর ছাড়িয়ে। পাক সেনাবাহিনী ওখানেও বেশ শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরী করেছিল। দ্বিতীয় দিন আরও বড় লড়াই হল। এবং সেখানে আরও সাতটা পাকিস্তানী স্যাফি ট্যাঙ্ক ঘায়েল হল। দ্বিতীয় দিনের লড়াইয়ে পাকিস্তান তার বিমান বাহিনীকে পুরোপুরি ভাবে আসরে নামাল। প্রথম দিনের লড়াইয়েই পাক বিমানবাহিনী যোগ দিয়েছিল। কিন্তু বেশি ক্ষণের জন্য নয়। ভারতীয় বিমানবাহিনী আসার আগেই তারা পালিয়ে যায়। দ্বিতীয় দিন পাক বিমানবাহিনীর বিমান আকাশে ওড়া মাত্র ভারতীয় বিমানও আকাশে উড়ল। সুরু হল বিমান যুদ্ধ। দুপুর বেলা। তিনখানা পাক স্যাবার জেট ধ্বংস হল সেই লড়াইয়ে।

তেরটা ট্যাঙ্ক, তিনখানা বিমান এবং বেশ কিছু সৈন্য সামন্ত হারিয়ে পাক সেনাবাহিনী রণে ভঙ্গ দিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী আর এগোলো না। কারণ, তখনও দিল্লি থেকে তেমন নির্দেশ আসেনি। তবে, জগন্নাথপুর আর গরীবপুর ছেড়েও তারা চলে এল না। ওইখানেই ঘাঁটি গেড়ে বসে রইল।

এখানেও একই ফল হল। ভারতীয় গ্রামের উপর গোলাবর্ষণ বন্ধ হল। মুক্তিবাহিনী যশোর ক্যানটনমেনটের চতুর্দিকে আক্রমণ করার সুযোগ পেল।

এই পর্যায়ে তৃতীয় বড় লড়াই হয় বালুরঘাটে। পুবে যেমন আখাউড়া পশ্চিমে তেমনি হিলি। বালুরঘাট অঞ্চলটা একটা কুঁজের মত এগিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশের ভেতরে। এই কুঁজেরই শীর্ষবিন্দু হল হিলি। হিলি শহরটা পশ্চিম বাংলার ভেতরে, কিন্তু হিলি রেল ষ্টেশন বাংলাদেশের মধ্যে। এই হিলি ষ্টেশন হয়েই চলে গিয়েছে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রেলপথ—যে রেলপথ বাংলাদেশের উত্তর খণ্ডের সঙ্গে বাদবাকি অঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষা করছে।

মুক্তিযুদ্ধ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকবাহিনী বুঝল মুক্তিসেনারা এই রেলপথটা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে। তাই, সুরু থেকেই তারা হিলি ষ্টেশনে একটা শক্ত ঘাঁটি তৈরী করল। মুক্তিসেনারা কিন্তু তৎসত্ত্বেও সুরু থেকেই হিলির উপর আক্রমণ চালাচ্ছিল। অকটোবরের শেষাশেষি ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীও বালুরঘাট অঞ্চলে একটা

কৃষ্টিয়ায় হেরে গিয়ে পাক আর্মি পাবনায় পালিয়েছে। পদ্মা পেরোবার সময় হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ওড়াতে চেয়েছিল। তাড়াতাড়ি শুধু একটা গার্ডার ওড়াতে পেরেছে।

AMARBOI.COM

বড় ঘাঁটি তৈরী করল। পাকিস্তানীরাও ততদিনে হিলির ঘাঁটি আরও শক্ত করেছে। খুব বড় বড় এবং বেজায় মজবুত অসংখ্য বাঙ্কার তৈরী করেছে হিলির চতুর্দিকে। এমনকি রেল ওয়াগন দিয়েও ওরা কয়েকটা শক্ত বাঙ্কার তৈরী করেছিল।

সমগ্র সীমান্তে যখন প্রবল উত্তেজনা এবং গোলাগুলি চলছে সেই সময় পাকিস্তানী সৈন্যরা ঐ কুঁজের উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে বালুরঘাটের উপর প্রচন্ড গোলাবর্ষণ সুরু করল। প্রথম প্রথম কয়েকদিন ব্যাপারটা শুধু গোলাবর্ষণে সীমাবদ্ধ রইল। তারপর তারা এগোবার চেষ্টা করল তাদের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে। সে উদ্দেশ্য, দক্ষিণ দিক থেকে প্রচন্ড আক্রমণ করে ঐ কুঁজটা কেটে দেওয়া এবং ওইভাবে বালুরঘাটের ভারতীয় সামরিক ঘাঁটিটাকে মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। এজন্য তারা বাংলাদেশের ধামরাহাট এবং সাপাথের মাঝামাঝি অঞ্চল থেকে ট্যাঙ্ক এবং ভারী কামান নিয়ে ভারত।র এলাকায় ঢুকে পড়ারও চেষ্টা করল।

ওদিকে ভারতীয় বাহিনীও তখন চুপচাপ বসে নেই। কুঁজের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি দেখেই তারা শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্যটা বুঝে গিয়েছিল। এবং সেইমত প্রস্তুতও হচ্ছিল।

নভেমবরের শেষাশেষি এই অঞ্চলে একটা পুরোদমের লড়াই-ই সুরু হয়ে গেল। প্রথম প্রথম ভারতীয় সেনাবাহিনী শুধু ঘাঁটিতে বসেই পাকিস্তানী গোলার জবাব দিচ্ছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে ওরা ট্যাঙ্ক নিয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করল, ভারতীয় বাহিনীও তখন ট্যাঙ্ক নিয়েই এগিয়ে গেল। ২৫, ২৬ ও ২৭ নভেমবর গোটা অঞ্চল জুড়ে বড় দরের ট্যাঙ্কের লড়াই হয়ে গেল। এবং শেষ দিনের লড়াইয়ে পাক সেনারা এত মার খেল যে ধামরাহাটের দিক থেকে পালাতে বাধ্য হল। এই যুদ্ধে পাকিস্তান মোট পাঁচটা ট্যাঙ্ক হারাল। কিন্তু ট্যাঙ্ক হারিয়ে বা লড়াইয়ে বড় মার খেয়েও পাকবাহিনী হিলি ষ্টেশনের ঘাঁটি ছাড়তে চাইল না। ভারতীয় সেনাবাহিনী অবশ্য হিলি ষ্টেশন দখল করার জন্য তেমন

হার্ডিঞ্জ ব্রিজের ওপর পাক ফৌজের একটা ভারি খোঁড়া ট্যাংক।

ভাবে অগ্রসরও হল না।
এইভাবে গোটা সীমান্তে অঘোষিত লড়াই চলতে চলতেই সুরু হয়ে গেল পুরোপুরি যুদ্ধ—ঘোষিত পাক-ভারত লড়াই। এবং লড়াই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের চতুর্দিক দিয়ে এগিয়ে গেল ভারতীয় সেনাবাহিনী আর বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা।
নিয়াজি তখন চোখে সর্ষে ফুল দেখল। এবং এই সর্ষে ফুল দেখার ফলেই বাংলাদেশের পাক সেনানায়ক ইসলামাবাদ থেকে পূর্ণ যুদ্ধের আগাম খবর পেয়েও তার রণকৌশল পাল্টালো না। তখনও তার সেনাবাহিনী এবং কামান বন্দুক গোটা দেশের সীমান্তেই ছড়ানো রইল। এবং তখনও নিয়াজি সীমান্তেই ভারতীয় সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য ব্যগ্র। এর মধ্যেও কিছুটা বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিল পাক নবম ডিভিশনের প্রধান জেনারেল আনসারি। তার সদর ঘাঁটি ছিল যশোর ক্যানটনমেনটে। ৩ ডিসেমবরই যশোর থেকে নবম পাক ডিভিশনের ঘাঁটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল আরও বেশ কিছুটা ভেতরে—মাগুরায়। শোনা যায় সেটাও প্রধানত কামানের গোলা খাওয়ার ভয়ে। গরীবপুরের লড়াইয়ের পর খোদ যশোর ক্যানটনমেনট ভারতীয় কামানের রেঞ্জের মধ্যে এসে গিয়েছিল। নবম পাক ডিভিশনের হেড কোয়াটার যশোর থেকে সরল; কিন্তু সৈন্যসামন্ত যেমন সীমান্তে ছিল তেমনি রইল। তখনও পাক সেনা নায়কদের সংকল্প, বাঙ্কারে বসে বসে গোলা চালিয়েই পাক সৈন্যরা ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর অগ্রগতি রোধ করবে!
যেকোনও মুহূর্তে পাকিস্তান সর্বশক্তি দিয়ে ঝাপিয়ে পড়তে পারে এখবর নভেমবরের শেষ দিকেই ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী পেয়েছিল। তাই যে কোনও মুহূর্তে লড়াইয়ে নামার জন্য ভারতীয় সেনা, বিমান এবং নৌবাহিনীও প্রস্তুত ছিল। ৩ ডিসেমবর সন্ধ্যায় পাক বিমানবাহিনী যখন অতর্কিতে ভারতের উপর ঝাপিয়ে পড়ল তখন তার জবাব পেতেও মোটেই দেরি হল না। দুই সীমান্তেই জবাব পেল সঙ্গে সঙ্গে। পূর্বেও। পশ্চিমেও।

সুরু হল পুরো যুদ্ধ। এবং সেই সঙ্গেই সুরু হল প্রতিদিনের যুদ্ধের ইতিহাস

AMARBOI.COM

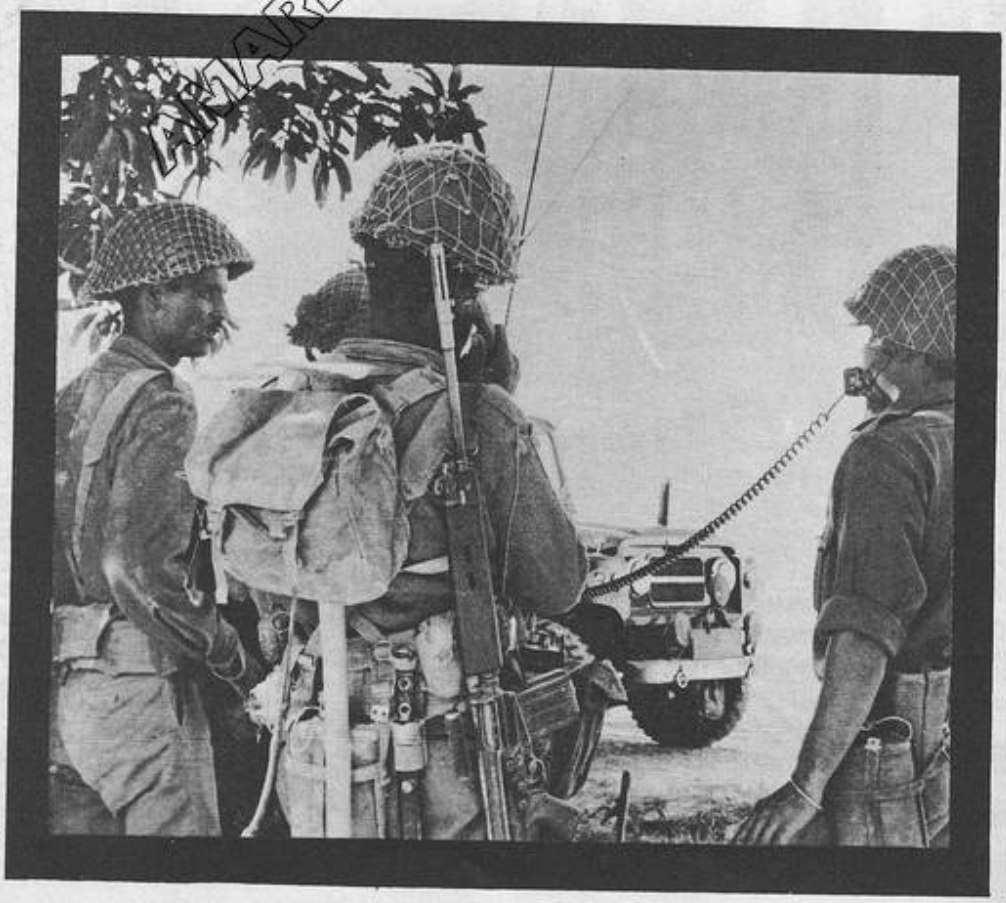

রবিবার। ১১ ডিসেম্বর। ভারতীয় জওয়ানরা গোরাঘাট থেকে ছত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন।

৩ ডিসেম্বর

ফোর্ট উইলিয়ম থেকে সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৩ তারিখ রাত্রেই ভারতীয় সেনাবাহিনী চতুর্দিক দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ল।

নবম ডিভিশন এগোলো গরীবপুর, জগন্নাথপুর দিয়ে যশোর-ঢাকা হাইওয়ের দিকে।

চতুর্থ ডিভিশন মেহেরপুরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল কালীগঞ্জ-ঝিনাইদহের দিকে। বিংশতিতম ডিভিশন তার দায়িত্ব দুভাগে বিভক্ত করে নিল—একটা অংশ রইল হিলির পাক ঘাঁটির মোকাবিলা করার জন্য। আর একটা অংশ হিলিকে উত্তরে রেখে এগিয়ে চলল পূবে। ষষ্ঠ ডিভিশনও তিনভাগে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হল—একটা তেতুলিয়া থেকে ঠাকুরগাঁর দিকে, আর একটা পাটগ্রাম থেকে কালীগঞ্জের মুখে এবং তৃতীয়টা কোচবিহার থেকে নাগেশ্বরী-কুড়িগ্রামের দিকে।

উত্তরে মেঘালয়ের দিকে যে দুটো ব্রিগেড তৈরী হয়েছিল তারাও ওই রাত্রিতেই এগিয়ে গেল। একটা ডালু থেকে নেমে এগিয়ে গেল জামালপুরের দিকে। আর একটা, এক বিশেষ উদ্দেশ্যে, একটু এগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল হালুয়াঘাটের মুখোমুখি।

পূর্ব দিক থেকেও একই সঙ্গে ৮, ৫৭ এবং ২৩নং ডিভিশন নানাভাগে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশে ঢুকল। একটা বাহিনী এল সোনামগঞ্জ থেকে সিলেটের দিকে। ছোট ছোট তিনটা বাহিনী এগিয়ে চলল হবিগঞ্জ এবং মৌলভীবাজারের পথে। আখাউড়াকে সোজাসুজি আঘাত করে একটা গোটা ব্রিগেডই এগিয়ে চলল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে।

ওদিকে কুমিল্লায় ময়নামতি ক্যানটনমেনটে পাকিস্তানীদের বেশ একটা শক্ত ঘাঁটি ছিল। কুমিল্লা সেকটরের দায়িত্ব ছিল আমাদের ২৩নং ডিভিশনের উপর। যুদ্ধ সুরু হতেই ২৩নং ডিভিসন কুমিল্লা শহরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল দাউদকান্দির দিকে।

ময়নামতি ক্যানটনমেনটের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য রেখে গেল মাত্র কয়েক কোম্পানী সৈন্যকে। এই ২৩নং ডিভিশনেরই আর একটা ব্রিগেড চৌদ্দগ্রাম থেকে অগ্রসর হল লাকসামের দিকে। লক্ষ্য চাঁদপুর। পাক বাহিনীও এই আক্রমণ আঁচ করে লাকসামে একটা শক্ত ঘাঁটি তৈরী করে রেখেছিল। এখানেও ভারতীয় বাহিনী সেই একই কৌশল নিল।

লাকসামের পাক ঘাঁটিকে ব্যস্ত রাখার জন্য একটা ছোট্ট বাহিনীকে রেখে মূল কলামটা এগিয়ে চলল চাঁদপুরের দিকে।

পূবে আর একটা বড় বাহিনী এগোলো বিলোনিয়া দিয়ে ফেণীর দিকে। লক্ষ্য চট্টগ্রামে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেওয়া। এই বাহিনীরও সেই একই কৌশল। ফেণীতে পাকিস্তানীরা বেশ শক্ত ঘাঁটি তৈরী করেছিল। সুরুতেই সেই ঘাঁটি দখল করার জন্য ভারতীয় বাহিনী কোনও চেষ্টা করল না। একটা ছোট্ট বাহিনীকে রেখে যাওয়া হল ফেণীর পাক সৈন্যদের ব্যস্ত রাখার জন্য। আর মূল বাহিনীটা পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল দক্ষিণ পশ্চিমে।

পশ্চিম প্রান্তে বিমান হামলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিমান এবং নৌবাহিনীও আসরে নেমে পড়ল। বাংলাদেশে ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীর অ্যাকসন সুরু হল ৩রা মধ্যরাত্রি থেকে। বিমান ও নৌবাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে গিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন পাক ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালাল। প্রধান লক্ষ্য ছিল অবশ্য ঢাকা আর চট্টগ্রাম। ঢাকা ছিল পাক বিমানবাহিনীর প্রধান ঘাঁটি। এই ঘাঁটিতেই ছিল তাদের জঙ্গী বিমানগুলি। প্রথমে বাংলাদেশে পাক বিমানবাহিনীতে ছিল দুই স্কোয়াড্রন বা ২৮টা জঙ্গী বিমান—এক স্কোয়াড্রন চীনা মিগ-১৯, আর এক স্কোয়াড্রন মারকিনী স্যাবার জেট।

যুদ্ধ সুরু হওয়ার কিছু দিন আগে ইয়াহিয়া খাঁর নির্দেশে মিগ-১৯ বিমানগুলি পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হল। বাংলাদেশে থাকল শুধু স্যাবারগুলি। তারও কয়েকটা ঘায়েল হয়ে গিয়েছিল বয়রার লড়াইয়ে।

বাংলাদেশে কাজে নেমেই ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রধান লক্ষ্য হল পাকিস্তানী জঙ্গী বিমানগুলিকে শেষ করে দেওয়া। যাতে অন্তরীক্ষে শত্রুপক্ষ কিছুই না করতে পারে। যাতে লড়াইয়ের সুরুতেই আকাশটা মিত্রপক্ষের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ৩রা মধ্যরাত্রে ভারতীয় বিমানবাহিনী একেবারে তেজগাঁও বিমান বন্দর আক্রমণ করল। ঐ বিমান বন্দরেই পাকিস্তানের সব স্যাবারজেট মজুত ছিল। কারণ গোটা বাংলাদেশে তখন ওই একটি মাত্র বিমান বন্দর যেখান থেকে জেট বিমান উড়তে পারে।

AMARBOI.COM

ভারতীয় মিগ সেই ঘাঁটিতে হানা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানী স্যাবার জেটগুলিও বাধা দিতে এগিয়ে এল। প্রায় সারারাত ধরে চলল ঢাকার বিমানযুদ্ধ। প্রথম রাত্রির আক্রমণেই পাকবাহিনীর অর্ধেক বিমান ধ্বংস হয়ে গেল। বিমান বন্দর এবং কুরমিটোলা ক্যানটনমেনটও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীর বিমানগুলি সেদিন যে শুধু ঢাকা আক্রমণ করেছিল তাই নয়। আক্রমণ করেছিল কুমিল্লা, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ককসবাজার প্রভৃতি এলাকায়ও। চট্টগ্রাম, চালনা, ককসবাজার এবং চাঁদপুরের অভিযান চালিয়েছিল প্রধানত নৌবাহিনীর বিমানগুলি। চট্টগ্রাম নৌবন্দরের প্রায় অর্ধেকটাই ধ্বংস হয়ে গেল। বন্দরের তেলের ডিপোগুলিও জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে।

এর মধ্যে পাক বিমানবাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি একবার কলকাতা শহরেও হানা দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু প্রতিবারই তাদের ফিরে যেতে হল। আমাদের বিমানবাহিনীর বিমানগুলি সেদিন প্রায় সারা রাত ধরে কলকাতা শহরকে পাহারা দিয়েছিল।

AMARBOI.COM

৪ ডিসেম্বর

৪ ডিসেম্বর সকালে প্রতিরক্ষা দফতরের প্রধানরা আলোচনায় বসে দেখলেন ভারতীয় বাহিনী পূর্বখণ্ডে ঠিক ঠিকই এগিয়েছে।

প্রথমত, তারা কোথাও শহর দখলের জন্য অগ্রসর হয়নি।

দ্বিতীয়ত, কোথাও শক্ত পাক ঘাঁটির সঙ্গে বড় লড়াইয়ে আটকে পড়েনি।

তৃতীয়ত, পাকিস্তানী সমরনায়করা তখনও বুঝতে পারেনি ভারতীয় বাহিনী ঠিক কোন্ দিক দিয়ে ঢাকা পৌঁছতে চাইছে। বরং, তখনও তারা মনে করছে ভারতীয় বাহিনী সব দিক দিয়েই রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এবং, তখনও ভাবছে ভারতীয় বাহিনী সীমান্তের মূল পাক ঘাঁটিগুলির উপরই আক্রমণ চালাবে।

চতুর্থত, ব্যাপক বিমান এবং স্থল আক্রমণে শত্রুপক্ষকে একেবারে বিহ্বল করে দেওয়া গিয়েছে।

পঞ্চমত, পাক বিমানবাহিনীকে অনেকটা ঘায়েল করে ফেলা হয়েছে। তাদের বিমান ঘাঁটিগুলিও বিধ্বস্ত।
ষষ্ঠত, পাকিস্তানের প্রধান নৌবন্দরগুলি অর্থাৎ চট্টগ্রাম, ককসবাজার, চালনা, চাঁদপুর এবং নারায়ণগঞ্জে জাহাজ বা ষ্টীমার ভেড়াবার ব্যবস্থাও অনেকটা বিপর্যস্ত। এবং
সপ্তমত, বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক এবং বাড়িঘরও মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।
সেনা, বিমান এবং নৌবাহিনী তাই যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনেও পূর্ব লক্ষ্য মতই এগিয়ে চলল।
পশ্চিম দিক থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তিফৌজের সব ক'টা কলাম পূবে এগিয়ে চলল। কিন্তু কোথাও তারা সোজাসুজি পাক ঘাঁটিগুলির দিকে এগোলো না। মূল বাহিনী সর্বদাই ঘাঁটিগুলিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল। এবং, ঘাঁটিতে অপেক্ষমান পাকবাহিনী যাতে মনে করে যে ভারতীয় বাহিনী তাদের দিকেই এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে সেইজন্য প্রত্যেক পাক ঘাঁটিতে অবিরাম গোলাবর্ষণও চলতে থাকল।
এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পাক ঘাঁটির সামনে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর কিছু কিছু লোক রেখে যাওয়া হল।

জওয়ানরা যশোর পিছনে ফেলে ছুটে চলেছেন। জিপগাড়িতে রিকয়েললেস গান —বনেটের নীচেই ক্যামুফ্লেজের জাল গোটানো।

ওদিকে মূল ভারতীয় বাহিনী যে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানীরা সে খবরও পেল না। কারণ, প্রথমত, তাদের সমর্থনে দেশের লোক ছিল না, যারা খবরাখবর দিতে পারে।
দ্বিতীয়ত, তাদের বিমানবাহিনীও তখন বিধ্বস্ত। দেশের সর্বত্র উড়ে পাক বিমান ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতির খবরাখবর পাক সেনাবাহিনীকে জানাতে পারল না।
তৃতীয়ত, বাংলাদেশে পাক বাহিনীর বেতারে খবরাখবর-পাঠাবার ব্যবস্থাও তেমন ভাল ছিল না। সুতরাং, নিজস্ব ব্যবস্থায়ও তারা খবরাখবর পেল না।
তাই ভারতীয় বাহিনী যখন সোজাসুজি যশোর, হিলি, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, ফেণী প্রভৃতি শক্ত পাক ঘাঁটির দিকে না গিয়ে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল তখন পাক বাহিনীর অধিনায়করা তা মোটেই বুঝতে পারল না। বরং, ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবর্ষণের বহর দেখে তখনও তারা মনে করছে ভারতীয় বাহিনী সোজাসুজিই এগোবার চেষ্টা করছে। সেইজন্য তখনও তারা মূল সড়কগুলি আগলে বসে রইল। সীমান্তের কাছাকাছি শহরগুলিতে তখনও পাক বাহিনী অধিষ্ঠিত— একমাত্র কুষ্টিয়া জেলার দর্শণা ছাড়া।
দর্শণা যে মুহূর্তে আমাদের ৪নং পার্বত্য ডিভিশনের কামানের পাল্লার মধ্যে এসে গেল পাকিস্তানীরা অমনি শহর ছেড়ে আরও পশ্চিমে পালাল।
এদিকে তখন ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীও প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। লড়াইয়ের দ্বিতীয় দিনেও ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি বার বার ঢাকা, চট্টগ্রাম, চালনা প্রভৃতি এলাকায় সামরিক ঘাঁটিগুলির ওপর আক্রমণ চালাল। ঢাকায় সেদিনও জোর বিমান যুদ্ধ হল। কিন্তু সেইদিনই প্রায় শেষ বিমান যুদ্ধ। অধিকাংশ পাক বিমানই ঘায়েল হল। বিমান বন্দরগুলিও প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হল।
ওদিকে তখন মিত্রবাহিনীও প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রধান সড়ক এবং পাক ঘাঁটিগুলি এড়িয়ে। তখনও পর্যন্ত প্রধান লক্ষ্য, বাংলাদেশের চতুর্দিকে ছড়ানো পাকবাহিনীকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া এবং আবার যাতে একত্র হয়ে ঢাকা রক্ষার জন্য কোনও বড় লড়াইয়ে নামতে না পারে তার ব্যবস্থা করা।

AMARBOI.COM

৫ ডিসেম্বর

লড়াইয়ের তৃতীয় দিনেই স্বাধীন বাংলার আকাশ স্বাধীন হয়ে গেল। বাংলাদেশে পাক বিমানবাহিনীর প্রায় সব বিমান এবং বিমান বন্দরই তখন বিধ্বস্ত। গোটা দিন ভারতীয় জঙ্গী বিমানগুলি অবাধে আকাশে উড়ে পাক সামরিক ঘাঁটিগুলিতে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাল। ভারতীয় বিমানবাহিনীর হিসাব মত বারো ঘণ্টায় দু'শ ত্রিশবার। তেজগাও এবং কুরমিটোলা বিমানঘাঁটিতে পঞ্চাশ টনের মত বোমা ফেলল। কুরমিটোলা রানওয়েতে গোটা কয়েক হাজার পাউণ্ড বোমা ফেলায় ছোটখাটো কয়েকটা পুকুরই সৃষ্টি হয়ে গেল! পাক বিমানবাহিনীর শেষ স্যাবার জেট তিনটা ঐখানে আটকে ছিল। রানওয়ে বিধ্বস্ত হওয়ায় ছাউনিতেই সেগুলিকে আটকে থাকতে হল। ভারতীয় বিমানের আক্রমণে সেদিন বড় রাস্তা দিয়ে পাক সেনাবাহিনীর যাতায়াতও প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। পাকবাহিনীর প্রত্যেকটা কনভয়ের উপর ভারতীয় জঙ্গী বিমানগুলি আক্রমণ চালাল। ওদের নব্বুইটা গাড়ি ধ্বংস হল। ধ্বংস হল পাকিস্তানী সৈন্য বোঝাই বেশ কয়েকটা লঞ্চ এবং ষ্টীমারও। জামালপুর আর ঝিনাইদহের পাক সামরিক ঘাঁটিও ভারতীয় বিমানের আক্রমণে বিধ্বস্ত হল। তেজগাঁও এবং কুরমিটোলার বিমানবন্দর ধ্বংস করে ভারতীয় জঙ্গী বিমানগুলি সারাদিন ধরে গোটা বাংলাদেশের সবকটা বিমানবন্দরে হানা দিল। উদ্দেশ্য, আর কোথাও পাক বিমান আছে কিনা খুঁজে দেখা। কিন্তু কোথাও আর একটিও পাক বিমান খুঁজে পাওয়া গেল না। পরে নিজেদেরই অর্থাৎ মিত্রপক্ষেরই কাজে লাগবে এই ভেবে ভারতীয় বিমানবাহিনী অধিকাংশ বিমান বন্দরকেই অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দিল। পূর্ব খণ্ডে ভারতীয় নৌবাহিনীও সেদিন বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। বঙ্গোপসাগরে পাক সাবমেরিন গাজী সেদিন ভারতীয় নৌবাহিনীর আক্রমণে শেষ হল। সাবমেরিন গাজী ছিল পাক নৌবহরের গর্বের বস্তু। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ধার হিসাবে পাওয়া। মূল মার্কিনী নাম ছিল ইউ. এস. এস ডায়াবলো। পাক নৌবহরে যোগ দেওয়ার পর পাল্টে নাম রাখা হয় গাজী—ধর্মযুদ্ধে জয়ী। পাকিস্তানের অধর্মের যুদ্ধে সেই গাজীর সলিল সমাধি হল।

ওই দিন ভারতীয় নৌবাহিনী প্রত্যেকটা নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জাহাজকে হুঁশিয়ার করে দিল। প্রধান হুঁশিয়ারীটা চট্টগ্রাম বন্দর সম্পর্কে। বলা হল ঃ আপনারা সবাই চট্টগ্রাম বন্দর ছেড়ে চলে আসুন। আপনাদের স্বার্থ এবং নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আমরা শনিবার চট্টগ্রামের উপর তেমন প্রচণ্ডভাবে গোলাবর্ষণ করিনি। আজ রবিবার আপনাদের বন্দর থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। কাল সোমবার আমরা প্রচণ্ডভাবে চট্টগ্রামে আক্রমণ চালাব। সুতরাং কাল থেকে আপনাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে আমরা কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারব না। এই ওয়ার্ণিং-এ দুটো কাজ হল। (এক) বিশ্বের সব দেশ বুঝল বাংলাদেশের বন্দরগুলি রক্ষা করার কোনও ক্ষমতা আর পাকবাহিনীর নেই। এবং, (দুই) ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ ও বিমানগুলি বাংলাদেশের সব বন্দরকে ঘায়েল করার অবাধ সুযোগ পেল। এদিকে তখন স্থলে মিত্রবাহিনীও এগিয়ে চলেছে। পাক স্থলবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন। প্রধান সড়কগুলি দিয়ে না এগিয়েও ভারতীয় বাহিনী বিভিন্ন সেকটরে প্রধান প্রধান

AMARBOI.COM

সড়কের কতকগুলি এলাকায় অবরোধ সৃষ্টি করল। ফলে, ঢাকার সঙ্গে কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের, নাটোরের সঙ্গে ঢাকা ও রঙপুরের এবং যশোরের সঙ্গে নাটোর ও রাজসাহীর যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। শুধু ঢাকার সঙ্গে যশোর এবং খুলনার যোগাযোগ তখনও অব্যাহত।

কতকগুলি ঘাঁটিতে সেদিন কিছুটা লড়াইও হল। একটা বড় লড়াই হল লাকসামে। আর একটা হল ঝিনাইদহের কাছে কোটচাঁদপুরে। দুটো লড়াইয়েই পাক সৈন্যরা বেজায় মার খেল এবং ঘাঁটি দুটো ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হল।

এই দুটো ঘাঁটি দখলের চেয়েও কিন্তু মিত্রবাহিনীর বড় লাভ হল পাকবাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থাটা প্রায় বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারায়। এইটাই ছিল প্রথম পর্যায়ে তাদের বড় লক্ষ্য। যাতে পাক সেনাবাহিনী কিছু হটে গিয়ে আবার না রিগ্রুপড হতে পারে—ঢাকা রক্ষার লড়াইয়ের জন্য পদ্মা ও মেঘনার মাঝখানে কোনও নতুন শক্ত ব্যূহ না রচনা করতে পারে। বিভিন্ন বড় সড়কে অবরোধ সৃষ্টি করে মিত্রবাহিনী সীমান্তের ঘাঁটিগুলি থেকে পাকবাহিনীর ঢাকার দিকে ফেরার পথ প্রায় বন্ধ করে দিল। এব্যাপারে তাদের আরও সুবিধা হল আকাশে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়। গোটা বাংলাদেশের সব বড় সড়ক ও নদীর উপর তখন ভারতীয় জঙ্গী বিমান পাহাড়া দিচ্ছে। এবং, পাক সেনাবাহিনীর কনভয় চোখে পড়লেই তাকে আক্রমণ করছে।

এই রকম যখন অবস্থা তখন নিয়াজিও সবটা বুঝতে পারল। চতুর্দিক থেকে মিত্রবাহিনীর অগ্রগতির খবর পৌঁছল ঢাকায়।

আর পৌঁছল পাকবাহিনীর বিপর্যয়ের সংবাদ। নিয়াজি আরও জানতে পারল যে মিত্রবাহিনীর সব ক'টা কলাম মূল পাক ঘাঁটি এবং সুরক্ষিত পথগুলি এড়িয়ে এগিয়ে আসছে। পাক সমরনায়কদের তখন বুঝতে অসুবিধা হল না যে, মিত্রবাহিনীর মূল উদ্দেশ্য বিভিন্ন পাক ঘাঁটির যোগাযোগ কেটে দেওয়া। এবং পেছন থেকে পাক ঘাঁটিগুলির উপর অতর্কিতে আক্রমণ করা। নিয়াজি এবং ঢাকার পাক সমরনায়করা ততক্ষণে আরও বুঝে গিয়েছে যে, মিত্রবাহিনী শুধু বাংলাদেশের অঞ্চল বিশেষ দখল করতে চায় না—তারা চায় গোটা বাংলাদেশে পাক বাহিনীকে পরাজিত করতে। তারা বুঝল, মিত্রবাহিনী ঢাকার দিকে এগোবেই। কিন্তু তখনও তারা এটা ঠিক বুঝতে পারেনি যে, মিত্রবাহিনীর কোন্ কোন্ কলাম ঢাকার দিকে এগিয়ে আসবে।

নিয়াজি তাই অন্যান্য পাক সমরনায়কদের সঙ্গে পরামর্শ করে সেইদিনই সর্বত্র হুকুম পাঠিয়ে দিল—পুল ব্যাক।

পুল ব্যাক করে তাদের ঢাকার কাছাকাছি অর্থাৎ পদ্মা-মেঘনার মাঝামাঝি অঞ্চলে ফিরে আসতে বলা হল।

৫ ডিসেমবর সন্ধ্যে বেলায়ই সেই হুকুম সবগুলি পাক সামরিক ঘাঁটিতে চলে গেল।

বাংলাদেশের চৌগাছা থানার অখ্যাত গ্রাম গরিবপুর। ২১ নবেম্বর ভারতীয় ট্যাংক ক্রু-দের তাড়িৎ লড়াইয়ে পাকিস্তানের তিনটি শাফে ট্যাংক সেখানে বন্দী হল। ৭৬জন খান সেনা খতম। বাকিরা চম্পট। যাবার সময় ফেলে গেছে আরও ৮টি জখম ট্যাংক। বাক্স বাক্স মারকিন আর চীনে অস্ত্র। খোলারও সময় পায়নি।

AMARBOI.COM

৬ ডিসেম্বর

এই নির্দেশ পেয়েই গোটা বাংলাদেশে পাক সামরিকবাহিনী একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়ল। এতদিন তারা সীমান্ত লড়াইয়ের জন্য তৈরী হয়েছে; এখন হঠাৎ এল পিছু হটার নির্দেশ! একটা ফারসট ক্লাশ অরাজক অবস্থা! কিন্তু পিছু হটাও যে তখন সহজ নয়! কারণ, ততক্ষণে বিভিন্ন এলাকার পাকবাহিনী খবর পেয়ে গিয়েছে যে, তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তারা আরও দেখেছে, আকাশে সদাসর্বদা ভারতীয় বিমান উড়ছে। তবু তারা কেউ কেউ পুল ব্যাক হুকুম পেয়ে পেছু হটার চেষ্টা করল। ৬ ডিসেম্বর সূর্য ওঠার আগেই কতকগুলি সীমান্ত ঘাঁটি থেকে পাকবাহিনীর পিছু হটা সুরু হল।

কোনও কোনও ঘাঁটির পাক অধিনায়করা আবার অ্যাডভানস পারটি পাঠিয়ে পেছনের খবর সংগ্রহের চেষ্টা করল। এবং, অনেকেই দেখল পেছনের অবস্থাও ভাল নয়। একে তো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, তার উপর আবার বহু এলাকায় পেছনে গিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী ঘাঁটি করে বসে গিয়েছে।

নিয়াজির "পুল ব্যাক" নির্দেশের পর তাই গোটা বাংলাদেশের পাকবাহিনীতে একটা সত্যিকারের অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হল।

অধিকাংশ পাক সীমান্ত ঘাঁটির সামনেই তখন এক সমস্যা—সীমান্ত ঘাঁটিতে বসে থাকার চেষ্টা করলেও মৃত্যু অনিবার্য, আবার পিছতে গেলেও বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

কয়েকটা সীমান্ত ঘাঁটি থেকে তাই নিয়াজিকে জানান হল, পুল ব্যাক করার চেয়ে শক্ত বাংকারে ঘেরা ঘাঁটিতে বসে লড়াই চালিয়ে যাওয়াই শ্রেয়।

কুরমিটোলার নির্দেশ তাই সর্বত্র সমানভাবে পালিত হল না। কোথাও পূর্ণ পুল ব্যাক হল। কোথাও হল আধা-পুল ব্যাক।

কোথাও আবার যেমন ছিল তেমনই রইল।

যেসব ঘাঁটিতে ওরা থেকে গেল সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ময়নামতি, চট্টগ্রাম, জামালপুর এবং হিলি। যেসব ঘাঁটি থেকে পালাল সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে আগে নাম করতে হয় শ্রীহট্ট এবং যশোরের। শ্রীহট্ট এবং যশোরের চতুর্দিকে পাকবাহিনী যতগুলি ঘাঁটি করেছিল সবগুলিই ছেড়ে পালাল।

পাক নবম ডিভিশনের উপর পদ্মার দক্ষিণের গোটা অঞ্চলটা রক্ষার দায়িত্ব ছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে, আনুষ্ঠানিকভাবে লড়াই সুরু হওয়ার আগেই পাক নবম ডিভিশনের সদর দফতর যশোর ক্যানটনমেন্ট থেকে সরিয়ে মাগুরায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সদর দফতর সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরও কিন্তু নবম ডিভিশনের সৈন্যসামন্ত ঠিকই সীমান্তে ছিল। চৌগাছায় পরাজয়ের পর তারা তিনভাগে ছড়িয়ে ছিল। ঝিনাইদহ-মেহেরপুর অঞ্চলে একটা অংশ, ঝিকরগাছার উত্তর পশ্চিমে আর একটা অংশ এবং সাতক্ষিরা থেকে খুলনা পর্যন্ত আর একটা অংশ।

৫ ডিসেম্বর মাঝরাতে ভারতীয় চতুর্থ ডিভিসন আঘাত হানল ঝিনাইদহের উত্তর-পশ্চিমের পাকবাহিনীর উপর। প্রায় একই সংগে ভারতীয় নবম ডিভিশন ঘা দিল ঝিকরগাছা থেকে ঝিনাইদহের পশ্চিমে ছড়ানো অংশটার উপর।

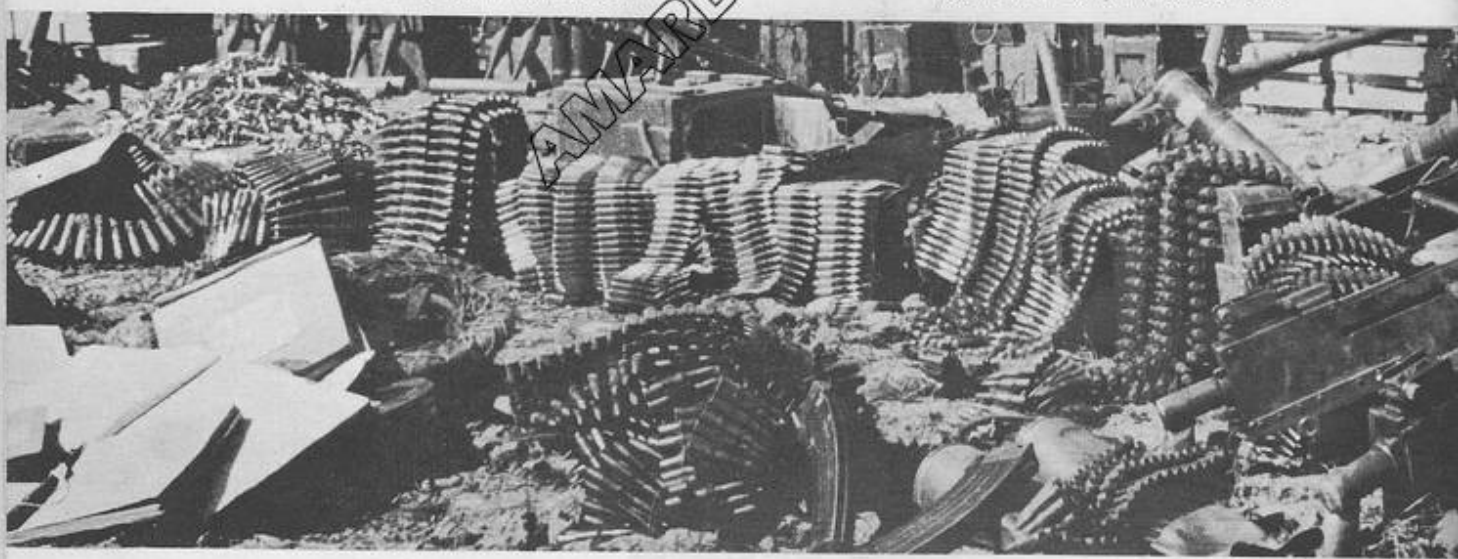

AMARBOI.COM

জলে স্থলে পাক কনভয় দেখলেই আক্রমণ

খুলনার পথে ভারতীয় ট্যাংকবাহিনী

এই দুই প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েই পাকবাহিনী একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এবং দিক থেকে মিত্রবাহিনীর দুটো কলাম যশোর-ঢাকা হাইওয়ের ওপর এসে দাঁড়াল। ততক্ষণে নিয়াজির পুল ব্যাক অরডারও এসে গিয়েছে। ৬ ডিসেম্বর তার থেকেই তাই গোটা পাক নবম ডিভিশনের পলায়ন পর্ব সুরু হয়ে গেল। ইচ্ছা ছিল গোটা বাহিনীটাই ঢাকার দিকে পালাবে। কিন্তু তা পারল না। কারণ ততক্ষণে ভারতীয় চতুর্থ এবং নবম ডিভিশন যশোর-ঢাকা হাইওয়ের দুটো অঞ্চলে ঘাঁটি করে বসেছে। বাধ্য হয়ে তাই পাক নবম ডিভিশনের একটা অংশ পালাল মাগুরা হয়ে মধুমতী নদী ডিঙিয়ে ঢাকার পথে। আর একটা অংশ পালাল খুলনার দিকে। কুষ্টিয়ার দিক দিয়েও পালাল একটা ছোট্ট অংশ। সাতক্ষিরা অঞ্চলে যে পাকবাহিনীটা ছিল এতদিন তাদের সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছিল প্রধানত মুক্তিবাহিনীর সৈন্যরা এবং বি. এস. এফের সেপাইরা। পুল ব্যাক অরডারের সঙ্গে সঙ্গে তারাও পালাল খুলনার দিকে। পালাবার সঙ্গে সঙ্গে সবক'টা বাহিনীই রাস্তার ওপরের সব ব্রিজগুলি ভেঙ্গে যাওয়ার চেষ্টা করল। শ্রীহট্টেরও তখন প্রায় একই অবস্থা। দু পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মিত্রবাহিনী শ্রীহট্টের পশ্চিমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বদিক থেকে একটা গোলন্দাজবাহিনীও শ্রীহট্টের উপর গোলাবর্ষণ করে চলেছে। শ্রীহট্টের পাক সমরনায়ক পুল ব্যাক অরডার পাওয়া মাত্র পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। ইচ্ছা ছিল আশুগঞ্জ থেকে মেঘনা অতিক্রম করে ঢাকার দিকে যাবে। কিন্তু পারল না। কিছুটা পিছিয়েই দেখল, সম্ভব নয়—মিত্রবাহিনী তার আগেই পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। তখন গোটা বাহিনীটাকে দুভাগে ভাগ করা হল। একটা থাকল শ্রীহট্টে। আর একটা পেছনের দিকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল। দু দলই লড়াই চালাল। এবং দু দলই লড়াইয়ে হেরে গেল। শ্রীহট্টের বাহিনীটা বাঙ্কারে বসে বেশ ভালই লড়ল। ওই বাহিনীকে ঘায়েল করতে ভারতীয় বিমানবাহিনীকেও বেশ কয়েক টন বোমাবর্ষণ করতে হল।

সমগ্র বাংলাদেশেই মিত্রবাহিনী তখন দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তখনও একই লক্ষ্য—যাতে পিছু হটে গিয়ে পাকবাহিনী কোথাও না জড় হতে পারে, যাতে সীমান্তের কোনও পাক সৈন্য না ঢাকায় পৌঁছতে পারে। একই লক্ষ্য নিয়ে আমাদের বিমান ও নৌবাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলিও তখন সমগ্র বাংলাদেশের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল। স্থলে বা জলে পাক কনভয় দেখলেই আক্রমণ চালাচ্ছিল। নৌবাহিনী তখন গোটা বঙ্গোপসাগরেও অবরোধ-ব্যূহ রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে। সমুদ্রে বা নদী পথেও পাক সৈন্যদের পালাবার উপায় নেই।

AMARBOI.COM

বুধবার। ৭ ডিসেম্বর। যশোর খণ্ডে ভারতীয় জওয়ানরা হানাদার হটিয়ে এগিয়ে চলেছেন— আর মুক্ত এলাকার মুক্তিপাগল মানুষ অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

AMARBOI.COM

৭ ডিসেম্বর

কার্যত যশোরের পতন হয়েছিল আগের দিনই। ৬ তারিখ সন্ধ্যা হতে না হতেই পাকবাহিনীর সবাই যশোর ক্যানটনমেনট ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। কিন্তু ভারতীয়বাহিনী তখনই সে খবরটা পায়নি। ৭ ডিসেমবর বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ ভারতীয় নবম ডিভিশনের প্রথম কলামটা উত্তর দিক দিয়ে যশোর ক্যানটনমেনটের কাছে এসে পেঁছল। তখনও তারা জানে না যশোর ক্যানটনমেনট শূন্য। তখনও তাদের কাছে খবর, পাকবাহিনী যশোর রক্ষার জন্য বিরাট লড়াই লড়বে।

কিন্তু মিত্রবাহিনীর কলামটা যতই এগিয়ে এল ততই আশ্চর্য হয়ে গেল। কোনও প্রতিরোধ নেই! সামনে থেকে একটাও গোলাগুলি আসছে না!

প্রায়-বিহ্বল অবস্থায় যখন কলামটা একেবারে ক্যানটনমেনটের সামনে এসে দাঁড়াল তখন বুঝতে পারল ব্যাপারটা। জনা দশ পনেরো লোক "জয়বাংলা" ধ্বনি দিয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। জড়িয়ে ধরে তাদের সম্বর্ধনা জানাল। আর জানাল যে, আগের দিনই সব পাক সেনা যশোর ছেড়ে পালিয়েছে। ভারতীয় বাহিনী তখন গোটা ব্যাপারটা বুঝল। দেখতে দেখতে বেশ কিছু লোক এসে সেখানে জড় হল। তারাই ক্যানটনমেনটের ভেতরটা চিনিয়ে দিল ভারতীয় বাহিনীকে।

পাক সেনারা যে ট্যাঙ্ক, কামান এবং ট্রাক-জিপ নিয়ে খুলনা পালিয়েছে যশোরের নাগরিকরা তাও ভারতীয় বাহিনীকে জানাল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বাহিনী ছুটল খুলনার পথে।

ওদিকে তখন নবম ডিভিশনের সদর ঘাঁটিতেও সব খবর পেঁছে গিয়েছে।

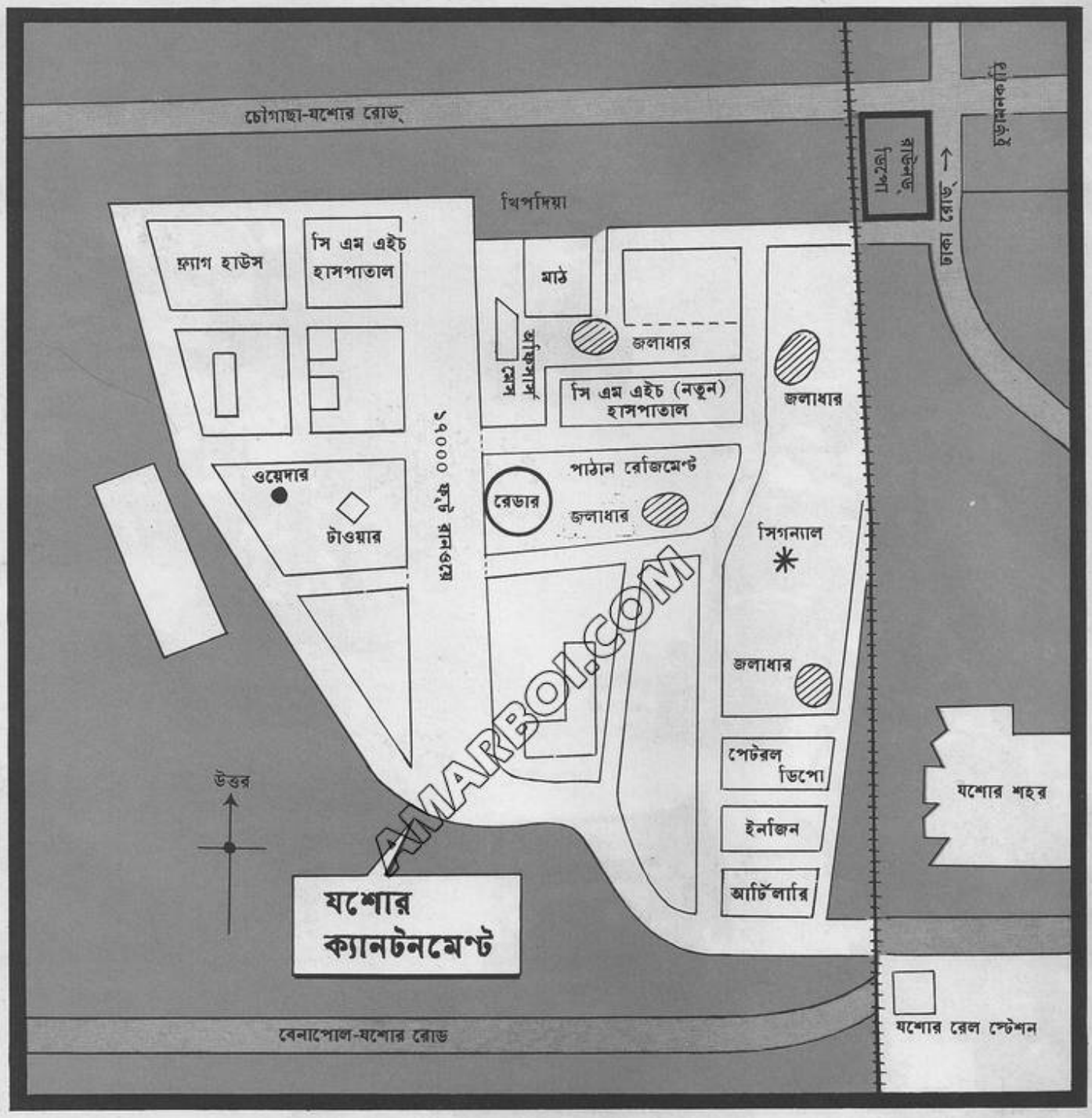

ডিভিশনের প্রধান মেঃ জেনারেল দলবীর সিং বয়রা-ঝিকরগাছার পথ ধরে গোটা নবম ডিভিসনকে নিয়ে এগিয়ে এলেন যশোর শহরে। যশোর ক্যানটনমেনটে পাক নবম ডিভিশনের মত আমাদের নবম ডিভিশনের সদর দফতর হল। শ্রীহট্টেরও পতন হল ওইদিনই দুপুরে। প্রথমে ভারতীয় ছত্রীসেনারা নামল শ্রীহট্টের নিকটবর্তী বিমানবন্দর শালুটিকরে। খুব ভোরে। তারপর চতুর্দিক থেকে মিত্রবাহিনী শ্রীহট্টের পাক ঘাঁটিগুলির উপর আক্রমণ চালাল। দুপুর বেলাই শ্রীহট্টের পাক সেনানায়ক আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল।

AMARBOI.COM

AMARBOI.COM

৮ ডিসেম্বর

বৃহস্পতিবার সকালে মিত্র পক্ষের সামরিক নেতারা পূর্ব রণাঙ্গণের সমগ্র পরিস্থিতিটা বিশ্লেষণ করে দেখলেন, তাঁদের প্রথম লক্ষ্য সফল হয়েছে। বাংলাদেশের নানাখণ্ডে পাক সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্ন এবং অবরুদ্ধ। ঢাকার দিকে পালাবার কোনও পথ নেই। দক্ষিণে একটা পাকবাহিনী আটকে পড়েছে খুলনার কাছে। উত্তরের গোটা পাকবাহিনীও ব্রহ্মপুত্র এবং পদ্মার মধ্যবর্তী তিন চারটা অঞ্চলে অবরুদ্ধ। একটা বড় বাহিনী, প্রায় একটা ব্রিগেড, হিলির কাছে অবরুদ্ধ। আর একটা ব্রিগেড আটকে রয়েছে জামালপুরে। ময়মনসিং থেকে যে বাহিনীটাকে সরিয়ে শ্রীহট্টের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেটা কার্যত ফিনিসড। ময়নামতি ক্যানটনমেনটে অবরুদ্ধ আর একটা ব্রিগেড। আর একটা বড় পাকবাহিনী অবরুদ্ধ চট্টগ্রামে। একের সঙ্গে আর একের যোগ দেওয়ার কোনও সুযোগ নেই। ঢাকার দিকে পিছু হটাও কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

মিত্রবাহিনীর কর্তারা তখন তিনটা ব্যবস্থা নিলেন। প্রথম ব্যবস্থায়, গোটা পাক সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হল। দ্বিতীয় ব্যবস্থায়, জেনারেল সগৎ সিংকে বলা হল তাঁর অন্তত তিনটা কলাম খুব দ্রুত ঢাকার দিকে এগিয়ে নিতে। তৃতীয় ব্যবস্থায়, একটা ব্রিগেডকে যথাশীঘ্র সম্ভব হালুয়াঘাটের দিক থেকে ময়মনসিংহের দিকে নিয়ে আসা হল।

যুদ্ধের সুরুতেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মানেকশ বাংলাদেশের দখলদার পাকবাহিনীর উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ৮ ডিসেমবর আবার তাঁর সেই আবেদন নানাভাষায় বার বার আকাশবাণী থেকে প্রচার করা হল।

তিনি পাক সেনাদের আত্মসমর্পণ করতে বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই আশ্বাস দিলেন যে, আত্মসমর্পণ করলে পাকবাহিনীর প্রতি জেনিভা কনভেনশনের রীতি অনুসারে সম্মানজনক ব্যবহার করা হবে।

জেনারেল মানেকশ বললেন ঃ আমি জানি আপনারা পালাবার জন্য বরিশাল এবং নারায়ণগঞ্জের কয়েক জায়গায় জড় হচ্ছেন। আমি এও জানি ওখান থেকে আপনাদের উদ্ধার করা হবে বা পালাতে পারবেন এই আশাতেই আপনারা ওসব জায়গায় গিয়ে মিলিত হচ্ছেন। কিন্তু আমি সমুদ্রপথে আপনাদের পালাবার সব পথ বন্ধ করে দিয়েছি। এজন্য নৌ-বাহিনীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখনও যদি আপনারা আমার পরামর্শ না শোনেন এবং ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ না করেন তাহলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কেউ আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না।

বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্ত থেকে জেনারেল সগৎ সিং-এর প্রায় সব কটা ডিভিশনই তখন প্রচণ্ড গতিতে পশ্চিমের দিকে এগোচ্ছিল। একটা এগোচ্ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া দখল করে আশুগঞ্জের দিকে। আশুগঞ্জে মেঘনার উপর বিরাট পুল রয়েছে। এপারে আশুগঞ্জ, ওপারে ভৈরববাজার। প্রচণ্ড গতিতে সেই পুলের দিকে এগোলো একটা বাহিনী।

ওদিকে সেদিন কুমিল্লারও পতন ঘটেছে। ওই সেকটরের সব পাক সৈন্য গিয়ে ময়নামতি ক্যানটনমেনটে আশ্রয় নিল।

মিত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরা সেদিন হেলিকপটারে কুমিল্লা ঘুরে এলেন। ময়নামতিকে পাশ কাটিয়ে আর একটা বাহিনী

সব বাহিনীরই লক্ষ্য

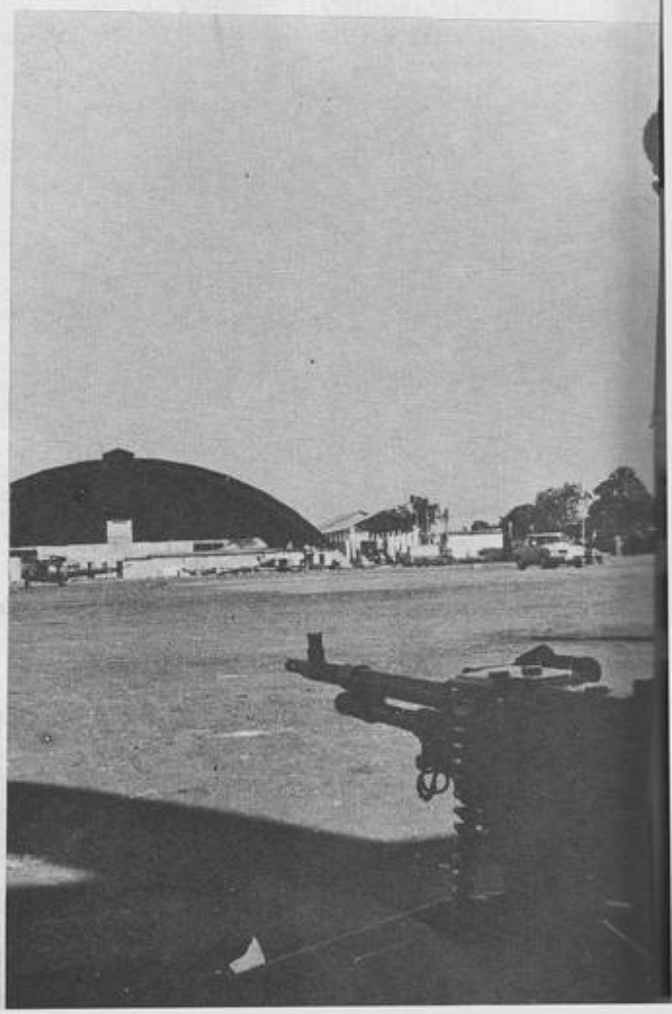

মেসিনগান হাতে ভারতীয় জওয়ানদের পাহারায় সংরক্ষিত তেজগাঁও বিমানবন্দর।

AMARBOI.COM

তখন ঢাকা

দ্রুত এগিয়ে গেল দাউদকান্দির দিকে।
আর একটা বাহিনী লাকসামের দিক থেকে
দ্রুত অগ্রসর হল চাঁদপুরের মুখে।
সব কটা বাহিনীরই লক্ষ্য ঢাকা।
যদি প্রয়োজন হয় তাহলে যাতে এই বাহিনী
নদী পথেই নারায়ণগঞ্জ ঢাকার দিকে
অগ্রসর হতে পারে। এই বাহিনীর আর একটা
লক্ষ্য ছিল চাঁদপুর বন্দর থেকে মেঘনা ও
পদ্মার নদীপথের ওপর নজর রাখা।
বাংলাদেশে লড়াইয়ে নামতে হতে পারে এই কথা
ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় প্রতিরক্ষা
দফতরের কর্তারা ঠিক করে রেখেছিলেন ঢাকার
ওপর প্রধান আক্রমণটা করা হবে উত্তর দিক
দিয়ে। ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইলের পথে
একটা বড় বাহিনীকে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হবে
ঢাকায়। ওপথে নদীনালা খুব কম।
সেই উদ্দেশ্যে গোড়া থেকেই তাঁরা গারো পাহাড়ে
দু ব্রিগেড সৈন্য মজুত করেছিলেন।
বেশি সৈন্য ওই পথে জড় করেন নি, কারণ ভয়,
ছিল যে, তাহলে পাকিস্তানীরা খবরটা আগাম
পেয়ে যাবে এবং আগে থেকেই পথে একটা
বড় প্রতিরক্ষা-ব্যূহ রচনা করে রাখবে।
সেইজন্যই ওপথে কম সৈন্য জড় করা হল।
এবং ঠিক করে রাখা হল যে পদাতিক সৈন্য
টাঙ্গাইলের কাছাকাছি পৌঁছবার পর ওখানে
একটা বড় ছত্রীবাহিনীও নামানো হবে।
পাক-সমরনায়করাও ধরে রেখেছিল যে ভারত
উত্তর দিক দিয়ে একটা বড় সেনাবাহিনী
নামাবার চেষ্টা করবেই। সেইজন্য তারা
জামালপুরের কাছে একটা বড় ঘাঁটি তৈরী
করে রেখেছিল। আর একটা ছোট ঘাঁটি
করে রেখেছিল হালুয়াঘাটের কাছে। লড়াই
সুরু হতেই ১০১নং কমিউনিকেশন জোনের
একটা ব্রিগেড এগোলো জামালপুরের দিকে।
আর একটা গেল হালুয়াঘাটের কাছে।
হালুয়াঘাটের সীমান্তবর্তী ভারতীয় বাহিনী
প্রথমে অগ্রসর হল না। দুচারদিন ওখানেই
অপেক্ষা করল। জামালপুরে বড় লড়াই সুরু
হতে পাক সামরিক নেতারা তাদের
হালুয়াঘাটের বাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে গেল
জামালপুরের দিকে। আর ময়মনসিং থেকে প্রায়
একটা ব্রিগেড নিয়ে গেল শ্রীহট্ট ভৈরববাজার
সেকটরে। তারা তখন ভাবতেও পারেনি যে
একটা ভারতীয় বিগেড হালুয়াঘাটের মুখে
অপেক্ষা করছে। হালুয়াঘাট থেকে ভারতীয়
বাহিনীটা খুব দ্রুত এগিয়ে এল ময়মনসিংহের
দিকে। পথে বড় কোন বাধাই পেল না।
কারণ একটা পাকবাহিনী লড়াই করছে
জামালপুরে, আর একটা গিয়েছে
ভৈরববাজার-সিলেট সেকটরে!

একই সঙ্গে বিমান আক্রমণও বাড়ানো হল।
বিমান ও নৌবাহিনীর জঙ্গীবিমানগুলি
সারাদিনে অসংখ্যবার বিভিন্ন পাক সামরিক
ঘাঁটিতে আক্রমণ চালাল। বিমান আক্রমণের
ভয়ে দিনের বেলা পাক সামরিক বাহিনীর
চলাচলও প্রায় বন্ধ হয়ে গেল।
পরিকল্পনা মতই বিমান আক্রমণ বৃদ্ধি করা হল।
লক্ষ্যটা একই।
প্রথমত, পাক সেনাবাহিনীকে আবার কোথাও
রিগ্রুপড হতে না দেওয়া। এবং,
দ্বিতীয়ত তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া—
যাতে ওরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

৯ ডিসেম্বর

৯ তারিখ চতুর্দিক থেকে মিত্রবাহিনী
ঢাকার দিকে অগ্রসর হল।
তখন তাদের চোখের সামনে শুধু ঢাকা।
এর আগেই তাদের প্রথম লক্ষ্যটা পূর্ণ হয়ে
গিয়েছে।
অর্থাৎ, মিত্রবাহিনী বাংলাদেশের নানা প্রান্তে
ছড়িয়ে থাকা পাক বাহিনীকে বেশ ভালোমত
বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, তাদের ঢাকা ফেরার
বা পালাবার প্রায় সব পথ বন্ধ।
এবার দ্বিতীয় লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেল
ভারতীয় বাহিনী।
দ্বিতীয় লক্ষ্যটা হল খুব দ্রুত ঢাকায় পৌঁছানো
এবং ঢাকার পাক বাহিনীর মনোবল
সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দিয়ে নিয়াজিকে আত্মসমর্পণে
বাধ্য করা।
সব দিক থেকেই মিত্রবাহিনী ঢাকার দিকে
অগ্রসর হল। পূর্বে পৌঁছে গেল
আশুগঞ্জে, দাউদকান্দিতে এবং চাঁদপুরে।
পশ্চিমে একটা বাহিনী পৌঁছল
মধুমতী নদীর তীরে। আর একটা বাহিনী
কুষ্ঠিয়া মুক্ত করে চলল গোয়ালন্দ ঘাটের দিকে।
হালুয়াঘাট থেকে এগিয়ে আসা বাহিনীও
পৌঁছে গেল ময়মনসিংহের কাছাকাছি।
নৌবাহিনীর গানবোটগুলিও ততক্ষণে নানা দিক
থেকে এগোচ্ছে ঢাকার দিকে।
এবং বিমানবাহিনীর আক্রমণও পুরাদমেই চলছে।
সেদিন বিকালে মিত্রবাহিনীর প্রধান
জেনারেল অরোরা কলকাতায় এক সাংবাদিক
বৈঠকে বললেন :
আমরা এখন ঢাকার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।
সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলেন :

AMARBOI.COM

পাকিস্তানীরা যদি মাটি কামড়ে ঢাকার লড়াই চালাতে চায় তাহলে আপনি কী করবেন?
জেনারেল অরোরা জবাব দিলেন ঃ
ওরা কী করবে জানি না।
তবে আমরা বড়দরের লড়াইয়ের জন্যই প্রস্তুত।
জেনারেল অরোরাকে সাংবাদিকরা আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ ঢাকাকে মুক্ত করার পথে আপনার সামনে সবচেয়ে বড় বাধা কী?
অরোরা বললেন ঃ নদী।
তারপর আবার বললেন ঃ
নদী যদিও বড় বাধা সে বাধা অতিক্রমের ব্যবস্থা আমরা করে ফেলেছি। আমাদের পদাতিক সৈন্য এবং রসদ পারাপারের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। আর আমাদের পি. টি. ৬৭ ট্যাঙ্কগুলি নিজে থেকেই নদী সাঁতরে যেতে পারবে।

১০ ডিসেম্বর

পরদিনই ৫৭নং ডিভিশন গোটা বিশ্বকে দেখিয়ে দিল মিত্রবাহিনী কীভাবে রাজধানী ঢাকার মুক্তিযুদ্ধে নদীর বাধা অতিক্রম করবে।
ভোররাত্রি থেকে ভৈরববাজারের তিন চার মাইল দক্ষিণে হেলিকপটারে করে নামানো শুরু হল ৫৭নং ডিভিশনের সৈন্য।
সারাদিন ধরে মেঘনা অতিক্রমের সেই অভিযান চলল। প্রথম বাহিনীটা ওপারে নেমেই ঘাঁটি গেড়ে বসল। কিছুটা উত্তরে ভৈরববাজারের কাছেই তখন পাক সৈন্যদের একটা বড় বাহিনী মজুত। ব্রিজটার একটা অংশ ভেঙ্গে দিয়ে নদীর পশ্চিম পারে ওত পেতে বসে আছে। আকাশে সূর্য উঠতেই তারা দেখতে পেল হেলিকপটার।
নদী পার হচ্ছে।
কিন্তু দেখেও তারা ঘাঁটি ছাড়তে সাহস পেল না। ভাবল,
ওটা বোধহয় ভারতীয় বাহিনীর একটা ধাপ্পা। ওদিকে ছুটে গেলেই আশুগঞ্জ থেকে মূল ভারতীয় বাহিনীটা ভৈরববাজারের ওখানে এসে উঠবে।
তারপর ভৈরববাজার-ঢাকা রাস্তা ধরবে।
সত্যিই কিন্তু পাকবাহিনীকে ভুল বোঝাবার জন্য মিত্রবাহিনীর একটা বড় কলাম তখন এমন ভাবসাব দেখাচ্ছিল যে তারা আশুগঞ্জ দিয়েই মেঘনা পার হবে।
পাকবাহিনী এইভাবে ভুল বোঝায় মিত্রবাহিনীর সুবিধা হল। একরকম বিনা বাধায় মেঘনা পার হওয়া গেল।
হেলিকপটারে নদী পার হল কিছু সৈন্য। অনেকে আবার নদী পার হল ষ্টীমারে এবং লঞ্চে করে।
কিছু পার হল স্রেফ দেশী নৌকোতেই।
ট্যাঙ্কগুলি নিয়ে কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল প্রথমে। কিন্তু সে সমস্যাও দূর হল এক অভাবনীয় উপায়ে।
রাশিয়ান ট্যাঙ্ক সাঁতরাতে পারে ঠিকই। কিন্তু একনাগারে আধঘণ্টার বেশি সাঁতরালেই ট্যাঙ্ক ভীষণ গরম হয়ে যায়।
অথচ মেঘনা পার হতে আধঘণ্টার অনেক বেশি সময় লাগবে। তখন ঠিক হল,
ট্যাঙ্কগুলি যতটা সম্ভব নিজেই সাঁতরে এগোবে। তারপর নৌকোতে দড়ি বেঁধে ট্যাঙ্কগুলিকে টেনে নদীর ওপারে নিয়ে যাওয়া হবে।
স্থানীয় মানুষের অভূতপূর্ব সাহায্য ছাড়া এই বিরাট অভিযান কিছুতেই স্বার্থক হত না। ওখানের মানুষ যে যেভাবে পারল মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করল।
শত শত নৌকা নিয়ে এল তারা।
সেইসব নৌকা বার বার মেঘনা পারাপার করল।
যেখান থেকে মিত্রবাহিনী নদী পেরিয়েছিল সেখানে কোনও রাস্তাঘাট ছিল না।
সেটা ছিল জলা জমি।
এই জলা জমি দিয়ে কামান বন্দুক ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল ওই এলাকার শত শত বাঙালী। বেশ কয়েক মাইল হেঁটে তারপর তারা পৌঁছেছিল ভৈরববাজার-ঢাকা মূল সড়কে। এবং পরদিনই তারা রায়পুর দখল করে নিল।
ওদিকে তখন উত্তরের বাহিনীটাও দ্রুত এগিয়ে আসছে। ময়মনসিংহের কাছে পৌঁছে তারা দাঁড়াল। খবর ছিল যে ময়মনসিংহে পাক বাহিনীর একটা ব্রিগেড রয়েছে।
কিন্তু সে ব্রিগেডটাকে যে আগেই ভৈরববাজারের দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মিত্রবাহিনী তা জানত না।
তাই মিত্রবাহিনী ময়মনসিংহে বড় লড়াই করার জন্য সেদিনটা ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপারে শম্ভুগঞ্জে অপেক্ষা করল।
অন্যদিকে ভারতীয় বিমান এবং নৌবাহিনীও সেদিন পাক সেনাবাহিনীকে আরও ভয় পাইয়ে দিল। বিমানবাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি ঢাকা বেতার কেন্দ্রটিকে স্তব্ধ করে দিয়ে এল। কুরমিটোলার উপর বার বার রকেট আর বোমা ছুঁড়ল।
নৌবাহিনীর বিমান আক্রমণে চট্টগ্রাম এবং চালনার অবস্থাও তখন অত্যন্ত কাহিল।
কয়েকটা ষ্টীমার ভর্তি হয়ে পাকবাহিনী

AMARBOI.COM

বঙ্গোপসাগর দিয়ে পালাতে গিয়েছিল। একটা জাহাজে নিরপেক্ষ দেশের পতাকা উড়িয়েও কিছু পাক সৈন্য সিংগাপুরের দিকে পালাচ্ছিল। সব ধরা পড়ল। কয়েকটা পাক বাণিজ্য জাহাজও মাঝ দরিয়ায় ঘায়েল হল।

১১ ডিসেম্বর

১১ তারিখ চতুর্দিকে পাক সেনাবাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ল। বহু পাক ঘাঁটির পতন হল সেদিন। মুক্ত হল জামালপুর, ময়মনসিংহ, হিলি, গাইবাঁধা, ফুলছবি, বাহাদুরাবাদ, পিসপাড়া, দুর্গাদীঘি, বিগ্রাম এবং চন্ডীপুর। বিভিন্ন এলাকায় শত শত পাক সৈন্য আত্মসমর্পণ করল।

এক জামালপুরেই আত্মসমর্পণ করল ৫৮১ জন। চাঁদপুরের উত্তরে মতলববাজারেও বহু পাক সৈন্য আত্মসমর্পণ করল।

কিছু আবার পেছনের দিকে পালাতে গিয়ে মার খেল। যেমন জামালপুরের বাহিনীর একটা অংশ। জামালপুরের পাকবাহিনী বেশ কিছুদিন ধরে ভাল লড়াই-ই চালিয়েছিল। মাটি কামড়ে তারা লড়াই চালাচ্ছিল। এই লড়াইয়ে ভারতীয় জেনারেল গিল মারাত্মক আহত হলেন।

কিন্তু ১১ তারিখ আর পারল না। একটা বাহিনী আত্মসমর্পণ করল। আর একটা টাঙ্গাইলের দিকে পালাল। উত্তরে ১০১নং কমিউনিকেশন জোনের একটা ব্রিগেড তখন ময়মনসিংহ দখল করে নিয়েছে। ময়মনসিংহ থেকে তারা সোজা ঢাকা এগোতে পারল না।

কারণ রাস্তাটাই সোজা যায়নি। গিয়েছে টাঙ্গাইল ঘুরে। ময়মনসিংহ থেকে ঢাকার রেললাইনটা ছিল সোজাসুজি।

কিন্তু পালাবার আগে পাকবাহিনী ব্রহ্মপুত্রের ওপরের রেল সেতুটা ভেঙ্গে দিয়ে গিয়েছিল। ভেঙ্গে দিয়েছিল ওই পথের আরও কয়েকটা রেলপুল।

তাই ভারতীয় বাহিনীকে টাঙ্গাইলের পথেই এগোতে হল। সেইটাই অবশ্য ছিল তাদের পরিকল্পনা।

ওদিকে ভৈরববাজারের দিক থেকেও তখন এগিয়ে আসছে ৫৭নং ভারতীয় ডিভিশন।

কিছুটা এগিয়েই তারা দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। একটা গেল নরসিংদির দিকে।

বিমানবাহিনীও তখন পুরোদমে আক্রমণ চালাচ্ছে। পাকিস্তানীরা মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনীর হাত থেকে পালায় তো বিমানবাহিনীর হাতে গিয়ে পড়ে!

বিমানবাহিনী সেদিন একমাত্র ঢাকাকে রেহাই দিল। কারণ ভারত সরকার আগেই ঘোষণা করেছিল, ওদিন ঢাকা ও করাচির উপর কোনও আক্রমণ করা হবে না।

বিদেশীদের ঢাকা থেকে বের করে আনার জন্য আন্তর্জাতিক বিমান তেজগাঁওয়ে নামতে দেওয়া হবে। এবং সেজন্য তেজগাঁও বিমান বন্দর সারাতেও দেওয়া হবে।

নৌবাহিনী কিন্তু সেদিনও ভীষণ সক্রিয়। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং চালনার উপর নৌবাহিনীর বিমানগুলি সেদিনও প্রচন্ড আক্রমণ চালাল।

১২ ডিসেম্বর

পরদিনও ভারতীয় বিমানবাহিনী ঢাকার উপর কোনও আক্রমণ করল না। সেদিন বিদেশীদের নিয়ে ঢাকা থেকে তিনখানা আন্তর্জাতিক বিমান এল কলকাতায়। অবরুদ্ধ ঢাকা থেকে মুক্ত মানুষরা এল কলকাতায়।

বিমানবাহিনী সেদিন অন্যত্র ভীষণ ব্যস্ত। ভোররাতেই ছত্রী সেনারা নেমেছে টাঙ্গাইলে। এক ব্যাটেলিয়ান ছত্রী সেনা। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারেই এই ছত্রী সেনাদের নামানো হল টাঙ্গাইলে। ময়মনসিংহের দিক থেকে মিত্রবাহিনীর ব্রিগেডটাও তখন দ্রুত এগিয়ে আসছে টাঙ্গাইলে।

ভোররাত্রে ছত্রী সেনাদের নামানো হল টাঙ্গাইলে নদীর উত্তর দিকে।

শত্রুপক্ষকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্য প্রথমে কিছু খড়ের ভুয়া ছত্রী সেনা নামানো হল

AMARBOI.COM

নদীর দক্ষিণে। মীরজাপুর আর টাঙ্গাইলের মাঝামাঝি।
ভুয়া ছত্রীদের নামানো হয়েছিল প্রথম রাত্রে। কিছু পাক সেনা সেই ভুয়া ছত্রীসেনা খুঁজতে ছুটল। তারপর ভোররাতে নদীর উত্তরে নামানো হল আসল ছত্রী সেনা।
এক ব্যাটেলিয়ন—অর্থাৎ প্রায় এক হাজার। মাটিতে নামতেই তারা স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্য পেল। স্থানীয় সবাই সহযোগিতা করতে এগিয়ে এল।
বিমান থেকে যে অস্ত্রশস্ত্র ফেলা হয়েছিল স্থানীয় অধিবাসীরাই ছোটাছুটি করে তা সব সংগ্রহ করে দিল ছত্রী সেনাদের।
উত্তর দিক দিয়ে তখন জামালপুরের পাকবাহিনীর একটা অংশ পিছু হটে আসছিল।
এদের আগমনের খবর জানা ছিল না ভারতীয় বাহিনীর। কারণ, এরা প্রধানত রাতের অন্ধকারে কাঁচা রাস্তা দিয়ে আসছিল।
আচমকা এই পাকবাহিনীটা এসে পড়ল ছত্রী সেনাদের সামনে।
ওরাও আবার জানত না যে ভারতীয় ছত্রী সেনারা ওখানে নেমেছে।
ভারতীয় ছত্রী সেনারাই প্রথমে দেখতে পেল পাক বাহিনীকে। দেখতে পেয়েই দমাদম গুলি চালাল। এবং সেই আচমকা আক্রমণে পাক বাহিনী একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ল।
প্রথমেই তারা ছিটকে পড়ল।
তারপর রিগ্রুপড হয়ে আবার দক্ষিণে এগোবার চেষ্টা করল।
কিন্তু ততক্ষণে ভারতীয় ছত্রী সেনারা পুরোপুরি তৈরী। লড়াই হল।
পাক সেনারা কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পরই পিছু হটার চেষ্টা করল। কিন্তু তাও পারল না।
কারণ ততক্ষণে ময়মনসিংহের দিক থেকে ১০১নং কমিউনিকেশন জোনের ব্রিগেডটাও এসে গিয়েছে পেছনে।
বাধ্য হয়ে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করল।
টাঙ্গাইলের ছত্রী সেনারা কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোট্ট বিমান বন্দরটা দখল করে নিল।
তারপর থেকেই প্রতি দশ মিনিট অন্তর সেখানে ক্যারিবু বিমানের অবতরণ শুরু হল।
এল আরও সৈন্য। এল বহু অস্ত্রশস্ত্র। যুদ্ধের নানা সাজসরঞ্জাম।
কয়েক ঘণ্টা পর ১০১নং কমিউনিকেশন জোনের ব্রিগেডটাও এসে যোগ দিল তাদের সঙ্গে।
এবং দুই বাহিনী একত্রে এগিয়ে চলল ঢাকার পথে মীরজাপুরের দিকে।
ওদিকে তখন ৫৭নং ডিভিশনও পূব দিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছে ঢাকার দিকে। সেইদিন তারা নরসিংদি অতিক্রম করে বেশ কিছুটা

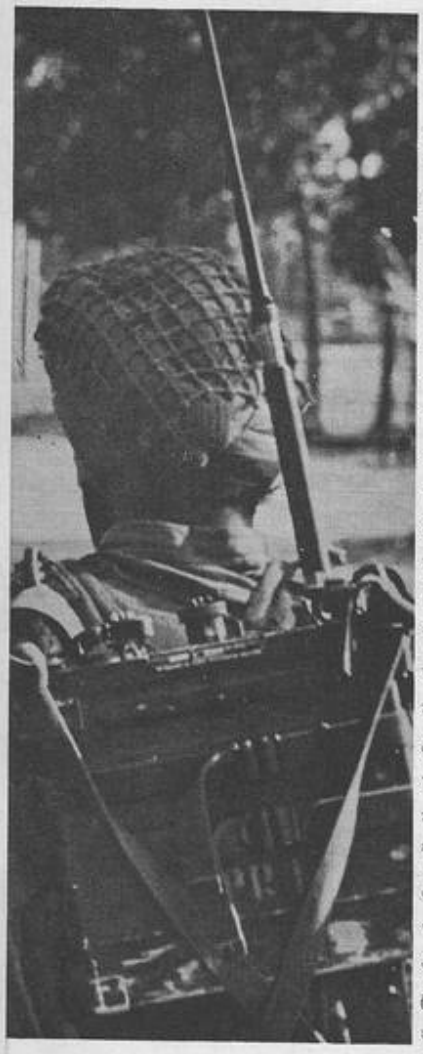

এগিয়েছে।
সেদিনই প্রথম ঢাকায় ভারতীয় কামানের গর্জন শোনা গেল। এবং, সেই গর্জন শুনে নিয়াজি সহ ঢাকার পাক বাহিনীর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল।
এদিকে কলকাতায় পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীর চিফ অফ স্টাফ জেনারেল জ্যাকবও আর এক কাণ্ড করে বসে আছেন।
সকালে সাংবাদিক বৈঠক। জেনারেল জ্যাকব সেখানে সমগ্র যুদ্ধ পরিস্থিতি বোঝাচ্ছিলেন। সাংবাদিকরা তাঁকে এই ছত্রী সেনা নামাবার ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করল।
জেনারেল জ্যাকব বললেন, হ্যাঁ ছত্রী সেনা নেমেছে। তবে কোথায় নেমেছে, কত নেমেছে আমাকে জিজ্ঞেস করো না।
বিদেশী সাংবাদিকরা এই ব্যাপারে যত প্রশ্ন করেন, জেনারেল জ্যাকব ততই প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।
তারই মধ্যে তিনি ইংগিতে এমন একটা ধারণা দিলেন যে এক ব্রিগেডের বেশি ছত্রী সেনা নামানো হয়েছে এবং ঢাকার কাছাকাছি বিভিন্ন এলাকায় তারা নেমেছে।
আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলি এই খবর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বে ছড়িয়ে দিল।
খবরটা ঢাকায়ও গিয়ে পৌঁছল। এবং পাক সমরনায়করা সেই খবর পেয়ে বিষম ভয় পেয়ে গেল।
তারা ভাবল, হয়ত ঢাকার চতুর্দিকেই মিত্রবাহিনী

AMARBOI.COM

বগুড়া মুক্তির বাকি কত?
দিনাজপুর হাতে এসেছে?

প্রচুর ছত্রী সেনা নামিয়েছে। এবং, হয়ত সব
খবর তারা তখনও পায়নি।
ঢাকার সবাই বুঝল, এবার আর রক্ষা নেই।
জেনারেল মানেকশর আবেদনও তখন
বার বার প্রচারিত হচ্ছেঃ
বাঁচতে চান তো আত্মসমর্পণ করুন।
পালাবার কোনও পথ নেই।
লড়াই করা বৃথা।
আত্মসমর্পণ করলে সব পাক সেনা
জেনিভা কনভেনশন অনুসারে ব্যবহার পাবেন।

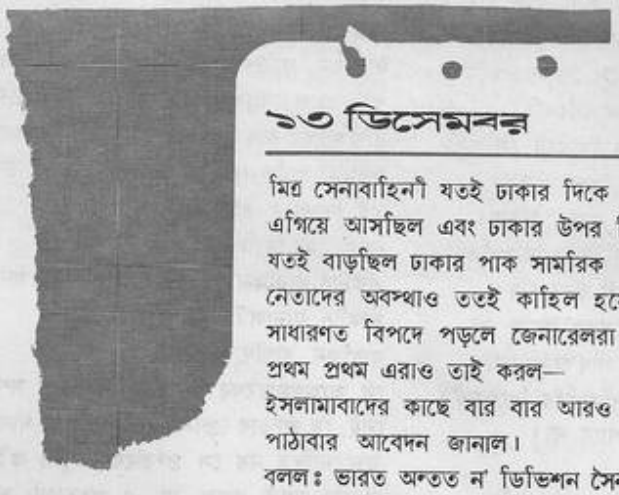

১৩ ডিসেম্বর

মিত্র সেনাবাহিনী যতই ঢাকার দিকে
এগিয়ে আসছিল এবং ঢাকার উপর বিমান হানা
যতই বাড়ছিল ঢাকার পাক সামরিক
নেতাদের অবস্থাও ততই কাহিল হয়ে উঠছিল।
সাধারণত বিপদে পড়লে জেনারেলরা যা করে
প্রথম প্রথম এরাও তাই করল—
ইসলামাবাদের কাছে বার বার আরও সাহায্য
পাঠাবার আবেদন জানাল।
বললঃ ভারত অন্তত ন' ডিভিশন সৈন্য এবং
দশ স্কোয়াড্রন বিমান নিয়ে আক্রমণ শুরু করেছে।
সুতরাং আমাদেরও অবিলম্বে আরও
কয়েক ডিভিশন সৈন্য এবং কয়েক স্কোয়াড্রন
বিমান চাই।

ইসলামাবাদ প্রথমে ঢাকার কর্তাদের বলেছিল ঃ
তোমরা মাত্র কয়েকটা দিন লড়াইটা
চালিয়ে যাও। আমরা দিন সাতেকের মধ্যেই
পশ্চিমখণ্ডে ভারতীয় বাহিনীকে এমন মার
দেব যে তারা নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইতে
বাধ্য হবে। এবং তখন যুদ্ধই থেমে যাবে।
সুতরাং
তোমাদেরও আর কোনও অসুবিধা থাকবে না।
কিন্তু দিন পাঁচ ছয়ের মধ্যেই ঢাকার পাক কর্তারা
বুঝতে পারল,
ওদিকেও বেশি সুবিধা হচ্ছে না।
ভারতের নতজানু হওয়ারও কোনও-ই সম্ভাবনা
দেখা যাচ্ছে না।
বরং ভারতীয় বাহিনী প্রচণ্ড বেগে ঢাকার
দিকে এগোচ্ছে।
তখন তারা অনেকেই ভয় পেয়ে গেল।
ভয় পেল প্রধানত দুটো কারণে।
প্রথম কারণ, পালাবার পথ নেই। কোথাও যে
পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করবে
তার উপায় নেই।

বিমান বন্দরে পালাবার মত কোনও পাক-বিমান নেই। মাথার উপরে ভারতীয় বিমান। সমুদ্রে ভারতীয় নৌবাহিনীর অবরোধ। স্থলপথে যেদিকেই যাওয়া যাবে, ভারতীয় সেনা। মুক্তিবাহিনী বা স্থানীয় মানুষের হাতে পড়লে মৃত্যু অনিবার্য।

তাদের অত্যাচারের ফলে বাংলাদেশের মানুষ
কতটা ক্ষেপে আছে সেটা
তাদের জানতে তখন বাকি নেই।
তাই মিত্রবাহিনী পদ্মা এবং মেঘনার কূলে
এসে দাঁড়ানো মাত্রই ঢাকার পাক কর্তাদের
মনোবল ভেঙ্গে পড়ছিল। তারা অসহায়
বোধ করতে শুরু করেছিল। এর উপর যখন
তারা দেখল যে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়ানো পাক-
বাহিনীও আর ঢাকার দিকে ফিরতে
পারছে না তখন তারা অনেকে একেবারে
হাত-পা ছেড়ে দিল।
ঢাকায় পাক সামরিক কর্তাদের মধ্যে গোড়া
থেকেই দুটো ভাগ ছিল। একটা অধিনায়ক
নিয়াজির সমর্থক। আর একটা গভরনরের
সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও
ফরমান আলির সমর্থক। এরা দুজনে
দু'রকমের লোক ছিল।
দুজনেই প্রায় সমান বাঙালী বিদ্বেষী

AMARBOI.COM

দুজনেই গোড়া থেকে বিশ্বাস করত,
পিটিয়েই বাঙালীদের শায়েস্তা করা যাবে।

নিয়াজি মাতাল এবং লম্পট। ফরমান আলি মতলববাজ এবং শয়তান। নিয়াজি বেলেল্লাপনা করে সর্বত্র ঘুরে বেড়াত। আর ফরমান তার দপ্তরে বসে আঁটত ফন্দী।

আলবদর নিয়ে নৃশংসতম অত্যাচার চালাবার নীতিতে বিশ্বাস করত।
গোড়া থেকেই এরা একে অপরকে সহ্য করতে পারত না। যুদ্ধ শুরু হতেই মতবিরোধটা ভীষণ ভাবে বাড়ল। রাও ফরমান বলল, নিয়াজির গোটা প্ল্যানিংটাই ভুল, তাই এই বিপর্যয়।
নিয়াজি বলল, আমাকে ইসলামাবাদ যেমন বলেছে আমি তেমন করেছি—অত বিশাল ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা আমার কোথায়।
ফরমান আলি ঘোরতর নিয়াজি-বিরোধী হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে তার তেমন কিছুই করার ছিল না। কারণ নিয়াজি পদ মর্যাদায় তার চেয়ে ওপরে—সে মেজর জেনারেল, আর নিয়াজি লেফ্‌টেনেন্ট জেনারেল। তাই রাও ফরমান নিয়াজির বিরুদ্ধে যা করার করত কৌশলে—অপরের মারফৎ।
যুদ্ধ তিন চার দিন চলতেই ফরমান আলি নিয়াজির বিরুদ্ধে একটা বেশ ভাল মত ব্যবস্থা নিল। সে গিয়ে ধরল পূর্বপাকিস্তান সরকারের পাঞ্জাবী চিফ সেক্রেটারি মুজাফ্‌ফর হুসেনকে। বলল: মাতাল নিয়াজিটা নিজেকে বড় করে দেখাবার জন্য ইসলামাবাদে যুদ্ধের সব ভুল খবর পাঠাচ্ছে। আমাদের অবস্থা যে শোচনীয় সেটা সে প্রেসিডেন্টকে জানাচ্ছেই না। আমাদের সেনাবাহিনী যে মার খেয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছে সে খবরও ইসলামাবাদ পায়নি। অথচ বাস্তব পরিস্থিতিটা ইসলামাবাদের জানা উচিত। আমার অনুরোধ, আপনি সঠিক পরিস্থিতিটা প্রেসিডেন্টকে জানান। আমিই জানাতাম। কিন্তু সামরিক রীতি অনুসারে আমি তা পারি না। আমি নিয়াজির সাবঅরডিনেট। সাবঅরডিনেট কখনও সুপিরিয়রের রিপোর্টের বিরুদ্ধে রিপোর্ট পাঠাতে পারে না।
ফরমানের প্রস্তাবটা তার ভালই মনে হল। তাই চিফ সেক্রেটারি নিজেই বিস্তারিত জানিয়ে প্রেসিডেনটকে একটা জরুরী বার্তা পাঠাল।
ইয়াহিয়া নিজেই তখন ভীষণ বিপন্ন।
ঢাকা থেকে হুসেনের এই বার্তা পেয়ে ইয়াহিয়া তাই ভীষণ ঘাবড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববাংলার লড়াই পরিচালনার জন্য চারজনকে নিয়ে একটা কমিটি করে দিল। বলল : সুদূর পূর্ববাংলা থেকে এখন নিয়মিত খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছে না। বেতার যোগাযোগ ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় আমার পক্ষে পূর্ববাংলার যুদ্ধ সম্পর্কে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। তাই, এই কমিটি করে দেওয়া হল। এই কমিটিই পূর্ববাংলার যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেবে।
প্রেসিডেনট এই কমিটির সদস্য করল চারজনকে : গভরনর মালিক, নিয়াজি, চিফ সেক্রেটারি এবং রাও ফরমান আলি।
এই কমিটি গঠনের নির্দেশটা যখন ঢাকায় এসে পৌঁছল তখন বাংলাদেশে পাক ফৌজের অবস্থা আরও কাহিল।
চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে পরামর্শ করে ফরমান আলি সেই চারজনের কমিটির সামনে এমন একটা প্রস্তাব আনল যাকে ঠিক পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ বলা না গেলেও কার্যত সেটা শর্তাধীন আত্মসমর্পণই।
নিয়াজি কিন্তু এই প্রস্তাবের বিরোধী।
গভরনর মালিক মোটামুটি নিরপেক্ষ থাকল।
চিফ সেক্রেটারি ফরমান আলির প্রস্তাবটা খুব জোরে সমর্থন করল।
এটা ৯ ডিসেম্বরের ঘটনা।
নিয়াজির আপত্তিও ফরমান আলি তেমন মানল না। কারণ, পাক সেনাবাহিনীর অফিসারদের একটা বেশ বড় অংশও তখন তার সমর্থক। তাদেরও প্রাণে ভয় ঢুকে গিয়েছে।
ফরমান একটা খসড়া প্রস্তাব তৈরী করল। এবং সেই প্রস্তাব নিয়ে ঢাকার মারকিন, বৃটিশ, ফরাসী রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গেও কথা বলল। আর কথা বলল ঢাকায় নিযুক্ত রাষ্ট্রসংঘের ত্রাণ টিমের প্রধান পল হেনরির সঙ্গে।
ফরমান আলি তাদের সবাইকে জানাল যে এই সিদ্ধান্ত ওই চারজনের কমিটি দ্বারা অনুমোদিত।
একমাত্র মারকিনী রাষ্ট্রদূত ছাড়া আর সবাই এতে সম্মতি জানাল।
মারকিন রাষ্ট্রদূত বলল,
যে আত্মসমর্পণের প্রস্তাবে নিয়াজির সম্মতি নেই, যে প্রস্তাব প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খান অনুমোদিত নয় সে প্রস্তাবের মূল্য কী?
অন্যরা সবাই বলল, না, এ প্রস্তাবটা ভালই।
ঢাকার ইনটারকনটিনেনটাল হোটেলে সমবেত বিদেশীরা এবং পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরাও প্রস্তাবে সমর্থন জানাল।

AMARBOI.COM

ঢাকা মুক্তির পর।
আত্মসমর্পণের মুখে অসংখ্য রাইফেল
এল এম জি, বাজুকা ফেলে গেছে।
সবই আনকোরা।
ইরাণ, আমেরিকা থেকে আমদানী
কোন কোন চালানের প্যাকিং অবধি
খোলা হয়নি। মিত্রবাহিনীর
জওয়ানরা লিস্ট বানাচ্ছেন।

পরদিন ফরমান আলি প্রস্তাবের একটা কপি
দিয়ে দিল পল হেনরিকে।
এবং, তাঁকে অনুরোধ জানাল যেন রাষ্ট্রসংঘের
মাধ্যমে এই প্রস্তাব ভারতীয়দের জানিয়ে
কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা হয়।
হেনরি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুইস দূতাবাসের
বেতারযন্ত্র মারফৎ সেই খবর
নিউইয়রকে পাঠিয়ে দিলেন।
ফরমান আলি প্রস্তাবের একটা কপি পাঠিয়ে দিল
প্রেসিডেনট ইয়াহিয়ার কাছেও।
নিউইয়রকে প্রস্তাবটা পেঁছতেই খবরটা
জানাজানি হয়ে গেল। ১৩ ডিসেমবর একজন
সাংবাদিক ইয়াহিয়াকে জিজ্ঞেস করল ঃ

প্রেসিডেন্ট, খবরটা কি সত্যি ? আপনার ফোর্স পূর্ব-পাকিস্তানে আত্মসমর্পণ করছে ? মদ্যপানে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নিয়াজির সাকুরদা ! সকাল থেকেই হুইস্কির গ্লাস নিয়ে বসে !

প্রশ্ন শোনামাত্র ক্ষেপে উঠলেন। বললেন ঃ
সব ঝুটা। আমরা আত্মসমর্পণ তো করবই না,
দুতিন দিনের মধ্যেই
ভারতীয় কুত্তাদের ঠাণ্ডা করে দেবো।
এই খবরও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেতারে ছড়িয়ে
পড়ল গোটা বিশ্বে।
ছড়িয়ে পড়ল ঢাকায়ও।
নিয়াজি তখন
মদ্যপান করছিল ইনটারকনটিনেনটাল হোটেলে
বসে। চতুর্দিকে কিছু বিদেশী সাংবাদিক
ঘিরে। নিয়াজিও তাদের কাছে ঘোষণা করল ঃ
আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই করব।
ঢাকার প্রতি ইঞ্চি মাটির জন্য আমার সৈন্যরা
লড়াই চালাবে।
আত্মসমর্পণের প্রশ্নই ওঠে না।
নিয়াজি সেদিন এমনিতেই খুশী ছিল। কারণ,
রাও ফরমানকে শায়েস্তা করার একটা মস্ত
সুযোগ পাওয়া গিয়েছে।
সেদিন থেকেই রাও ফরমান কার্যত
নজরবন্দী হল।

ওদিকে তখন পূর্ব ও উত্তর দিক থেকে
মিত্রবাহিনী ঢাকার প্রায় পনেরো মাইলের
মধ্যে পেঁছে গিয়েছে।
৫৭নং ডিভিশনের দুটো ব্রিগেড এগিয়েছে
পূর্ব দিক থেকে। উত্তর দিক থেকে
এসেছে গন্ধর্ব নাগরার ব্রিগেড এবং
টাঙ্গাইলে নামা ছত্রী সেনারা।

AMARBOI.COM

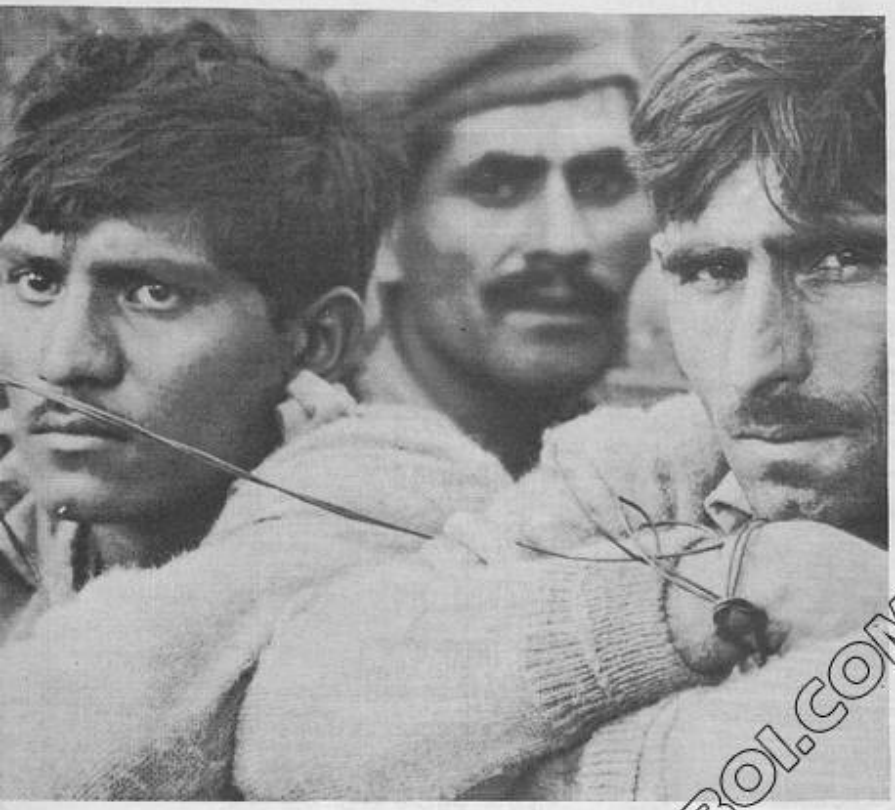

পিনভির সেই সব ঘাতক।
এরাই বলেছিল—
বাংলাদেশ ইজ ফিনিসড্!
কুর্মিটোলার ক্যানটনমেনটে বন্দীদল
বসে। এরাই ন' মাস ধরে লুটের
নোট বাংলাদেশের
ডাকঘরে ডাকঘরে লাইন দিয়ে
পশ্চিম পাকিস্তানে মনিঅর্ডার
করেছে। সোনাদানা বেচে দিয়ে হাবিব
ব্যাঙ্ক, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব
পাকিস্তানে পাশ বইতে জমা দিয়েছে।

পশ্চিমে সেদিন ৪নং ডিভিশনও মধুমতী
পার হয়ে পৌঁছে গিয়েছে পদ্মার তীরে।
উত্তর এবং পূর্ব দিক থেকে
মিত্রবাহিনীর কামানের গোলাও পড়া শুরু হয়েছে
কুরমিটোলা ক্যানটনমেনটে।
এবং বিমানবাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলিও
বার বার হানা দিচ্ছে ঢাকার সব ক'টা
সামরিক ঘাঁটির উপর।
পাকবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য
মিত্রপক্ষ সেদিন সর্বতোভাবে সচেষ্ট।
একদিকে চলছে কামানে-বিমানে তীব্র আক্রমণ,
আর একদিকে বেতারে প্রচারিত হচ্ছে
আত্মসমর্পণের আবেদন।
জেনারেল মানেকশর বাণী সেদিন প্রচারিত হল
রাও ফরমান আলির উদ্দেশে।
জেনারেল মানেকশ বললেন ঃ
আমার সৈন্যরা এখন ঢাকাকে ঘিরে ধরেছে এবং
ঢাকার সেনানিবাস কামানের গোলার পাল্লার মধ্যে।
সুতরাং, আপনারা আত্মসমর্পণ করুন।
আত্মসমর্পণ না করলে নিশ্চিত মৃত্যু।
যারা আত্মসমর্পণ করবে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা
করা হবে এবং তাদের প্রতি
ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা হবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সেদিন শত শত
পাক সেনা আত্মসমর্পণ করল।
এক ময়নামতিতেই আত্মসমর্পণ করল
১১৩৪ জন।
কিন্তু তখনও নিয়াজি অবিচল।
তখনও সে লড়াই চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
এবং, তখনও তার সঙ্গে একমত হয়ে
প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে
খুলনা, বগুড়া এবং চট্টগ্রামের পাক অধিনায়করা।

১৪ ডিসেম্বর

নিয়াজি তখনও গোঁ ধরে বসে আছে, কিন্তু
আর প্রায় সকলেরই হৃৎকম্প উঠে গিয়েছে।
১৩ তারিখ রাত থেকে ১৪ তারিখ ভোর পর্যন্ত
পূব এবং পশ্চিম দিক থেকে মিত্রবাহিনীর
কামান অবিরাম গোলা মেরে চলল।
গোলাগুলি পড়ল গিয়ে প্রধানত
ঢাকা ক্যানটনমেনটে। কিন্তু সে গোলার
আওয়াজে সারারাত ধরে গোটা ঢাকা কাঁপল।
ঢাকার সবাই সেদিন ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।
বুঝল, আর রক্ষা নেই।
গভরনর মালিক সেদিন সকালেই
"সমগ্র পরিস্থিতি" বিবেচনার জন্য
গভরনর হাউসে মন্ত্রিসভার এক জরুরী বৈঠক
ডাকল। এই বৈঠক বসাবার ব্যাপারেও
ফরমান আলি এবং চীফ সেকরেটারি
মুজফ্ফর হুসেনের হাত ছিল।
তারা তখনও মনে করছে,
আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায় নেই, রক্ষা নেই।
মন্ত্রিসভার বৈঠক বসল বেলা এগারোটা নাগাদ।
এবং, একটা পাকিস্তানী ওয়্যারলেস মেসেজ
ধরে মিত্রবাহিনীও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই
জেনে গেল সেই বৈঠকের খবরটা। সঙ্গে সঙ্গে
সংবাদ চলে গেল ভারতীয় বিমানবাহিনীর
পূর্বাঞ্চলীয় হেড কোয়ার্টারে।
এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক ঝাঁক
ভারতীয় জঙ্গী বিমান উড়ে এল
ঢাকার গভরনর হাউসের উপর।
একেবারে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তারা ছুঁড়ল রকেট।
গোটা পাঁচেক গিয়ে পড়ল একেবারে
গভরনর হাউসের ছাতের উপর।
মিটিং তখনও চলছিল।
মালিক এবং তার মন্ত্রীরা ভয়ে প্রায় কেঁদে
উঠল। চীফ সেকরেটারি, আই. জি. পুলিশ প্রভৃতি
বড় বড় অফিসাররাও মিটিং-এ উপস্থিত

AMARBOI.COM

ছিল। তারাও ভয়ে যে যেমন পারল পালাল।
বিমান হানা শেষ হওয়ার পর মালিক সাহেব
তার পাত্র-মিত্রদের সঙ্গে আবার বসলেন।
এবং তারপর আর পাঁচ মিনিটও
লাগল না তাদের সিদ্ধান্তে পেঁাছতে।
তারা সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করলেন ঃ আমরা
সবাই পদত্যাগ করলাম।
সেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত তারা সঙ্গে সঙ্গে
ঢাকার আন্তর্জাতিক রেডক্রশ কমিটির
প্রতিনিধি রেনড সাহেবকে জানাল এবং তাঁর
কাছে আশ্রয় চাইল।
রেনড সাহেব তখন ইনটারকনটিনেনটাল হোটেলকে
রেডক্রশের অধীনে "নিরপেক্ষ এলাকা"
করে নিয়েছেন। এই "নিরপেক্ষ এলাকা" তখন
ঢাকায় একটা অদ্ভুত জিনিস। গোটা ঢাকা
তখনও পাকিস্তানীদের দখলে, শুধু এই
হোটেলটা ছাড়া! হোটেলটার উপরে
রেডক্রশের বিরাট বিরাট পতাকা উড়ছিল। বহু
বিদেশী এবং পশ্চিম পাকিস্তানী আশ্রয়
নিয়েছিল ওই হোটেলে। ১৪ তারিখ সেখানে
সদলবলে গিয়ে আশ্রয় নিল মালিক সাহেব।
তখন ঢাকায় সবাই মনে করছে ওইটাই একমাত্র
নিরাপদ আশ্রয়—ভারতীয় বৈমানিকরা
কিছুতেই রেডক্রশের বড় বড় পতাকা ওড়া
বাড়িতে আক্রমণ করবে না।

রেনড সাহেব তার এলাকায় ওদের আশ্রয়
দিয়েছে খবর পাঠালেন জেনিভায়।
সেই বার্তায় বলা হল ঃ
পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সর্বোচ্চ অফিসাররা
পদত্যাগ করেছেন এবং রেডক্রশ
আন্তর্জাতিক অঞ্চলে আশ্রয় চেয়েছেন।
জেনিভা চুক্তি অনুযায়ী তাদের আশ্রয় দেওয়া
হয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশ সরকারকে
যেন অবিলম্বে সমস্ত ঘটনা জানানো হয়।
খবরটা যেন ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে
জানানো হয়।
মালিক এবং তার গোটা
"পূর্ব পাকিস্তান সরকারের" এই সিদ্ধান্তের
পর নিয়াজির অবস্থা আরও কাহিল হল।
ঢাকার উপর তখন প্রচণ্ড আক্রমণ চলছে।
আক্রমণ চলছে কামানের।
আক্রমণ চলছে বিমানের। প্রধান লক্ষ্য
কুরমিটোলা ক্যানটনমেনট। নাগরার বাহিনী
তখন টঙ্গির কাছে পেঁাছে গিয়েছে।
এবং পাক সেনারা শীতলক্ষা নদীর একটা শাখার
উপরের ব্রিজটা উড়িয়ে দিয়ে ওপার থেকে
তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে।
মূল পাকবাহিনীটা কিন্তু কামান এবং বিমান
আক্রমণে প্রায় পাগল হয়ে গিয়ে কুরমিটোলা
ছেড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশ্রয়

১৬ ডিসেমবর। শুক্রবার। ১৯৭১।
বেলা ১০টা ৪০ মিনিটে ভারতীয়
জওয়ানদের প্রথম ব্যাটালিয়ন ঢাকায়
ঢুকলো।

AMARBOI.COM

একটি বন্দী ট্যাংক।
১৭ ডিসেমবর সকালে ঢাকার রাস্তায় ছেলেমেয়েরা ঘিরে ধরেছেন। ভারতীয় ট্যাঙ্ক ক্রু নানান্ খুটিনাটি নাগাড়ে বুঝিয়ে চলেছেন।

নিয়েছে। পূবদিকের বাহিনীটাও প্রায় পৌঁছে গিয়েছে ডেমরায়।
তবু নিয়াজি তখনও বলছে ঃ
আমি শেষ পর্যন্ত লড়ে যাব।
নিয়াজি অবশ্য একথাটা বলছিল প্রধানত মারকিনীদের ভরসায়। মারকিনী সপ্তম নৌবহর যে বঙ্গোপসাগরের দিকে এগোচ্ছে এখবর চার পাঁচ দিন আগে থেকেই জানা গিয়েছিল। গোটা দুনিয়ায় তখন সপ্তম নৌবহরের বঙ্গোপসাগরে আগমন নিয়ে জোর জল্পনা-কল্পনা চলছে।
মারকিন সরকার যদিও ঘোষণা করলেন যে কিছু আমেরিকান নাগরিককে অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জনাই সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে যাচ্ছে।
আসলে কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করল না। সকলেরই মনে তখন বেজায় সন্দেহ।
সকলেরই মনে তখন প্রশ্ন, প্রেসিডেনট নিকসন কি ইয়াহিয়ার রক্ষার্থে মারকিন নৌবহরকে আসরে নামাবেন?
ঠিক কী উদ্দেশ্যে মারকিন সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে এসেছিল এবং কেনই বা তারা কিছু না করে (বা করতে না পেরে) ফিরে গেল সে রহস্যের এখনও সম্পূর্ণ কিনারা হয়নি। তবে ইতিমধ্যেই ঢাকায় এইটুকু জানা গিয়েছে যে ইসলামাবাদের খবর মত ১৪ ডিসেমবর নিয়াজি আশা করেছিল যে সপ্তম নৌবাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলি তার সাহায্যে আসরে নামবে।
ইয়াহিয়া নিজে নাকি নিয়াজিকে সে খবর জানিয়েছিল।
সেই ভরসায়ই ১৪ তারিখেও নিয়াজি বলে চলেছে ঃ একেবারে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালাব।
ওদিকে মিত্রবাহিনী তখন প্রচণ্ডভাবে ঢাকার সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তখনও তারা ঠিক জানে না যে ঢাকার ভেতরের অবস্থাটা কী। অর্থাৎ, পাকবাহিনী কীভাবে ঢাকার লড়াই লড়তে চায় এবং ঢাকায় তাদের শক্তিই বা কতটা। সে খবর মিত্রবাহিনী জানে না। নানাভাবে এই খবর সংগ্রহের চেষ্টা হল। কিন্তু আসল খবরটা কিছুতেই পাওয়া গেল না। যা পাওয়া গেল সব ভুল।
সেই ভুল খবরগুলির একটা ঃ
পাকিস্তানীরা গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়ে পরিখা খনন করে হাউস টু হাউস লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।
আর একটা খবর ঃ ঢাকায় পাকবাহিনীর অন্তত দেড় ডিভিশন সৈন্য রয়েছে।
এবং রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র।
এই দুটো খবরই ভুল ছিল। কিন্তু তখনকার মত এই খবর দুটোই ঠিক মনে হয়েছিল

AMARBOI.COM

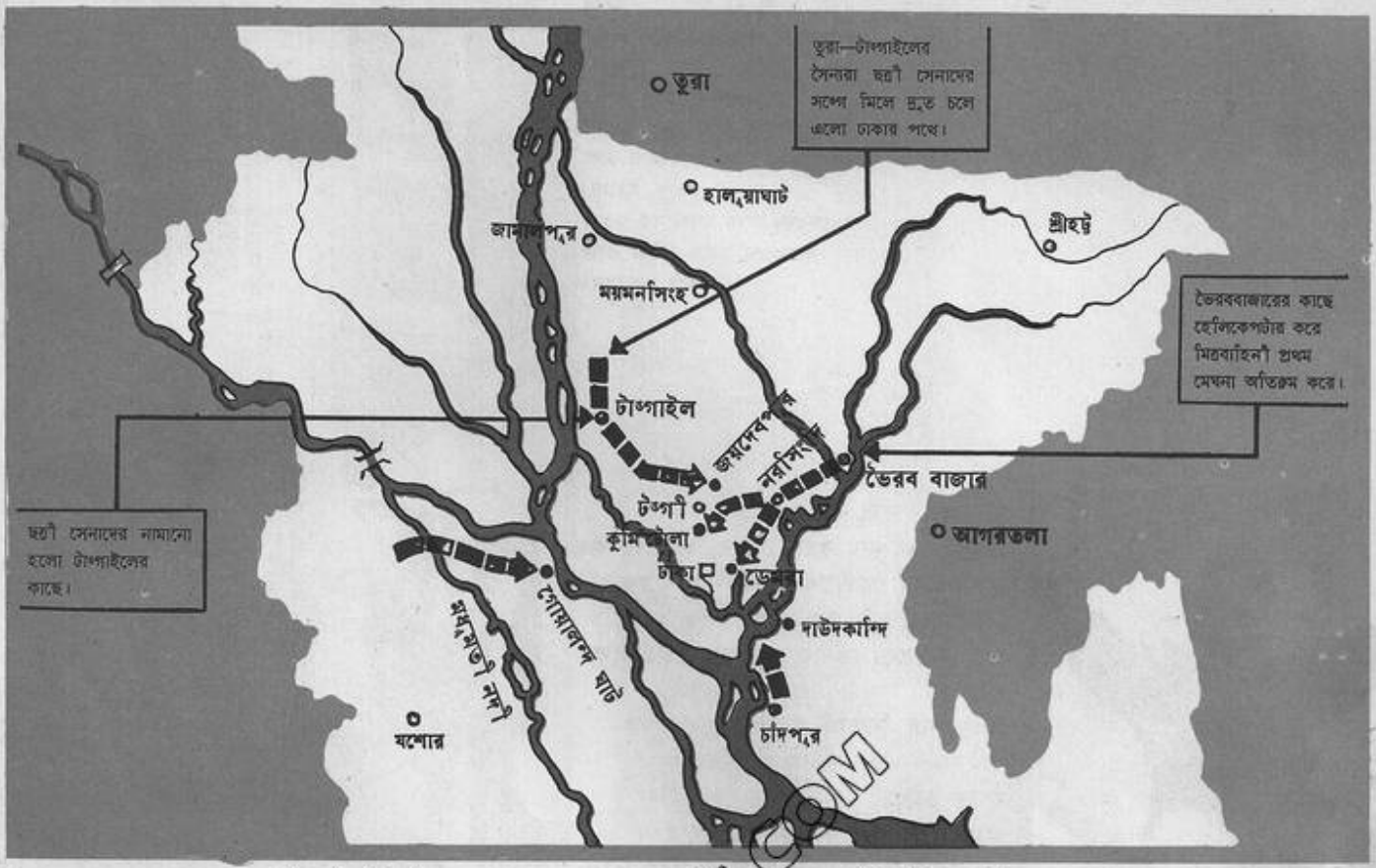

মিত্রবাহিনী এই অবস্থায় মনে করল যে ঢাকার ভেতরে লড়াই করার জন্য যদি সৈন্যদের এগিয়ে দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ বিমান আক্রমণ চালানো হয় তাহলে লড়াইয়ে প্রচুর সাধারণ মানুষও মরবে। মিত্রবাহিনী এইটা কিছুতেই করতে চাইছিল না। তাই, ওইদিনই তারা একদিকে যেমন আবার পাকবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের আবেদন জানাল এবং তেমনি আর একদিকে ঢাকার সাধারণ নাগরিকদের অনুরোধ জানাল, আপনারা শহর ছেড়ে চলে যান। যত তাড়াতাড়ি পারেন ঢাকা শহর ত্যাগ করুন। উত্তর এবং পূর্ব—রাজধানীর দুদিকেই তখন আরও বহু মিত্রসেনা এসে উপস্থিত হয়েছে। চাঁদপুরেও আর একটা বাহিনী তৈরী হচ্ছে নদীপথে অগ্রসর হওয়ার জন্য।

১৫ ডিসেম্বর

আগেই বলা হয়েছে, নিয়াজি মার্কিন সপ্তম নৌবহরের সাহায্য আশা করছিল। এবং, সেই ভরসায়ই দিন গুনছিল। কিন্তু ১৩ বা ১৪ তারিখ কোনও একটা সময়ে নিয়াজি বুঝল, না, মার্কিন সপ্তম নৌবহর তাকে সাহায্য করতে আসরে নামবে না। এই জিনিষটা ঠিক কখন এবং কীভাবে নিয়াজি জানল সেটা বলা মুসকিল। এখনও সে তথ্য প্রকাশিত হয়নি। ভবিষ্যতে হয়ত কোনও দিন জানা যাবে এবং তখন বোঝা যাবে আসল ব্যাপারটা।

তবে, ইতিমধ্যেই যতটা জানা গিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে ১৪ ডিসেমবর সকাল থেকেই নিয়াজি সব আশা ছেড়ে দিয়েছে। ওইদিনই সে শর্তসাপেক্ষ আত্মসমর্পণের প্রস্তাব নিয়ে ঢাকার বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাসের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করল। বিশেষত, মার্কিনীদের সঙ্গে। ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের কর্মীরা সেই প্রস্তাবটা পাঠিয়ে দিলেন দিল্লির মার্কিন দূতাবাসে। তাঁরা আবার খবরটা পাঠালেন ওয়াশিংটনে।

তখন ওয়াশিংটন ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাসের কাছে জানতে চাইল, নিয়াজির প্রস্তাবে ইয়াহিয়ার সমর্থন আছে কিনা? ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাস বহু চেষ্টা করেও সেদিন ইয়াহিয়াকে ধরতেই পারল না। নিয়াজির ১৪ তারিখের প্রস্তাবও কার্যত ফরমান আলির ১০ তারিখের প্রস্তাবেরই

AMARBOI.COM

১৬ ডিসেম্বর। শুক্রবার। ১৯৭১।
বেলা ১০টা ৪০ মিনিটে ভারতীয়
জওয়ানদের প্রথম ব্যাটালিয়ন ঢাকায়
ঢুকলো।
মুক্তিপাগল ঢাকার মানুষ
দু' হাত তুলে ওঁদের স্বাগত
জানাচ্ছেন। এতদিন পরে মৃত ঢাকা
আবার জেগে উঠলো।
জওয়ানদের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করতে
কয়েকজন তরুণ লরির ওপর
উঠে পড়েছেন।

মত ছিল। মূল কথা ঃ
আমরা যুদ্ধ বন্ধ করছি। তবে, আমাদের অর্থাৎ
বাংলাদেশের গোটা পাকবাহিনীকে কয়েকটা
কেন্দ্রে জড় হয়ে চলে যেতে দিতে হবে।
এবং, আমাদের কোনও লোককে গ্রেফতার করা
চলবে না।
শোনা যায়, নিয়াজি মারকিন দূতাবাসের
কাছ থেকে এই আশ্বাস পেয়েছিল যে
সপ্তম নৌবহর
তার লোকজনকে পশ্চিমে নিয়ে যাবে।
মারকিন দূতাবাস এবং মারকিন সরকার যে
এই সময় বাংলাদেশের লড়াইয়ের ব্যাপারে
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল তাতে সন্দেহ
নেই। তবে, তাঁদের ভূমিকার কোনও
বিস্তারিত বিবরণ এখনও জানা যায়নি।
ঢাকার অন্যান্য কতকগুলি বিদেশী দূতাবাস
কিন্তু এই সময় নিয়াজিকে আত্মসমর্পণের
পরামর্শ দিয়েছিল। তাছাড়া, বাংলাদেশের
পাক সেনাবাহিনীর এবং ঢাকার "বিশিষ্ট"
পাকিস্তানীদেরও চাপ ছিল আত্মসমর্পণের জন্য।
বিদেশীরাও বুঝেছিল,
এই লড়াই আর চালিয়ে নিয়াজি কোনও
সুবিধা করতে পারবে না। শুধু লোক মারা
যাবে। ঢাকার পাক সেনারা এবং পাকিস্তানীরা
আরও বুঝেছিল,
যদি আত্মসমর্পণ না করা হয় তাহলে
মুক্তিবাহিনীর হাতে কচুকাটা হতে হবে।
১৫ তারিখ দিল্লির মারকিন দূতাবাস মারফৎ
খবরটা পৌঁছল ভারত সরকারের কাছে—
নিয়াজি আত্মসমর্পণ করতে চায়,
তবে কতকগুলি শর্তসহ। প্রধান শর্ত,
পশ্চিম পাকিস্তানীদের সবাইকে
চলে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে এবং কাউকে
গ্রেফতার করা চলবে না।
ভারত সরকার এই প্রস্তাবটা সঙ্গে সঙ্গেই নাকচ

AMARBOI.COM

AMARBOI.COM

করে দিলেন। বললেন ঃ
শর্তটর্ত নয়; বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের পাকবাহিনীকে অবশ্য এ আশ্বাস দিতে রাজি যে যুদ্ধবন্দীরা জেনিভাচুক্তিমত ব্যবহার পাবে।
নিয়াজি যে পুরো ভেঙ্গে পড়েছে, ঢাকার যুদ্ধ চালাবার মত মনোবল যে তার বা তার বাহিনীর মোটেই নেই এটা কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তখনও জানেন না।
ঢাকার ভেতরের খবরাখবর ভারতীয় বাহিনী খুব কমই পাচ্ছিল।
নিয়াজির শর্তসাপেক্ষ আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পেয়ে ভারতীয় বাহিনী মনে করল, এটা নিয়াজির একটা কৌশল।
আসলে সে কিছুটা সময় চাইছে যাতে সপ্তম নৌবহরের সাহায্যে সৈন্যসামন্ত পাত্রমিত্র নিয়ে বাংলাদেশ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।
নিয়াজি যে প্রস্তাব দিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে তার একমাত্র মানে দাঁড়াল যুদ্ধবিরতি—আত্মসমর্পণ নয়।
কিন্তু মিত্রবাহিনী তখন বিনাশর্তে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুতেই রাজি নয়।
দিল্লির মারকিন দূতাবাস মারফৎ সেই কথা জানিয়ে দেয়া হল নিয়াজিকে।
আর বলা হল ঃ আমাদের প্রস্তাব ভেবে দেখার জন্য আপনাকে ১৬ তারিখ সকাল নটা পর্যন্ত সময় দেয়া হল। ভারতীয় বিমানবাহিনী ওই সময় পর্যন্ত কোনও আক্রমণ করবে না।
কিন্তু মিত্রপক্ষের স্থল ও নৌবাহিনী যথারীতি অগ্রসর হতে থাকবে।
যদি সকাল ৯টার মধ্যে আত্মসমর্পণের খবর না পাই তাহলে তখন থেকে আবার বিমান বাহিনীর আক্রমণ পুরোদমে সুরু হবে।
ঢাকার ভেতরে পাকবাহিনীর অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের মনোবল একেবারে ভেঙে গিয়েছে।

জেনারেল মানেকশ তাঁর শেষ বার্তায় পিনডিকে বলেছিলেন ঃ সকাল নটার মধ্যে বেতারে জানাতে হবে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করছেন কিনা। একটা বেতার ফ্রিকোয়েনসিও বলে দিয়েছিলেন।

শোনা যায় নিয়াজি সেদিন সারারাত ধরে ইসলামাবাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাসেরও সাহায্য নেয়। কিন্তু কোনও ফলই হল না।

ইয়াহিয়া খাঁকে কিছুতেই পাওয়া গেল না। ওদিকে তখন মিত্রবাহিনীর কামানের গোলার আওয়াজ বাড়ছে এবং পাকবাহিনীতে ত্রাসও বাড়ছে। ঢাকার অসামরিক পাকিস্তানীরাও আত্মসমর্পণের পক্ষে চাপ বাড়াচ্ছে। চাপ দিচ্ছে কয়েকটা বিদেশী দূতাবাসও।

১৬ ডিসেম্বর

সকালে নিয়াজি আবার কয়েকজন বিদেশী দূতের সঙ্গে কথা বলল এবং শেষ পর্যন্ত স্থির করল যে মানেকশর প্রস্তাবই মেনে নেবে। তখন সুরু হল ওই ফ্রিকোয়েনসিতে গিয়ে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা। কয়েকজন বিদেশীর সঙ্গে বসে নিয়াজি বার বার সেই চেষ্টা করতে থাকল। সকাল প্রায় সওয়া আটটা থেকে। কিন্তু কিছুতেই যোগাযোগ করতে পারল না। নটা যখন বাজে বাজে তখন গোটা ঢাকা আকাশবাণীর কলকাতা স্টেশন খুলে কান পেতে বসে রয়েছে। তাঁরাও ভীষণ ভীত। তাঁরাও বুঝতে পারছিলেন, ঢাকার লড়াই যদি হয়ই তাহলে তাঁদেরও অনেকের প্রাণ যাবে। তাঁরাও তখন জানতে একান্ত আগ্রহী নিয়াজি মানেকশর প্রস্তাবে রাজী হয় কিনা। কিন্তু হায়, নটার সংবাদে তাঁরা আকাশবাণী

মুক্তিসেনানী ঢাকায় ঢুকছেন।

AMARBOI.COM

পিঠমোড়া করে হাত বাঁধা ইয়াহিয়ার সোলজারদের ট্রাকে তোলা হচ্ছে। শত্রুর ভক্ত নিরস্ত্রের যমদের ঠিকানা এখন—বন্দীশিবির। ট্রিগারে হাত রেখে নজর রেখেছেন ভারতীয় জওয়ান।

বাংলা খবরে জানতে পারলেন,
নিয়াজি কোনও জবাবই দেয়নি!
বিমান আক্রমণ বিরতির সময়ও শেষ হয়ে গিয়েছে!
ঠিক তখনই নিয়াজি মিত্রবাহিনীর সঙ্গে
যোগাযোগ করতে পেরেছে।
জানিয়েও দিয়েছে যে তার বাহিনী বিনাশর্তে
আত্মসমর্পণ করতে।
তখনই ঠিক হল, বেলা বারোটা নাগাদ
মিত্রবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ জেনারেল জ্যাকব
ঢাকা যাবেন নিয়াজির সঙ্গে আত্মসমর্পণের
ব্যাপারটা পাকা করতে।
ওদিকে তখন জেনারেল নাগরার বাহিনীও প্রায়
মীরপুরের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে।
ঢাকা-টাঙ্গাইল রোডের ওপর নাগরার বাহিনী
আটকে পড়েছিল। টঙ্গির কাছাকাছি।
নদীর ওপরের ব্রিজটা পাকিস্তানীরা ভেঙে
দিয়েছিল।
১৬ তারিখ ভোরে নাগরার বাহিনী নয়ারহাট
ফরেস্ট রোড দিয়ে সাভারের কাছাকাছি
এসে ঢাকা-আরিচাঘাট রোডের উপর পড়ল।
পাকবাহিনী এই রাস্তায় ভারতীয় বাহিনীকে
আশাই করেনি। তাই ওদিকে কোনও
প্রতিরোধের ব্যবস্থাই রাখেনি। এমন কি,
ব্রিজগুলি পর্যন্ত ভাঙেনি। আরিচাঘাট রোডে
পড়ে গন্ধর্ব নাগরার বাহিনী সোজা ঢাকার
দিকে এগোলো। মাত্র কয়েক মাইল।
প্রথমেই মীরপুর। পাকবাহিনীর জেনারেল
জামসেদ সেখানে গিয়ে
নাগরার কাছে আত্মসমর্পণ করল।
নাগরার বাহিনী ঢাকা ঢোকার কয়েক মিনিটের
মধ্যেই জেনারেল জ্যাকব হেলিকপটারে
ঢাকা পৌঁছলেন। নিয়াজির সঙ্গে কথাবার্তা
পাকা হল। আত্মসমর্পণের দলিলও তৈরী হল।
বিকাল ৪টা নাগাদ সদলবলে ঢাকা পৌঁছলেন
মিত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরা।
৪-২১ মিনিটে ঢাকার রেস কোরসে জনতার
"জয় বাংলা" ধ্বনির মধ্যে নিয়াজি
আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করল।
বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা
পাকবাহিনীর কাছে ততক্ষণে আত্মসমর্পণের
নির্দেশ চলে গিয়েছে।
সেদিন লড়াই চলছিল শুধু চট্টগ্রাম এবং
খুলনায়। পাক নবম ডিভিশনের প্রধান
ওইদিন সকালে নিজে থেকেই আত্মসমর্পণ
করেছিল। মধুমতী নদীর পূর্ব তীরে।
চট্টগ্রাম শহরেও ভারতীয় সৈন্য তখন প্রায় ঢুকে
পড়েছে। আর খুলনার পাকবাহিনীর
একটা অংশ তখন খালিসপুরের অবাঙ্গালী
জনবসতির মধ্যে ঢুকে পড়ে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে
যুদ্ধ চালাচ্ছে।
নিয়াজির আত্মসমর্পণের পর সব যুদ্ধই থেমে গেল।
১৬ ডিসেম্বর থেকেই বাংলাদেশ মুক্ত এবং স্বাধীন।

AMARBOI.COM

INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

AMARBOI.COM

Jagjit Singh

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
Indian and BANGLA DESH Forces in the
Eastern Theatre

16 December 1971.

AAK Niazi Lt Gen

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (PAKISTAN)

16 December 1971.

'আমি আর আমার ফৌজ একসঙ্গে আত্মসমর্পণ করলাম।' বৃহস্পতিবার ১৬ ডিসেমবর ঢাকায় লেঃ জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণের মুচলেকা দিচ্ছেন। পাশে বিজয়ী বীর লেফটেনান্ট জেনারেল অরোরা।

সে কী জয়ধ্বনি! সে কী আনন্দ!
সূর্য তখন সবে অস্ত গিয়েছে। হেড লাইট জেবলে ঢাকা শহরে ঢুকছে মিত্র বাহিনীর একটার পর একটা কনভয়। সব গাড়ি চলেছে কুরমিটোলা ক্যানটনমেনটের দিকে। কিন্তু বাধাহীন ভাবে এগোবার কোনও উপায় নেই। পথে পথে আনন্দে পাগল মানুষ গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে মিত্র বাহিনীর সেনাদের জড়িয়ে ধরলেন। জানালেন তাঁদের প্রাণের ভালবাসা এবং চিরজীবনের কৃতজ্ঞতা।
সমগ্র বাংলাদেশ, সমগ্র ঢাকা সেদিন আনন্দে পাগল।
ঢাকার সেই বিখ্যাত ইনটারকনটিনেনটাল হোটেল। ওপরে উড়ছে রেডক্রশের বড় বড় পতাকা। ভেতরে আশ্রিত মানুষের ভিড়। আশ্রিতদের মধ্যে রয়েছেন পদত্যাগী গভরনর মালিকও। রয়েছেন আরও বহু বিদেশী এবং পাকিস্তানী। এতদিন পাকিস্তানীরাই ছিলেন সেখানে প্রভু, বাঙালীরা দাস। গোটা বাংলাদেশে পাক শাসনে এইটাই ছিল রেওয়াজ।
১৬ ডিসেমবর থেকে ব্যবস্থাটা একেবারে পাল্টে গেল। বাংলাদেশে বাঙালীরা স্বাধীন, মুক্ত—পাকিস্তানীরা বন্দী।
সন্ধ্যা হতেই হোটেলের সব আলোগুলি জেবলে দিলেন বাঙালী কর্মীরা।
সব বাঙালী কর্মীরা জড় হলেন হোটেলের গেটে। ভারতীয় সাংবাদিকদের সম্বর্ধনা জানাবার জন্য। জড়িয়ে ধরলেন তাঁদের। তারপর নিয়ে এলেন বিরাট বল রুমের মাঝখানে। ঘোষণা করলেন সব বিদেশী সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করেঃ আজ আমরা স্বাধীন। এই স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি ভারতীয় বন্ধুদের। শ্লোগান দিলেন "স্বাধীন বাংলা জিন্দাবাদ", "শেখ মুজিব জিন্দাবাদ", "ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ"।
এগিয়ে এলেন হোটেলের সাহেব ম্যানেজার। একটা স্যামপেনের বোতল হাতে। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ জেনটেলমেন, আসুন আজ আমরা স্বাধীন বাংলার জন্মোৎসব পালন করি! আসুন আজ আমরা আনন্দ করি! তিনদিন আগেও ওই ভদ্রলোক নিয়াজির সঙ্গে হুইসকির বোতল খুলতেন! পাকিস্তানের দীর্ঘজীবন কামনা করে গেলাসে গেলাস ঠেকাতেন!
ইনটারকনটিনেনটাল হোটেলে যখন স্বাধীন বাংলার উৎসব চলছে নিয়াজিকে তখন কুরমিটোলায় নিয়ে যাচ্ছেন জেনারেল সগৎ সিং।

AMARBOI.COM

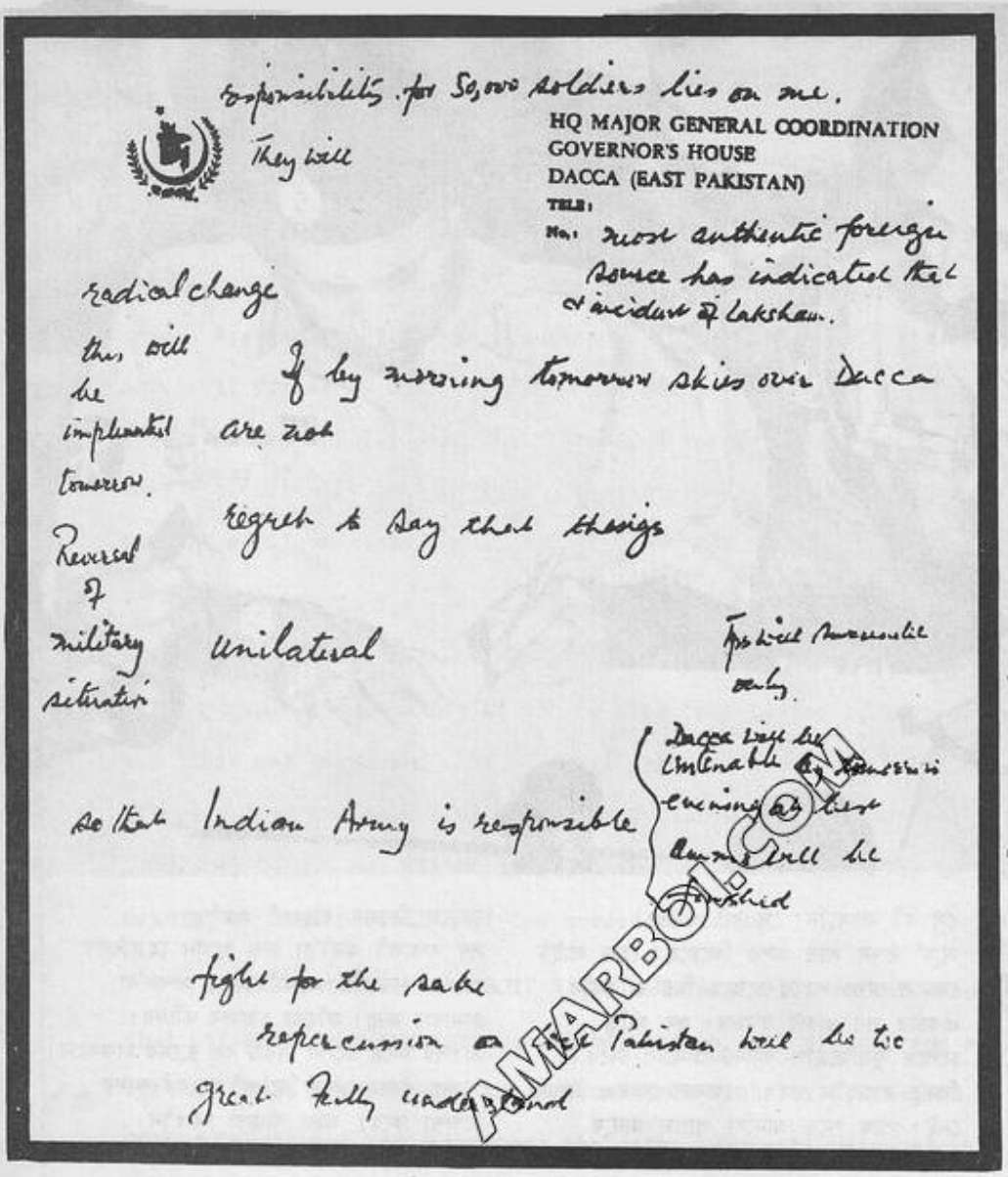

HQ MAJOR GENERAL COORDINATION
GOVERNOR'S HOUSE
DACCA (EAST PAKISTAN)
TELE:
No:

Responsibility for 50,000 soldiers lies on me.
They will
most authentic foreign source has indicated that
& incident of Laksham.
radical change
this will be implemented tomorrow.
If by morning tomorrow skies over Dacca are not
Regret to say that things
Reversal of military situation
Unilateral
Typical Mussalit daily
Dacca will be untenable by tomorrow evening at best
Army will be finished
So that Indian Army is responsible
fight for the sake
Repercussion on West Pakistan will be tie
Great Fully understand

AMARBOI.COM

ঢাকা মুক্ত হবার ঠিক আগে দখলদার বাহিনীর পাণ্ডা মেজর জেনারেল ফরমান আলি সরকারী প্যাড নিয়ে অনেক কিছু লিখেছেন। হিজিবিজি অসংলগ্ন চিন্তার কয়েকটি টুকরো—রেসপনসিবিলিটি ফর ফিফটি থাউজেনড সোলজারস লাইজ অন মি, দে উইল, মোসট অথেনটিক ফরেন সোরস হ্যাজ ইনডিকেটেড দ্যাট, অ্যানড ইনসিডেনট অব লাকসাম, রেডিক্যাল চেনজ, দিস উইল বি ইমপ্লিমেনটেড টুমরো, রিভারস্যাল অব মিলিটারি সিচুয়েশন, ইফ বাই মরনিং টুমরো স্কাইজ ওভার ঢাকা আর নট, রিগরেট টু সে দ্যাট থিংস, ইউনিলেটারেল ঢাকা উইল বি আনটেনেবল টুমরো ইভনিং অ্যাট বেসট,......উইল বি ফিনিশড, সো দ্যাট ইনডিয়ান আরমি ইজ রেসপনসিবল, ফাইট ফর দি সেক, রিপারকাশন ইন ওয়েসট পাকিস্তান উইল বি টু গ্রেট, ফুললি আনডারস্টানড......।

বোধি-বিলোপের চক্রান্ত

পানজাবী সোলজাররা মার্চ-এপারিলে সবাইকে ছেঁকে তুলতে পারেনি। চিনে চিনে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের ধরার পক্ষে সবচেয়ে বড় হ্যান্ডিক্যাপ ছিল ভাষা। নাম মুজিবর রহমান, শুধু এই অপরাধে বাংলাদেশের জেলায় জেলায় বেশ ক'জনের মুণ্ডু গেল। বাঙালী বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে নামের মিল থাকায় পশ্চিম পাকিস্তানী মুনিরুজ্জমানকেও পানজাবী সোলজারের বুলেট খেতে হল। তখন বাঙালী বিদ্বেষী এই অন্ধদের আলো দিতে বাঙালীরাই এগিয়ে এল। জামাত ইসলামের স্টুডেণ্ট উইং ইসলামী ছাত্র সঙ্ঘ। সঙ্ঘের কট্টরদের সশস্ত্র বাহিনী—আল বদর বিশিষ্ট বাঙালীদের চিনিয়ে দেবার, ধরিয়ে দেবার—অবশেষে কোতল করার ভার নিল। গেস্টাপো স্টাইলের এই বাহিনীটির জন্যে দুহাতে টাকা খরচ হত। ঝকঝকে ছাপা অসংখ্য প্যামফ্লেট ছেপে বেরোতো। ঢাকায় ১৭৭, নাখালপাড়া রোডে ওদের অফিসের বাজেট কমিটির খরচের বহর সম্প্রতি ফাঁস হয়েছেঃ ৭০ হাজার টাকা। গ্রেফতার হওয়ার পর পাণ্ডা ইস্কন্দার আলির কাছ থেকে এসব জানা গিয়েছে। যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বাধীনতার কথা বলেছেন—তাঁরাই ওদের কোতলের তালিকায় উঠেছেন। ওদের চিন্তায় যারাই ইসলাম-বিরোধী—তাঁদের বেঁচে থাকার অধিকার ফুরিয়ে যেত। প্রগতিশীল বইপত্র খুঁজে খুঁজে বের করে বাজেয়াপ্ত করানো ওদের একটা বড় কাজ ছিল। আর ছিল, যত পারা যায় আল বদরকে পুলিশে, শিক্ষকতায়, সংবাদপত্রে ঢোকানো।

আল বদরের লোকজন মাথায় পাগড়ি বেঁধে আসতো। বাড়ি বাড়ি ঢুকে যাকে পেত নিয়ে যেত। এদের শতকরা ৯২জন বাঙালী। নাটের গুরু মওলানা মওদুদি পশ্চিম পাকিস্তানী। বাংলাদেশে আল বদরের প্রধান—গোলাম আজম পতনের অনেক আগেই মক্কায় পাড়ি দেয়।

ওরা মিলিটারির সংগে জিপগাড়িতে ঘুরে বেড়াতো। সাত মসজিদ রোডে কলেজ অব ফিজিক্যাল ইন্সটিটুসনের হেড কোয়ার্টারে ওরা বুদ্ধিজীবীদের ধরে ধরে নিয়ে যেত। তারপর এম এল এ হসটেল, ধানমণ্ডীর হাইস্কুল, কাঁকরাইলের মসজিদে বন্দী শিবিরে তাঁদের ভাগ ভাগ করে পাঠিয়ে দিত।

৯ আগস্ট। ১৯৭১। ঢাকার অবাঙালী মহল্লা মহম্মদপুরে আল বদর পাণ্ডারা বৈঠকে বসে বাছাই বাঙালী লেখক, সাংবাদিক, ডাক্তার, ইনজিনিয়ার, বৈজ্ঞানিকদের সাবাড় করার ব্লু প্রিণ্ট তৈরি করল। পরে দফতর সম্পাদক আবদুল খালেক গ্রেফতার হলে আরও সব রক্ত জমানো খবর বেরোলো।

ব্লু প্রিণ্টের চিফ ডিজাইনারঃ চশমাধারী রাও ফরমান আলি। ক'বছর আগে ঢাকায় পদার্পণ কর্নেল হয়ে। এই শেষের সেদিনের ক'দিন আগে রাও সাহেব মেজর জেনারেল অবধি উঠেছিলেন। তার সহায়ক ছিল পাক আর্মির ১৩জন অফিসার। ঘাতকদের নামঃ ব্রিগেডিয়ার বসির, তাসাকুদ্দিন এবং ফকির মহম্মদ, লেফটেনাণ্ট করনেল আমানুল্লা, হিজাজি এবং রিজভি, ক্যাপটেন কাইয়ুম, ওয়াহেদ, মমতাজুল হক চৌধুরী, হাফিজ এবং খসনুদ, মেজর জহুর এবং আসলাম।

পুলিশের ভেতর থেকে দু'জন ডি এস পি ফরিদি এবং হাফিজ এদের সংগে থাকত।

ঘণ্টায় যাতে ৩০০/৩৫০জন বাছাই মানুষকে ফৌত করে বাঙালীর মেরুদণ্ড গুঁড়ো করে দেওয়া যায়—সেজন্যে আমেরিকা থেকে মৃত্যু-সিংহাসন আমদানী করা হয়েছিল। ইলেকট্রিক চেয়ারখানা ছিল চট্টগ্রামের সারকিট হাউসে। এদেরই প্রতিভায় অগণন মানুষ নিধনের ডিকসনারিতে 'জেনোসাইডের' মত শব্দের পরেই আরেকটি কথা সৃষ্টি হয়েছেঃ 'এলিটোসাইড।'

ষোল ডিসেম্বর সারেণ্ডারের ঘণ্টা দু'য়েকের ভেতর ঢাকায় শোনা গেলঃ মহম্মদপুরে ফিজিক্যাল ইন্সটিটুটে শতাধিক বাঙালী বুদ্ধিজীবী বন্দী। ইণ্ডিয়ান আর্মির সংগে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরাও ছুটে গেলেন। একে একে উগ্রপন্থীদের কুকীর্তি বেরিয়ে পড়ল। ১৪ ডিসেম্বর শেষরাতে আল বদরের মুখোশধারী লোকজন বুদ্ধিজীবীদের বাড়ি বাড়ি হানা দেয়। ঢাকার টোয়েণ্টিসিক্সথ্ রোড্ যেখানে বুড়িগঙ্গায় গিয়ে মিশেছে—সেখানকার খানায়—আসলে মৃত্যুকুণ্ডে শতাধিক ডেড্বডি পাওয়া গেল। প্রত্যেকের চোখ ওপড়ানো, হাত পেছনে বাঁধা, নাক-কান কাটা।

মৃত অবস্থায় আবছা আবছা যাঁদের চেনা গেলঃ অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ, গিয়াসুদ্দিন আহমদ, আনোয়ার পাশা, সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেন, গোলাম মোস্তফা, নজরুল হক, নিজামুদ্দিন, এস বি মাসুদ। তাছাড়া পাওয়া গেল, শহীদুল্লা কাইসার, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডঃ মুনির চৌধুরী, ডঃ রব্বি, ডঃ মুরতজা, আলিম চৌধুরী এবং ইলিয়াস লাডুকে।

কিছু মহিলার মৃতদেহও ছিল। একটি 'খুন' তার ভেতরে অনন্য। বুদ্ধিজীবী একজন মহিলাকে ওরা পাল্কি চড়িয়ে বিয়ের কনে সাজিয়ে, সানাই বাজিয়ে গোরস্তানে নিয়ে এসেছিল। সারারাত অরিবাম ফুর্তি। তারপর উষালগ্নে—

সেই গোরস্তানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্তোষ ভট্টাচার্য, ডঃ সিরাজুল হককে পাওয়া গেল। পাওয়া গেল অধ্যাপক মনিরুদ্দিন, হাফিজুল ইসলাম, সাংবাদিক মহম্মদ আখতার, এস এ মান্নানকে। যুদ্ধের শেষ দিকে প্রতিটি শহরে ওরা একাজ করেছে। ছাত্র, যুবকরা পাগলের মত এ'দের খুঁজছে। নদীর চরে বালি খুঁড়ে খুঁড়ে কঙ্কাল তুলে তুলে মানুষ চেনার প্রাণপণ চেষ্টা চলছে নিত্যদিন।

মুক্তির আর একটি দিন দেরি হলে অন্তত ৩০০০ বাছাই মানুষকে ওরা সাবাড় করত। লিস্ট তৈরি ছিল। লেখক, শিল্পীদের সবার নাম ছিল। পনর ডিসেমবর হাজার খানেক সরকারী কর্মচারীকে ঢাকার গভর্নর হাউসে ডাকা হয়েছিল। প্রশাসনের বাছাই লোকজনকে কোতল করে বাংলাদেশের ভাবী শাসনব্যবস্থা পংগু করাই ছিল মতলব। শেষ অবধি খুনের এই ব্যাপক প্রোগ্রাম পরিত্যক্ত হয়।

বদর বাহিনীর সর্বময় কর্তা রাও ফরমান আলি সরকারী কর্মচারী সাবাড়ের দোষটা ইণ্ডিয়ান আর্মির ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছিল। সারেণ্ডারের পর ঢাকার গভরনর হাউসে জেনারেলের বিছানায় একটি চিরকুট থেকে এ তথ্য ফাঁস হয়। বাঙালী বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ইনজিনিয়ার, ডাক্তার, উকিল সাবাড়ের টোটাল প্ল্যান ছিল। ঢাকায় রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের সেকরেটারি জেনারেল রুহুল কুদ্দুস বলেছিলেনঃ মোট ২৮০জন বুদ্ধিজীবীকে খুন করা হয়েছে। ১৪ ডিসেমবর থেকে ১৫ ডিসেমবর সারা বাংলাদেশে সারা দিনরাতে ফরমান আলি আর ব্রিগেডিয়ার বশিরের নির্দেশে করনেল এজাজি আল বদরের সশস্ত্র খুনেদের নিয়ে বুদ্ধিজীবী শিকার করে বেড়িয়েছে। ঢাকায় খুন হয়েছেনঃ ১৪০জন, খুলনায় ৫০জন। শ্রীহট্টে ৫০জন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৫০জন। খুলনায় সারেণ্ডারের আধঘণ্টা আগেও জবাই-নাটক চালু ছিল।

AMARBOI.COM

AMARBOL.COM

৮

সোনার বাংলা ২৯২ দিন বাদে

নিয়াজির কয়েদখানা থেকে বেরিয়েই বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ মানুষ হাজি গোলাম মোরশেদ বলেছিলেন, ২৫ মার্চ বিকেলেই শেখ জানতেন—গ্রেফতার হবেন। তাঁকে না পেয়ে পাছে ওরা সারা ঢাকা জ্বালিয়ে দেয়—তাই তিনি ধরা দেন। শেখের সঙ্গে তিনিও ওদিন বন্দী হয়েছিলেন।
তারপর রেডিও পাকিস্তান ছোট্ট ঘোষণায় জানিয়ে ছিলঃ শেখ মুজিবর গ্রেফতার।
পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক কয়েদখানায় 'দেশদ্রোহী'কে রাখা হয়েছে। বিচার হবে।
২ এপরিল তাঁকে ঢাকার ক্যানটনমেন্ট থেকে বিমানে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়।
কোন্ জেলে? লায়ালপুরে? না, রাওয়ালপিনডিতে? কিংবা, মিয়াওয়ালির জেলে?
বি বি সি-র রিপোর্টারের কাছে মিলিটারি মেজাজ সহকারে ইয়াহিয়া বলেই ফেললেন, সামরিক আদালতে গোপনে মুজিবের বিচার হবে। একজন দিশী উকিলও দেওয়া হবে তাঁকে।
বিচার শুরু হল ১১ আগস্ট—মিয়াওয়ালির জেলে। উকিল—আল্লাবকস্ খান ব্রোহি।
ওয়াশিংটনে পাক দূত আগা হিলালিও বললেন, গোপনে মুজিবের বিচার চলছে।
মুজিব বললেন, আমাকে বিচারের যোগ্যতা সামরিক আদালতের নেই। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ২৪জন রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে আবেদন জানালেন, মুজিবকে বাঁচান।
প্রশ্ন উঠলো, শেখ মুজিব কার ভাগ্য বরণ করছেন—লুমুম্বা না বেন বেল্লার?
শরণার্থী স্রোত, উত্তপ্ত সীমান্ত, বাংলাদেশের ভেতরে মুক্তির লড়াই—সবকিছু ছাপিয়ে একটি অনুপস্থিত সত্তা সর্বক্ষণ জ্বল জ্বল করছিল।
২ ডিসেমবর ইয়াহিয়া মুখ খুললেনঃ মুজিব সুস্থ।
তারপর আর তিনি কথা বলার সুযোগ পাননি বিশেষ। সদা হুইস্কি-আসক্ত এই কাগুজে সোলজার আত্মঘাতী ভারত-আক্রমণের ঘূর্ণিতে পড়েও কি হচ্ছে—কি হয়ে যাচ্ছে তা বোধহয় পুরো মালুম করতে পারেননি। মাঝে একবার ইসলামাবাদে সবার সঙ্গে অখণ্ড প্যাকিস্তানের জন্যে আনুষ্ঠানিকভাবে মসজিদে নেমাজ পড়েছিলেন। সেই একেবারে ষোল ডিসেমবর ইয়াহিয়া বাংলাদেশ হারানোর কথা বেমালুম চেপে গিয়ে রেডিওতে বললেন...বিশ্বাসঘাতক শত্রু...সাম সেটব্যাক ইন দি ইস্টার্ণ ফ্রন্ট...
কয়েক ঘণ্টার ভেতর অনেক কিছু ঘটে গেল। নিয়াজি নিঃশর্তে নত। বাংলাদেশ মুক্ত।
ভারতের একতরফা যুদ্ধবিরতি মেনে নেওয়ার পরদিন ১৮ ডিসেমবর পিনডিতে সরকারী মুখপাত্র বললেন, মুজিবের বিচার শেষ—তবে রায় এখনো দেওয়া হয়নি। সারা পৃথিবীতে

AMARBOI.COM

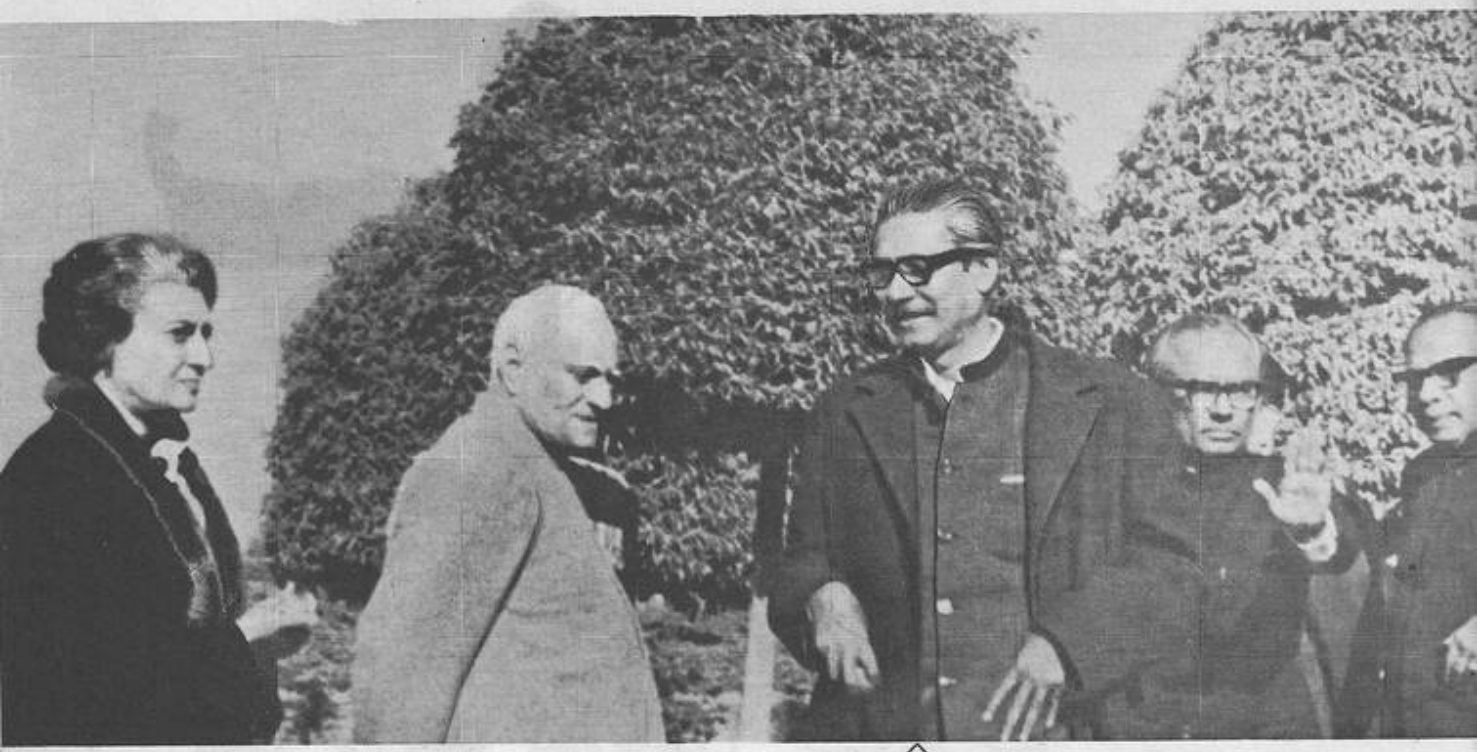

১০ জানুয়ারি। সোমবার শীতের সকালবেলা। লনডন থেকে ব্রিটিশ কমেট বিমানে নয়াদিল্লি। রাষ্ট্রপতি ভবনের উদ্যানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী, রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরির সঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান। তাঁর বাঁ দিকে একেবারে শেষে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ।

রাষ্ট্রপ্রধানদের কণ্ঠে মুজিবকে মুক্তি দেওয়ার দাবি উঠলো। আসলে কিন্তু ১৫ তারিখই মুজিবের ফাঁসির আদেশ হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীমতী গান্ধী নিকসনকে লিখলেন, প্রভাব খাটিয়ে আমেরিকা যদি মুজিবকে মুক্ত করতো তাহলে যুদ্ধ হত না। ওয়াশিংটন তখনো বলে চলেছে, পূর্ববঙ্গ থেকে এখনই ভারতীয় সৈন্য সরে যাক। পিকিংয়ে চু বললেন, ঢাকা জয় ভারতের পরাজয়েরই সূচনা। পাকিস্তানের পিছনে দুনিয়ার শান্তিকামীরা আছে।

ঢাকার অফিস কাছারি খুলে গেছে। ওদিকে ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সারা পশ্চিম পাকিস্তান টলমল। ভুট্টোকে দেশে ফেরার জন্যে ওয়াশিংটনে জরুরী তলব পাঠানো হল।

তারপরই ইয়াহিয়ার পতন। ভুট্টো গদিতে উঠলেন। ল্যাংবোট নুরুল আমিন বলতে বাধ্য হলেন, মুজিবকে জেলে রাখা যুক্তিহীন। ২১ ডিসেমবর ভুট্টো নিজেই বললেন, মুজিবকে অন্তরীণ রাখা হবে। তবে মুক্তি দেব কি না—জনমত নিয়ে ঠিক করব।

তাজুদ্দিন মন্ত্রিসভা ২২ ডিসেমবর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় নিয়ে গেলেন। শেখ সাহেবের সবচেয়ে ছোট ছেলে রাসেল বলল, আব্বা যাবার দিন তাকে বলে গিয়েছেনঃ আব্বা আমি যাই। রাসেলের বিশ্বাস—আব্বা ফিরে আসবে।

ভুট্টো মুজিবকে কয়েদখানা থেকে মুক্তি দিয়ে গৃহবন্দী করলেন। মিয়াওয়ালি জেল থেকে মুক্ত করে মুজিবকে প্রথমে ইসলামাবাদ—তারপর পিনডিতে নিয়ে যাওয়া হল।

ভুট্টো তাঁর সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। প্রেসিডেনটের বাড়ির লাগোয়া বাড়িতে তখন বঙ্গবন্ধুকে রাখা হয়েছে। পিনডির তা-বড় তা-বড় সরকারী আমলারাও তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। কি এত কথা! মুক্তি না দিয়ে পথ কোথায়?

২৮ ডিসেমবর ভুট্টো বেশ নাটকীয়ভাবে সাংবাদিকদের বললেন, এইমাত্র মুজিবের সঙ্গে কথা বলে এলাম। নিরাশ হইনি। ভুট্টোর এই টালবাহানার ভেতর ঢাকায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলাম হুঁসিয়ার করে দিয়ে বললেন, আমাদের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানকে এখুনি মুক্তি দাও ভুট্টো।

করাচির ডন, জংয়ের মত কাগজও পরিষ্কার বললঃ মুজিবকে মুক্তি দাও।

শেখ মুজিবর রহমান সারা দুনিয়ায় ঘরে ঘরে উচ্চারিত নাম। বাংলাদেশের বাঙালীর কাছে তিনি যে কি, তা এক কথায় বলা যায় না। ঢাকার ফরাসী কনসালের স্ত্রী খানিকটা বলতে পেরেছিলেনঃ মুজিব বাংলাদেশের দ্যগল।

তেসরা জানুয়ারি, উনিশশো বাহাত্তর। জনসমাবেশের সামনে ভুট্টো প্রশ্ন রাখলেন,

AMARBOI.COM

মুজিবকে নিঃশর্তে মুক্তি দেব?

গগনভেদী আওয়াজ উঠলঃ দাও।

৬ জানুয়ারি অবধি ভুট্টো মুজিবের মুক্তি নিয়ে নানা প্রকার কথা বলতে লাগলেন। কোনটাই বিশেষ জমল না। শেষমেষ বললেন, মুজিবের ঢাকা ফেরার ব্যবস্থা হচ্ছে। তিনি জনগণের নেতা। ৭ জানুয়ারি শোনা গেল, ভুট্টো আবার মুজিবের সঙ্গে কথা বলেছেন।

তারপর কোন খবর নেই। লারকানায় সমাজতন্ত্রী ভুট্টো প্রচুর নেচেকুঁদে সামন্ত প্রথায় নিজের জন্মোৎসব পালন করলেন। সারা পৃথিবী অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে। কবে? কখন? শেষ অবধি কোন অনর্থ ঘটবে না তো।

৮ জানুয়ারি রেডিও পাকিস্তান জানালো ঃ শেখ মুজিব রাত তিনটেয় পি আই এ-র বিমানে রওনা দিয়েছেন। কোথায় গিয়েছেন—তা অজ্ঞাত রাখা হয়েছে। সাসপেনসের চূড়ান্ত। রয়টার পাকা খবর দিল, মুজিব লনডনের হিথ্রো অ্যারোড্রোমে নেমেছেন। গায়ে শাদা গলাখোলা শার্ট। ধূসর সুট্। ধূসর ওভার কোট। মুখে পাইপ। মুজিব বললেন, দেখতেই পাচ্ছেন—আমি রীতিমত বেঁচে আছি। ভালো আছি।

উঠলেন হোটেল ক্ল্যারিজেস-এ। ঢাকা থেকে টেলিফোন গেল। কথা বললেন, তাজুদ্দিন আমেদ, নজরুল ইসলাম। লখনউ থেকে শ্রীমতী গান্ধী কথা বললেন। শেখ মুজিবর রহমানকে

বাংলাদেশে এই পোস্টার সর্বত্র। মসজিদে, মন্দিরে চ্যাটাই বেড়ার দেওয়ালে, গভরনর হাউসে।

জয় বাংলা! জয় হিন্দ! এতদিনে মুক্তি। এতদিনে জয়।

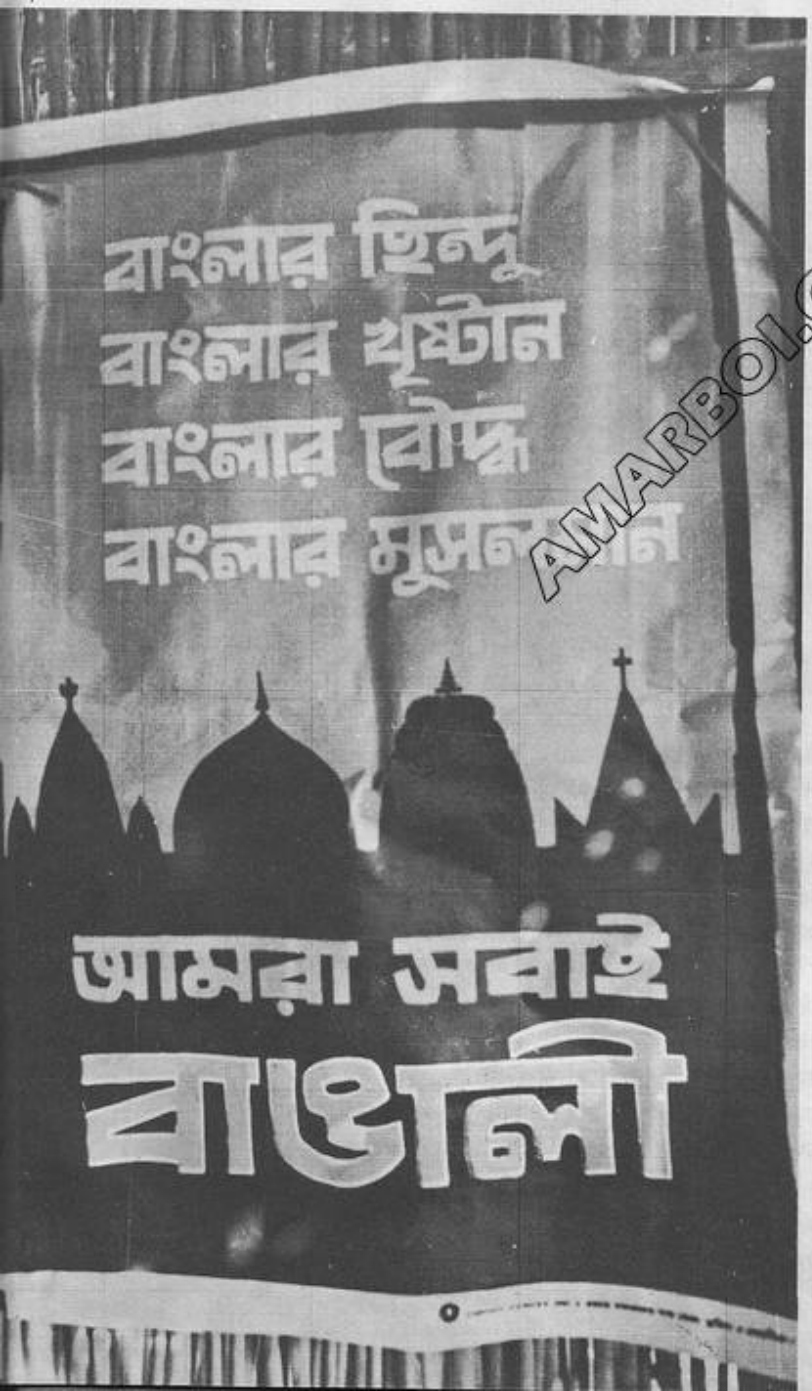

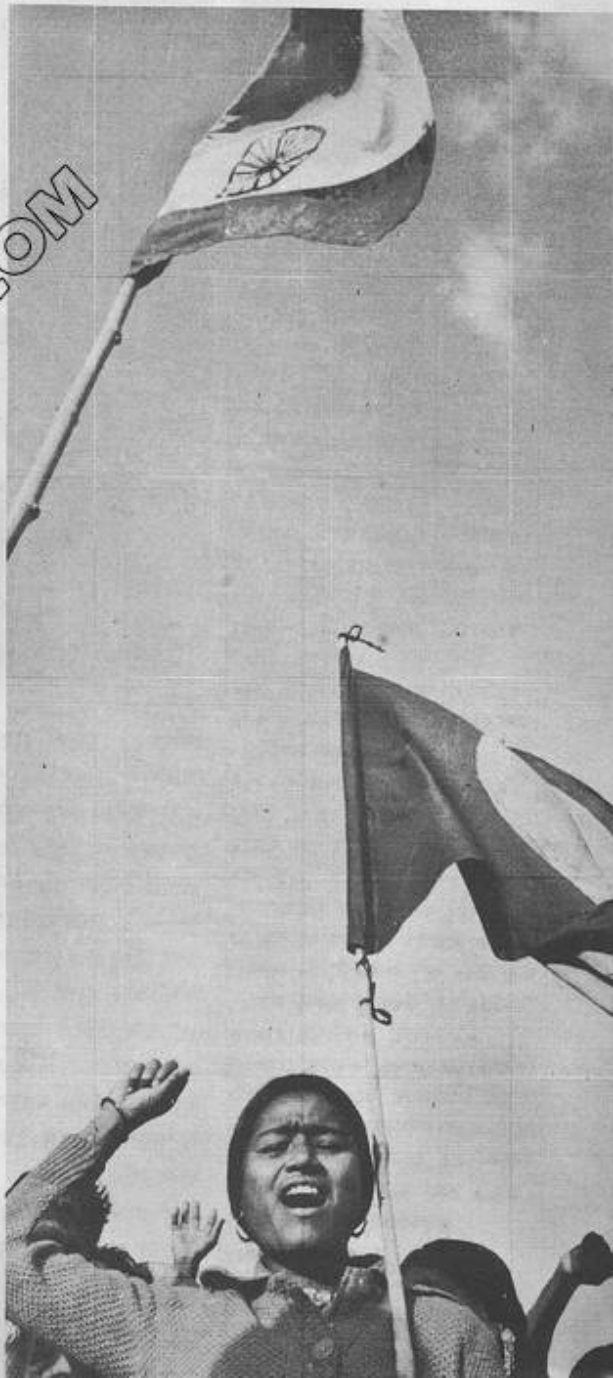

AMARBOI.COM

'দেরী কোরো না'

গতকাল বিকেলে রমনার রেসকোর্স ময়দানে নিয়াজি নাকে খত দিয়েছে। সাংবাদিক চঞ্চল সরকার পরদিন সকালে ঢাকা দেখতে বেরিয়েছেন। এর আগে কোনদিন আসেননি। হাঁটতে হাঁটতে ধানমণ্ডী। ১৮ নম্বরে গেলে কেমন হয়? কাছাকাছি যেতেই সবাই বললেন, আর এগোবেন না। কালও ৬জনকে খানসেনারা গুলি করে মেরেছে। ওরা চোরাগোপ্তা গুলি চালাচ্ছিল ঠিকই। কিন্তু তাই বলে—অবাক কাণ্ড! চঞ্চলবাবু এগোলেন। ঘড়িতে তখন বেলা দশটা। ডিসেমবরের সকালে গায়ে রোদ লাগাতে ভালই লাগছিল। আর এগোনো গেল না। সেই আঠারো নম্বরের বিখ্যাত বাড়ির ছাদে খাকি উরদির পাক আরমি বাংকার বানিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে। এল এম জি সযত্নে তাক্ করে রয়েছে। ওরা কি সারেণ্ডারের খবর রাখে না! ফাইট টু দি লাস্ট—নিয়াজির হক্ কথাটুকু আঁকড়ে রয়েছে। চঞ্চলবাবু কাছাকাছি গোরখা রেজিমেণ্টের মেজর তারাকে পেলেন। ক'জন জওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ছুটে এলেন। কিন্তু পাক সোলজাররা বোঝে না। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে মেজর তারা ওদের নিরস্ত্র করলেন। ততক্ষণে ভারতীয় জওয়ানরা পোজিসন নিয়েছে।

AMARBOI.COM

দিল্লিতে আসতে বললেন। আমন্ত্রণ গৃহীত।

আনন্দবাজার পত্রিকার নিউজরুম থেকে ফোন করলেন অমিতাভ চৌধুরী। দুনিয়ার সাংবাদিকদের মধ্যে মুক্তির পর মুজিবের সঙ্গে প্রথম কথা বললেন। আনন্দবাজারের পক্ষ থেকে, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে আপনাকে প্রণাম জানাই।

ওপার থেকে পরিষ্কার ভরাট গলা ভেসে এল, আমার প্রেস স্টেটমেণ্ট পেয়েছেন?

দশ জানুয়ারির সকালে মুজিব দিল্লিতে নামলেন। কখন আসছেন—নিরাপত্তার খাতিরে তা অজ্ঞাত রাখা হয়েছিল। রাজধানীর রাস্তায় রাস্তায় দু'দেশের পতাকা পাশাপাশি উড়ছে। পোস্টারে লেখা—

গঙ্গা-পদ্মা সেম ফ্লাড ইণ্ডিয়া-বাংলাদেশ সেম ব্লাড

এই মানুষটিরই কয়েদখানার সামনে তাঁরই জন্যে অগভীর কবর খোঁড়া হয়েছিল মাত্র ক'দিন আগে। দিল্লির সমাবেশে তিনি ইংরাজিতে শুরু করেছিলেন। সবাই বলল, বাংলায় বলুন। মাইকে ভেসে এল সেই কণ্ঠ—সেই আবেগ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

আপনাদের মহান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শুধু মহান ভারতের নেত্রী নন—সমগ্র মানবজাতির নেত্রী।

তারপর ঢাকায় রমনার সেই ঐতিহাসিক রেসকোরস্ ময়দান। সময় অপরাহ্ন। নির্বাচনে আওয়ামী লিগের প্রতীক ছিল নৌকো। সেই আদলে নৌকোর ওপর পাঁচশো ফুট দীর্ঘ মঞ্চ তৈরি

পাক পতাকা নামিয়ে ফেলে বাংলাদেশের পতাকা তোলা হল।

ফজলতুন্নেসা বেগম ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাতিল চাঁদ তারা মার্কা লাগানো পতাকা আচ্ছা করে পায়ে মাড়ালেন।

তাঁদের মায়ের পেছনে হাসিনা, রেহানা, রাসেল। ছোটমামা রাসেলের কোলে ভাগ্নে জয়।

ওঁদের সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন চঞ্চলবাবু। সঙ্গে ফটোগ্রাফার তারাপদ ব্যানার্জী। সারা বাড়িতে একখানা চৌকি নেই। মেঝেতেই বিছানা। ঝোলানো দড়িতে শাড়ি, কাপড়। বসার কোন চেয়ারও নেই। চঞ্চল, তারাপদ প্রণাম করলেন বেগম মুজিবকে। চোখে জল এসে গেল। আস্তে বললেন, কোন খবর জানেন ওঁর? ন'মাস কিছু জানি না। পাহারাদার সোলজারদের হাতে অপমান, লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে। হাসিনার বাচ্চা হল। চিঠি লিখেছিল ওঁর বাবাকে। ওরা চিঠি পাঠায়নি। তবে একজন ভাল ব্যবহার করেছে। পাক আর্মি'র মেজর হোসেন। কথা বলতে বলতে তিনি মেজর তারাকে একটা হাতঘড়ি উপহার দিলেন।

চোখের জল মুছে বেগম মুজিব বললেন, হাসিনা হাসপাতালে। বাচ্চা হয়েছে। মাত্র চল্লিশ মিনিটের জন্যে দেখতে যেতে দিয়েছিল। কোনকিছু খাবার পাঠাতেও দেয়নি। কোনরকম কিছুই দেয়নি। সংসার চালাবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। গতরাতে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা আসতে চেষ্টা করেছিল। ছাদ থেকে গুলি করে ৬জনকে শেষ করে দিল ওরা।

দানবের হাতে ছিল আধুনিক মারণাস্ত্র। ন্যায়নীতির কোন ধার ধারেনি ইয়াহিয়া। তার দাপাদাপির ভেতরে থেকেও এই সামান্য বাঙালিনী অসামান্য সাহসের পরিচয় দিয়েছেন আগাগোড়া। এতটুকু মচকাননি। কিন্তু এবার পাথর কিছু টলে গেল।

জানুয়ারি ৮

রেডিও পাকিস্তানের খবর তিনিও শুনেছেন। রাত তিনটেয় তাঁর বিমান ছেড়েছে। ডেসটিনেশন আননোন্‌ মুখ খোলেননি বেগম ফজলতুন্নেসা। তবু মুখে বারবার নানা ছায়া পড়েছে। অবশেষে জানা গেল সেই মানুষটি জীবিত এবং লনডনে। লং ডিস্টান্স্‌ কল বুক করা হল। শনিবার। শীতের সন্ধ্যা। ৫টা বেজে ৫১

লনডনের ক্ল্যারিজেস হোটেল থেকে

বাঁ দিকের পাতায়

আব্বার ছবি হাতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন হাসিনা। দিদির পিঠে হাত রেখে রেহানাও নিজেকে সামলাতে পারেনি। দাদির কোলে বসে জয় কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। ক'দিন হল বাংলাদেশ স্বাধীন। তখনো বঙ্গবন্ধুর কোন পাকা খবর নেই।

পাশে

আব্বাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছেন হাসিনা।

নীচে

নাতিকে কোলে টেনে নিচ্ছেন শেখ মুজিবর রহমান।

AMARBOI.COM

হয়েছে। সেখান থেকেই তিনি জনতরঙ্গকে বারবার তর্জনী নির্দেশে আন্দোলিত করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বললেন, আমি প্রথম স্মরণ করি বাংলাদেশের যে অগণিত হিন্দু মুসলমানের উপর অত্যাচার হয়েছে তাঁদের।...জানতাম বাংলাকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না। কত লোক শহীদ হয়েছেন, জান দিয়েছেন, তবু পিছু হটেন নাই।

৩০ লক্ষ লোককে মেরে ফেলা হয়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এত লোক, এত নাগরিক মৃত্যুবরণ করেন নাই, শহীদ হন নাই।

আজ থেকে আমার হুকুম—প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয়, ভাই হিসাবে—তোমরা আমার ভাই। আমাদের এ স্বাধীনতা পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না পায়, মা বোন কাপড় না পায়—যুবকরা কাজ না পায়। (জয়ধ্বনি)।

আপনারা আমাকে চেয়েছেন, আমি এসেছি। আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। কবর খোঁড়া হয়েছিল। জীবন দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলাম।

আসার আগে ভুট্টো সাহেব আমাকে বলেছিলেন, দেখুন দুই অংশে কোন বাঁধন রাখা যদি সম্ভব হয়। আমি বললাম, ভুট্টো সাহেব, তোমরা সুখে থাকো, কিন্তু বাঁধন টুটে গেছে। মুবারকবাদ জানাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, ভারতের জনগণকে। ভারত বাংলাদেশ ভাই ভাই। শহীদের স্মৃতি অমর হোক। জয়বাংলা।

সারা লাইন ভর্তি হয়ে সেই গলা ভেসে এল।

তোমরা কেমন আছ?

কয়েক লহমা কিছুই বলতে পারলেন না। তারপর বেগম মুজিব বললেন, বেঁচে আছি। তুমি কেমন আছ? তাড়াতাড়ি চলে এস। দেরি কোরো না। সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

বেগম মুজিব কেঁদে ফেললেন। বাড়ির সামনে হাজার হাজার মানুষ প্রবল উচ্ছ্বাসে কোলাকুলি করছেন। তিনি বললেন, আমি ওঁর গলা শুনেছি।

হাসিনাকে তাঁর বাবা ফোনে বললেন, হাসিনা, তোমার ছেলের কি নাম রেখেছ?

জয়।

প্রথম কথা হয় বড় ছেলে কামালের সঙ্গে। কামাল বললেন, আব্বার সেই গলা শোনার পর আমি কিছুক্ষণ কথা বলতে পারিনি।

আব্বা বললেন, তোরা বেঁচে আছিস তো?

আমরা সবাই ভালো। তুমি কেমন আছ? কখন আসবেন? তাড়াতাড়ি আসবেন।

বেগম মুজিব পরে বললেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন—তোমরা কি ঢাকায় ছিলা? তিনি এক ফাঁকে বৃদ্ধ শ্বশুর ৯০ বছরের লুৎফর রহমান সাহেবকে ছেলের খবর দিলেন। বৃদ্ধ মা বাবার চোখ দিয়ে তখন জল পড়ছে। লুৎফর রহমানের মাথায় টুপি, গায়ে ছাই রঙের পশমী শাল—হাতে জপের মালা। বঙ্গবন্ধুর মা বয়সের ভারে অবনত, চোখে চশমা, পরণে জরিপাড় শাদা রঙের শাড়ি।

রিপোর্টারের প্রশ্নের জবাবে শেখ লুৎফর বললেন, আগে খোকাকে দেখি। এখন কিছু বলব না। ওর সব কাজই আমার পছন্দ।

জানুয়ারির দশ তারিখ। রমনার রেসকোর্স থেকে ধানমণ্ডীতে গাড়ি ঢুকলো। মুজিব নামা মাত্র কামাল ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল। দু'জনের চোখেই জল।

AMARBOI.COM

... আমি জানতাম না আবার আপনাদের মধ্যে ফিরে আসতে পারব। আমি ওদের বলেছিলাম, তোমরা আমাকে মারতে চাও, মেরে ফেল।

শুধু আমার লাশটা বাংলাদেশে আমার বাঙালীদের কাছে ফিরিয়ে দিও।...

"আপনারা আমাকে চেয়েছেন, আমি এসেছি। আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। কবর খোঁড়া হয়েছিল। জীবন দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলাম।

বলেছিলাম, আমি বাঙালী, আমি মানুষ, আমি মুসলমান, মানুষ একবারই মরে,

দুবার নয়। হাসতে হাসতে মরব, তবু ওদের কাছে ক্ষমা চাইব না।
মরার আগেও বলে যাব, আমি বাঙালী, বাংলা আমার ভাষা, জয় বাংলা,
বলব বাংলার মাটি আমার মা। আমি মাথা নত করব না।...
"আজ আমি বক্তৃতা করতে পারছি না। নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি।
সেই জন্মভূমির মাটিতে পা দিয়ে আমি চোখের পানি রাখতে পারি নাই।
জানতাম না, এই মাটিকে, এই জাতিকে এত ভালবাসি। ...

এলেন। তাঁরও চোখে জল। ওরা তিনজন হাঁটতে হাঁটতে শোবার ঘরের দিকে এগোলেন। প্রথমে বাবাকে তার পর মাকে জড়িয়ে ধরলেন মুজিব। সবার চোখে জল। এরপর তিনি বেগম ফজলুন্নেসার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বেগম সঙ্গে সঙ্গে গভীর পরিতৃপ্তিতে স্বামীর বুকে মাথা রাখলেন। কেঁদে উঠলেন চীৎকার করে। কিছু যেন বলতে শুরু করেই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তারপর আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে এল। তখন সারাদিনের ক্লান্তির পর মুজিব কিছু খেতে চাইছেন।

দুই বন্ধু।
ভারতীয় জওয়ান
ও রাসেল।

ঢাকার দেওয়ালে
পরাধীন আমলের
পুরোনো খবরের কাগজে মুক্তির
পরেকার স্লোগান।

AMARBOI.COM